

পরমপূজ্য বিদর্শনাচার্য মহাসী সৈয়দ প্রণীত

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন



অনুবাদক- শ্রী সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া



বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ
BUDDHIST RESEARCH AND PUBLICATION CENTRE-BANGLADESH



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ এর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- ৩৩ মানব পুত্র বুদ্ধ - সাহিত্যিক আবুল ফজল
- ৩৩ মহাশান্তি মহাপ্রেম - শীলানন্দ ব্রহ্মচারী
- ৩৩ অভিধর্ম দর্পণ - শীলানন্দ ব্রহ্মচারী
- ৩৩ বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব এবং হিন্দু ধর্ম হইতে ইহার পার্থক্য
- উমেশ চন্দ্র মুচ্ছদী
- ৩৩ সদ্ধর্ম নীতি মঞ্জরী - ড. জিনবোধি ভিক্ষু
- ৩৩ বুদ্ধ বন্দনা - ভিক্ষু শীলচার শাস্ত্রী
- ৩৩ সীবলী চরিত - দার্শনিক বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির
- ৩৩ বিদর্শন ভাবনা - শীলানন্দ ব্রহ্মচারী
- ৩৩ তথাগত বুদ্ধের বোধি-বিধি - ড. জিনবোধি ভিক্ষু
- ৩৩ হস্তসার বা বৌদ্ধ মহাপরিত্রাণ - পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া
- ৩৩ মহামানব বুদ্ধ (১ম ও ২য় পর্ব) - অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া
- ৩৩ অধ্যাপক মুনীন্দ্র রচনাবলী
- ৩৩ পুনর্জন্ম (অনুবাদ গ্রন্থ) - ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া
- ৩৩ জিনালঙ্কার (অনুবাদ গ্রন্থ) - সুমঙ্গল বড়ুয়া
- ৩৩ অগ্রবংশ মহাস্থবিরের জীবন ও কর্ম - ড. জিনবোধি ভিক্ষু
- ৩৩ শূন্য চারিদিকে - মুদিতা বড়ুয়া

প্রকাশের অপেক্ষায়

- ৩৩ ধম্মপদং - অগ্গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী
- ৩৩ কোশলের অমর কাহিনী - সুগতবংশ মহাস্থবির
- ৩৩ জ্ঞানসোপান - পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া
- ৩৩ পটিসম্ভিদামগ্গ (অনুবাদ গ্রন্থ) - ড. জিনবোধি ভিক্ষু
- ৩৩ সুত্তনিপাত - পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া
- ৩৩ বৌদ্ধ চরিতাভিধান - ড. জিনবোধি ভিক্ষু
- ৩৩ ভগবান বুদ্ধের দৃষ্টিতে দুঃখ মুক্তি-নির্বাণ - ড. জিনবোধি ভিক্ষু

পরমপূজ্য বিদর্শনাচার্য মহাসী সেয়াদ প্রণীত

Discourses on the Basic Practice of
THE SATIPATTHANA VIPASSANA

পুস্তকের অনুবাদ

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন

(প্রথম - চতুর্থ)

অথগু

অনুবাদক

শ্রীসুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া



বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ

VIDARSHAN BHABANA ANUSHILAN SUBHUTI RANJAN BARUA

প্রথম প্রকাশ : বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৯১

দ্বিতীয় প্রকাশ : বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৪০১

C সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশিকা

শ্রীমতী পারমিতা বড়ুয়া

৩২ গ্রীণ পার্ক

কলিকাতা-৭০০০৫৫

তৃতীয় প্রকাশ : বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২০১০

বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ ফোন : ০১৮১৮০৯৫৩৭১

প্রফ সংশোধন : শিক্ষাবিদ সলিল বিহারী বড়ুয়া ও
অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া

প্রাপ্তিস্থান

- ১। শ্রীমতী পারমিতা বড়ুয়া
বোধি নিকেতন
৩২ গ্রীণ পার্ক, কলিকাতা-৫৫
- ২। মহাবোধি বুক এজেন্সী
৪ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩
- ১। ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
৪০ টি/১সি, পটারী রোড
কলিকাতা-১৫

মুদ্রণ

- ২। ত্রি-জেমস এন্ড এসোসিয়েটস্
মোমিন রোড, মসজিদ মার্কেট, চট্টগ্রাম।

শ্রদ্ধাদান :



প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনকারীদের ভাবনা বিষয়ক পুস্তক পাঠের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি আচার্যের উপদেশাবলী অনুশীলনেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাংলা ভাষায় নতুন যোগীদের উপযোগী ভাবনা পুস্তকের অভাব বোধ করে পরমপূজ্য মহাসী সেয়াদর Discourses on the Basic Practice of the Satipatthana Vipassana পুস্তিকাটির ভাষান্তর করতে উৎসাহিত হয়েছি। এই পুস্তিকায় ভাবনা পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় যোগীর পক্ষে এই ভাবনা পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত্ব করা কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু ভাবনা অনুশীলনে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তা সহজতর হয়ে উঠবে।

ভাবনায় কৃতকার্য হতে হলে অসাধারণ ধৈর্য ও বীর্যের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুশীলন প্রয়োজন। ভাবনায় নিহিত ধর্মের সঙ্গে যোগীর অনুভূতিসাধনায় নব নব জ্ঞানোন্মেষ ঘটে। তখন যোগীর পক্ষে ভাবনাচর্য্যা অত্যন্ত সুখকর মনে হবে এবং তা তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য কর্মরূপে পরিণত হবে। এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হলে যোগী ভাবনা হতে বিচ্যুত হতে পারেন না, বরং তিনি অধিকতর উদ্যম ও উৎসাহে ভাবনায় আত্মনিয়োগ করে জীবনের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনূদিত এ পুস্তক পাঠে নতুন যোগীরা কিছুমাত্র উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করতে পারবো।

গত বৎসর জুলাই মাসে আমি বম্বে হতে চিকিৎসান্তে কলকাতায় ফিরে আসার পর একদিন কলিকাতা ১১০ এ, বাঙ্গুর এভেনিউ নিবাসী বন্ধুবর শ্রী তরুণ তপন বড়ুয়া আমাকে দেখতে আসেন। সে সময় আমার অসুস্থ অবসর জীবনের দিন যাপনের কথা প্রসঙ্গে ধ্যানবিষয়ক পুস্তক অনুবাদের কথা শুনে তিনি (তরুণবাবু) ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভা বড়ুয়া মহোদয়া তাঁদের একমাত্র কন্যা প্রয়াত কৃষ্ণার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করে ধ্যান অনুশীলনের এই সহায়ক পুস্তিকা মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রার্থনা করি তাঁদের এই পুণ্যকর্মের প্রভাবে প্রয়াত কল্যাণীয়া কৃষ্ণার পরলোক সুখের ও শান্তিময় হোক।

বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৯১ সন

বোধি নিকেতন

৩২, গ্রীণ পার্ক

কলিকাতা-৭০০০৫৫

শ্রীসুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন (১ম খণ্ড) নিঃশেষিত হইয়াছে অনেকদিন । কিন্তু নানা কারণে ইহার পুনর্মুদ্রণ যথাসময়ে করা সম্ভব হয়নি । বিলম্বে হইলেও শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষুর চেষ্টাতেই এই দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্ভব হইয়াছে । সেইজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ । আমার ছোট জা শ্রীমতী শিপ্রা তাহার স্বামী পরলোকগত সুপ্রীতি রঞ্জন বড়ুয়া (আমার দেবর) পুণ্য স্মৃতিতে এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের জন্য এক হাজার টাকা সাহায্য করিয়া ধন্যবাদার্থী হইয়াছে । এই গ্রন্থ পাঠের দ্বারা বিদর্শন অনুশীলকারীগণ উপকৃত হইলে তাহার পুণ্যানিশংস লাভ করিয়া সুপ্রীতির পরলোক শান্তিময় হউক — ইহাই আমার প্রার্থনা ।

বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৪০১ সন

বোধি নিকেতন

৩২, গ্রীণ পার্ক

কলিকাতা-৭০০০৫৫

পারমিতা বড়ুয়া

কেন্দ্র: মুন্সীগঞ্জ

৩২ আন পাণ্ডা

আঃ হুসেইন ডিফু (সংস্কৃতি) ২২ মে এপ্রিল

অবস্থা কল্যাণমিত্র

আজ্ঞা করি যে প্রথমে আমার এই পরিবারকে সকলের মঙ্গল বন্দন।
প্রথমতঃ আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান সমূহকে প্রথম
কমলে আচ্ছাদিত। অতি বৃদ্ধ বয়সে আমি ছিলাম বয়সে অসুস্থ
আপনি মত দিনে কলিকাতায় ছিলেন, ৩০ দিনে বিভিন্ন সামাজিক কাজে
আগমন করতেন সুযোগ ছিল। (সামাজিক প্রশাসন) ও অন্যান্য।
স্বাধীন বয়সের কারণে আমার ও মোত পড়িত। এতেই সব কিছু করতে
হয়।

তারে আমার দাম্পত্য জীবন এবং অনুবাদ প্রথমে
স্বাধীনতা রক্ষণ ব্যাপারে গীতিকা মাঝে কলিকাতা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে অনেক
কল্যাণমিত্র প্রভৃতি প্রকাশ করে সমাজে প্রচার করেছিলেন।

তিনি সত্যমত ২৩য় বর্ষ পর পরই বিশেষতঃ আপনাকে দেখে চলে
মাওলাব পর বহু মনোবান বই এর পাণ্ডিত্য দিয়ে আছে।

তিনি কী কী কালে কলিকাতা বাংলাদেশ প্রভৃতি লক্ষ্য করে রচনা করেছেন

কলিকাতা: প্রথম বর্ষে তার অতি প্রায় পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন বলে উল্লিখিত।

তারে আমার সামাজিক সংস্কারের আমায় প্রথমে প্রাথমিক
লক্ষ্যে প্রকাশিত প্রকাশ ও প্রচারের জন্যে বহু সময় দাম্পত্য
দাম্পত্যের প্রথম করে আমারে আমি মুক্ত করার জন্যে অব্যাহত
করাছি। আপনার পুস্তক সমূহে কীট বিধেয় কলিকাতা কর্তৃক।

আঃ হুসেইন ডিফু (সংস্কৃতি)

অনাম নেবেন

বুড়ি বিচারক ও সারলিঙ্গন

বন্দনা নেবেন

অন্যের বঙ্গলিঙ্গন

স্বাধীনতা

চৌধুরী - বাংলাদেশ

২০০০ খ্রিঃ

আমায় করি সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে দেখা হয়
আমায় নিম্নলিখিত প্রকাশিত। মোট প্রকাশের
মধ্যে প্রায় ২০০০ খ্রিঃ দীপা বোমা কিছু
দেখা দিতেছে বলা হয়।

প্রস্তাবনা

মানবের দুঃখমুক্তির শ্রেষ্ঠতম সোপান হলো নির্বাণোপলব্ধি করা। এ দুর্লভ প্রাপ্তির জন্যে দীর্ঘকাল সংযত জীবন যাপন, আত্মত্যাগ, আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনার অনুধ্যান ও অনুশীলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবনে ষড় ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন) সদা-সর্বদা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও ধর্মকে অবলম্বন তথা আকর্ষণ করে বলেই প্রতিনিয়ত বিবৃত করে তোলে। এ জাতীয় মানসিকতার দরুণ মানুষ কখনও স্থির, শান্ত ও সমাহিত হতে পারে না। শারীরিক ও মানসিক নানা যন্ত্রণার স্বীকার হতে হয়। এতে করে মানুষের জাগতিক ও আত্মাত্মিক দুঃখকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মানবের জীবন মাত্রই দুঃখের আকর। অনন্ত দুঃখের মাঝেই এ জীবন প্রবাহ চলছে এবং চলতে থাকবে। এ বাস্তব সত্যকে রাজ কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম দীর্ঘ সাধনা বলে সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে জগতে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হয়েছিলেন। এ মহাজ্ঞান লাভের পর উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন –

‘জন্ম-জন্মান্তর পথে ঘুরিয়াছি পাইনি সন্ধান
কে কোথায় গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার
হে গৃহকারক, এ গৃহ (দেহরূপ জীবন) রচিবারে না পারিবারে আর
সংস্কার বিগত চিত্ত তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।’

তথাগত বুদ্ধের আত্মজয় ও আত্মমুক্তির অমোঘ বাণী ছিল সত্যিই অভূতপূর্ব, আশ্চর্যজনক। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তথাগত বুদ্ধই একমাত্র এ মহান সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কায়, চিত্ত, বেদনা ও ধর্ম এ চারি বিষয়ের ধ্যান-ধারণার দ্বারা মানবের দুঃখ মুক্তি সম্ভব। শমথ ও বিদর্শন ভাবনা এরই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। মনকে শান্ত সমাহিত, স্থির করে এবং অনিত্যতার একটি গভীর অনুভূতি শমথ ও বিদর্শন ভাবনার অনুশীলনের প্রভাবে মনে জাগিয়ে দেয়। তখন মায়্যা মোহময় সংসারে আসা-যাওয়ার খেলার প্রতি অন্তর জগতে বিরাগ ভাব মানুষেরা স্থায়ী মন বা চিত্তের স্বাভাবিক গতিধারা নিয়ন্ত্রণে আনায়েনে সচেষ্ট হয়। কেন না আসল মুক্তি আপনার হাতে। কেউ কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। তথাগত বুদ্ধ মুক্তির পথ প্রদর্শক মাত্র। এমনকি স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ মুক্তিদাতা বলে কোনোদিন দাবীও করেন নি। ইদানিং বিদর্শন ভাবনার ব্যাপক হিরিক পড়েছে সারা বিশ্বময়। প্রবাদ আছে-পথ না চিনলে পথিক তার গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পারে না। তদ্রূপ মানবের জীবন দুঃখের অবসান ঘটাতে হলে আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনার বিকল্প কোন পথ নেই। তাই মহাসাধক ও জ্ঞান তাপস অতিপূজ্য বিদর্শনাচার্য মহাসী সৈয়দ কর্তৃক প্রণীত বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন ১-৪ (খণ্ড) বাংলা ভাষায় অনূদিত শ্রী সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়ার এ অমূল্য ১-৪ খণ্ড গ্রন্থটি বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়ে আসছে। গ্রন্থকার আমার একান্ত সুহৃদ এবং কল্যাণ মিত্র। তাঁরই একান্ত অনুরোধ এবং অভিপ্রায় অনুসারে বিশেষতঃ তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী পারমিতা বড়ুয়া এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতায় এক্ষণে গ্রন্থটি প্রকাশ করে দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। একদিকে ঋণ স্বীকার করার সুবর্ণ সুযোগ হয়েছে অন্যদিকে প্রকৃত জ্ঞানাবেদী সাধক-সাধিকাদের জন্য অনেক অজানা বিষয় জানার জন্য এ গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাদের জন্য এ গ্রন্থটি রচিত এবং প্রকাশিত। সে সাধনেচ্ছু পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ উপকার হলে প্রকাশনা সার্থক মনে করব।

এর প্রকাশের ব্যাপারে যাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহায়তা লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সলিল বিহারী বড়ুয়া এবং অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়ার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও মাদল বড়ুয়া, মিল্টন বড়ুয়া, শিক্ষক সৈকত বড়ুয়া, বিদর্শন সাধিকা দীপা (কলিকাতা) এবং পারমিতা বড়ুয়ার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। এদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী। গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া

ড. জিনবোধি ভিক্ষু

বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ

বুদ্ধ পূর্ণিমা ২০১০

নমো বুদ্ধায় বুদ্ধের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম

বুদ্ধ অনুশাসন স্থিতিকালে জন্মগ্রহণ করে, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হল শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন করে এ তিন গুণের অধিকারী হওয়া।

গৃহীদের অন্ততঃপক্ষে পঞ্চশীল পালন এবং ভিক্ষুদের প্রাতিমোক্ষশীল পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি শীলে প্রতিষ্ঠিত তিনি সুখময় মানব জীবন বা দেবজন্ম লাভ করেন। কেবল সাধারণ লৌকিক শীল পালন নরক, পশু ও প্রেত প্রভৃতি দুঃখময় মানবেতর স্তরের জীবন থেকে রেহাই পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার জন্য উচ্চতর লোকোত্তর মার্গশীল এবং ফলশীল অনুশীলন করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি এরূপ শীলে প্রতিষ্ঠিত বা এরূপ গুণসম্পন্ন হন, তিনি মানবেতর জীবন লাভ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন এবং মনুষ্য বা দেবভূমিতে সুখী জীবন লাভে সমর্থ হন। সে কারণে প্রত্যেকের লোকোত্তর শীল পালন করা উচিত। যিনি নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং তৎপরতার সহিত লোকোত্তর শীল পালন করবেন তাঁর জীবনে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। দুঃখের বিষয় মানুষ দুর্লভ মানব জীবনের অধিকারী হয়েও এ সুযোগ গ্রহণ করতে অপারগ হন, ফলে অচিরে বা পরবর্তীকালে অকুশল কর্ম প্রভাবে অত্যন্ত দুঃখময় নরক, পশু, প্রেত ইত্যাদি মানবেতর জন্মে জন্মগ্রহণ করতে হয়। যার আয়ুষ্কাল শত সহস্র বছর এমনকি লক্ষ লক্ষ বছরও হতে পারে। তাই আমাদের সকলকে বুদ্ধ অনুশাসন স্থিতিকালে জন্মগ্রহণের অপূর্ব সুযোগের সদ্যবহার করে মার্গশীল ও ফলশীল লাভার্থ কর্ম সম্পাদন করা উচিত। শুধুমাত্র শীল অনুশীলন দ্বারা অভীষ্ট ফল লাভ হয় না। তার সঙ্গে সমাধি অনুশীলনও প্রয়োজন। সমাধি হল মনের স্থিরতা ও প্রশান্তি। সাধারণ শৃঙ্খলহীন (অশান্ত) মনের স্বভাব হল ঘুরে বেড়ান, একে সংযত করা যায় না, মন যে কোন প্রকার ধারণা, চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদির মধ্যে বিচরণ করে। মনের এই যথেষ্ট বিচরণের অভ্যাসকে সংযত করার জন্য কোন এক নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে (ধ্যানের কর্মস্থানের মধ্যে) মনযোগ সহকারে বারবার মন নিবদ্ধ করতে হবে। এরূপ অনুশীলনে অভ্যস্ত হলে মন ক্রমে যত্রতত্র বিচরণ থেকে বিরত হয়ে ধ্যান বিষয় বা কর্মস্থানের

প্রতি নিবদ্ধ থাকে। সমাধি দুই প্রকার- লৌকিক সমাধি ও লোকোত্তর সমাধি। এই দুই প্রকার সমাধির মধ্যে শমথ ভাবনা অর্থাৎ আনাপান, মৈত্রী, কসিন (ইত্যাদি বিষয়ে) ভাবনা করলে লৌকিক বা লোকীয় ধ্যান পরিবর্তিত হয়। যথা, চার রূপধ্যান এবং চার অরূপধ্যান। এসকল ধ্যানচর্যা দ্বারা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়া যায়। ব্রহ্মসুতরের জীবনকাল (স্তর ভেদে) অতীব দীর্ঘ এবং স্থিতিকাল এককল্প (এক পৃথিবী স্থিতিকাল) দুই-চার-আট-এমন কি চুরাশি হাজার কল্পকালও হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মলোকের জীবনকাল অতিক্রান্ত হলে সে স্তর থেকে চ্যুত হয়ে (মৃত্যুবরণ করে) দেবতা বা মানুষরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। যিনি সবসময় পুণ্যময় জীবন যাপন করেন তিনি এরূপ উচ্চ জীবনকে সুখময় করে তুলতে পারেন। কিন্তু তিনি যেহেতু ক্লেশমুক্ত নন সেই হেতু তিনি বহুপাপ বা অকুশল কর্মও সম্পাদন করতে পারেন। এতে তিনি অকুশল কর্মজনিত দুঃখময় কর্মফল ভোগ করবেন এবং নরকে বা অন্যান্য মানবেতর জীবন স্তরে জনগ্রহণ করে অপরিমেয় দুঃখ যাতনা ভোগ করবেন। এই লৌকীয় সমাধি মানুষের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার দ্যোতক বা আশ্রয় নহে। সুতরাং লোকোত্তর সমাধি অর্থাৎ মার্গ-সমাধি ও ফল-সমাধি লাভের অভিপ্রায়ে আমাদের কর্ম সম্পাদন করা উচিত। এ সমাধির অধিকারী হতে হলে প্রচুর অনুশীলন করা প্রয়োজন।

প্রজ্ঞা দুই প্রকার। লৌকীয় এবং লোকোত্তর প্রজ্ঞা। বর্তমান কালে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান অথবা অন্যান্য পার্থিব বিষয়কেও প্রজ্ঞা বলা হয়। এ সকল প্রজ্ঞার সঙ্গে ভাবনার কোন সম্পর্ক নেই। এ সকল বিষয়কে প্রকৃত পুণ্যকর্মও বলা যায় না। কারণ এরূপ জ্ঞান দ্বারা নানারূপ মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। তাছাড়া এ সকল কর্মের পেছনে রয়েছে লোভ, দ্বেষ এবং মোহরূপ ভ্রান্তি (অকুশল অভিপ্রায়)। লৌকীয় প্রজ্ঞার প্রকৃত আদর্শ হল সকল প্রকাল অকুশল বর্জিত পুণ্যময় জীবন যাপন। জনকল্যাণমূলক কর্ম, দুঃখ যন্ত্রণা প্রশমন-মূলক সেবা কার্য, প্রকৃত ধর্মজ্ঞান আহরণের চেষ্টা এবং ত্রিবিধ বিদর্শন ভাবনা প্রসূত জ্ঞান যথা শ্রুতময়ী জ্ঞান (অধ্যয়ন প্রসূত জ্ঞান), চিন্তাময়ী জ্ঞান (চিন্তা প্রসূত জ্ঞান) এবং ভাবনাময়ী জ্ঞান (মানসিক উৎকর্ষতা প্রসূত জ্ঞান) হল লৌকীয় জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। লৌকীয় প্রজ্ঞা উন্নত বা সুখী জীবন প্রদান করে বটে কিন্তু নরক-জন্ম ও অন্যান্য দুঃখময় মানবেতর স্তরে পুনর্জন্ম রোধে অক্ষম। কেবল লোকোত্তর প্রজ্ঞাই দুঃখ নিবৃত্তির কারণ হতে পারে।

লোকোত্তর প্রজ্ঞা দ্বিবিধ : মার্গ প্রজ্ঞা ও ফল প্রজ্ঞা। এই ধরনের প্রজ্ঞা লাভের জন্য বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। এতে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পূর্ণতা

লাভ করে। প্রজ্ঞা পরিপূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শীল ও সমাধি অর্জিত হয়। প্রজ্ঞা পরিপূর্ণতা লাভের উপায় হল নাম ও রূপ পর্যবেক্ষণ করা। অর্থাৎ মানব দেহে বিদ্যমান দুই ধাতু (নাম-রূপ)-কে প্রকৃত স্বরূপে জানা। আধুনিককালে যন্ত্রের সাহায্যে রূপের (দেহ অভ্যন্তরস্থ ও দেহ বহির্দেহস্থ পৃথিবী ধাতু, অপ ধাতু, তেজ ধাতু ও বায়ু ধাতুর) বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় গবেষণাগারে। গবেষণাগারে মনের যথার্থ বিশ্লেষণ হয় না যদিও এ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। বুদ্ধ নির্দেশিত পদ্ধতিতে নাম রূপের গবেষণা অতি সূক্ষ্মভাবে করা যায়। এই পদ্ধতিতে দেহের মধ্যে সংঘটিত নাম-রূপের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন বা বিশ্লেষণ করা যায়। এভাবে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করলে উন্নত সমাধি লাভ হয় এবং নাম-রূপের উত্থান-পতন প্রতিনিয়ত সম্যক্ ভাবে উপলব্ধ হয়।

আমাদের দেহ নাম-রূপ নামক দুই ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত দেহের কঠিন পদার্থসমূহ রূপ নামে অভিহিত যেমন পৃথিবী (কঠিনতা, কোমলতা, বিস্তৃতি) অপ (সংসক্তি), তেজ (উষ্ণতা-শীতলতা), বায়ু (গতিশীলতা), চক্ষু ও রূপ ইত্যাদি। রূপ বিভাগ আটশ প্রকারের। সংক্ষেপে বলা যায় এই দেহ রূপের সমষ্টি মাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে পুতুল তৈরি হয় মাটি, জল এবং আঠার সংমিশ্রণে অর্থাৎ যাকে আমরা পুতুল বলি তা কাদামাটি এবং আঠার ব্যতীত আর কিছু নয়। উষ্ণতা এবং শৈত্য প্রভৃতি কারণে রূপের পরিবর্তন হয়। প্রতিরূপ নৈসর্গিক কারনে বস্তুর পরিবর্তনশীলতাকে পালি সাহিত্যে ‘রূপ’ বলা হয়। কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা বা জানার ক্ষমতা রূপের নেই।

অভিধর্মে নাম-রূপকে সারম্মণধম্ম এবং অনারম্মণধম্ম এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। মন ধাতুর (বা মনের) বিষয় (বা বস্তু) আছে। মন বিষয়কে ধারণ এবং বিষয়কে জানে। কিন্তু রূপের কোনো বিষয় বা বস্তু নেই, রূপ বিষয়কে ধারণ করে না এবং বিষয়কে জানেও না। বস্তুত: অভিধর্ম আরও স্পষ্ট করে বলতে চায় যে, রূপের (ধাতুর) এমন কোনো ইন্দ্রিয় নেই যারা দ্বারা তার পক্ষে জ্ঞান আহরণ করা বা জানা সম্ভব হতে পারে। এইরকমভাবে যোগীও জ্ঞাত হন যে রূপ-ধাতুর কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় নেই। জীবন্ত দেহ সম্বন্ধেও এই একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, এতেও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়) নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিশ্বাস জীবন্ত দেহের জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবসান হয়। প্রকৃতপক্ষে তা নয়, মৃত বা জীবন্ত এই উভয়বিধ দেহের রূপপুঞ্জের মধ্যে কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় নেই।

এখন প্রশ্ন হতে পারে তবে বিষয়কে জানে কে? উত্তরে বলা যেতে পারে রূপধাতুর সংস্পর্শে জাত (উৎপন্ন) মনধাতুকে পালি সাহিত্যে ‘মন’ বলা হয়। কোনো বিষয়ের প্রতি নমিত হয় বলে একে মন বলে। মনকে চিন্তাও বলা হয়। মন যে বিষয়কে নির্ভর করে (বিষয়ের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়) তাই এখন আমরা আলোচনা করবো। চোখকে নির্ভর করে চক্ষুবিজ্ঞান (দর্শন), কর্ণকে নির্ভর করে শ্রোত্রবিজ্ঞান (শ্রবণ), নাসিকাকে নির্ভর করে ঘ্রাণবিজ্ঞান (গন্ধ বা ঘ্রাণ), জিহ্বাকে নির্ভর করে জিহ্বাবিজ্ঞান (স্বাদ) এবং দেহকে (ত্বক) নির্ভর করে দেহবিজ্ঞান (স্পর্শ) উৎপন্ন হয়। সুখ বা দুঃখ (ভাল-মন্দ) হিসাবে দেহবিজ্ঞান বহু প্রকারের হয়। সমস্ত দেহ (ভিতর ও বাহির) বিস্তার করে এর কর্ম সম্পাদিত হয়। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন হয়। চোখে দর্শন, কর্ণে শ্রবণ, নাসিকায় ঘ্রাণ, জিহ্বায় স্বাদ উৎপন্ন হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান (সংস্পর্শ) মনধাতু ব্যতীত আর কিছু নয়। বিষয়কে (ধর্মকে) নির্ভর করে যে মনোবিজ্ঞান মনবস্তুর (কেন্দ্রে) উৎপন্ন হয় তাহা হল—চিন্তা, ধারণা, কল্পনা ইত্যাদি। এই সকলও মনধাতু। নিয়মানুসারে মনই বিষয়কে জানে (জ্ঞাত হয়), রূপ কিছুই জানে না (জ্ঞাত হয় না)।

মানুষ সাধারণতঃ বিশ্বাস করে চক্ষু দ্বারাই দর্শন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। তাদের ধারণা দর্শন ক্রিয়া এবং চক্ষু একই বস্তু। কাদের চিন্তা এইভাবে পরিচালিত হয় : দর্শনই আমি। আমি বিষয় বা বস্তু দেখি। চক্ষু, দর্শন এবং আমি এই তিন এক এবং অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। চক্ষু এক বিষয় এবং দর্শন অন্য। বিষয় এবং আমি বা আত্মা বলতে কোনো ভিন্ন পুরুষ বা ব্যক্তির অস্তিত্ব এখানে নেই। এখানে আছে একমাত্র দর্শন ক্রিয়া যা চক্ষুকে নির্ভর করে উৎপন্ন হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন কোন এক ব্যক্তি ঘরে বসে আছে। এখানে ব্যক্তি এবং ঘর দুই পৃথক বস্তু। ঘর যেমন ব্যক্তি নয় তেমনি ব্যক্তিও ঘর নয়। দর্শন ক্রিয়ার সময়ও এই একই ক্রিয়াই প্রযোজ্য। চক্ষু এবং দর্শন ক্রিয়া দুই পৃথক বস্তু। চক্ষু এবং দর্শন ক্রিয়া দুই পৃথক বস্তু। চক্ষু দর্শনক্রিয়া নয় এবং অনুরূপভাবে দর্শনক্রিয়াও চক্ষু নয়।

এই প্রসঙ্গে অপর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। কোনো গৃহাভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি জানালা খুললে তার মধ্য দিয়ে বাইরের অনেক বস্তু দেখতে পায়। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কে দেখে? জানালা না সে ব্যক্তি? উত্তর হবে জানালার দেখার কোনো ক্ষমতা নেই। ব্যক্তিই দেখে। আবার যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সে ব্যক্তি কি জানালা ব্যতীত গৃহাভ্যন্তরস্থ বাইরের বস্তু দেখতে পায়? উত্তর হবে সেই ব্যক্তি জানালা ব্যতীত দেয়ালের মধ্য দিয়ে বাইরের কোন বস্তু দেখতে সক্ষম নয়। গৃহাভ্যন্তর হতে জানালার মধ্য দিয়েই বাইরের বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং দর্শনকালে দুই

পৃথক বস্তুর প্রয়োজন হয়। চক্ষু এবং দর্শন কার্য। চক্ষু দর্শন নয় আবার দর্শনকার্যও চক্ষু নয়। তৎসত্ত্বেও চক্ষু ব্যতীত দর্শনকার্য (দেখা নামক কাজ) সম্পন্ন হয় না। বস্তুতঃ চক্ষুকে নির্ভর করে দর্শন কার্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং দর্শনকার্য সম্পন্নকালে দেহস্থ নামরূপই মাত্র বিদ্যমান থাকে। এই দুয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় বস্তুরূপ (দর্শনীয় বস্তু) ও বিদ্যমান থাকে। কখনো কখনো দর্শনীয় বস্তু দেহে এবং কখনো কখনো দেহের বাইরে দৃষ্ট হয়। যদি তৃতীয় বিষয় ধরা হয় তবে তিন ধাতুই বিদ্যমান রয়েছে বলতে হয়। তন্মধ্যে দুইটি হল চক্ষু এবং দর্শনীয় বস্তু বা দর্শনযোগ্য বিষয়। এই দুইটি রূপ বিভাগের অন্তর্গত। তৃতীয় ধাতুটি হল মনধাতু যা দর্শনকার্য সম্পন্ন করে। চক্ষু এবং দর্শনীয় বস্তু রূপধাতু বলতে এদের জানার কোন ক্ষমতা নেই। দর্শনকার্য মনধাতু বলে এর চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়কে জানার ক্ষমতা আছে। এতে বোঝা গেল যে দর্শনকার্যে শুধুমাত্র পৃথক দুইটি ধাতু বিদ্যমান : নাম এবং রূপ। একই ক্ষণে এই দুইটি ধাতুর যুগ্ম উৎপত্তিতে দর্শনকার্য সম্পন্ন হয়।

যাঁরা বিদর্শন ভাবনা শিক্ষা করেন নি অথবা যাঁদের বিদর্শন ভাবনায় জ্ঞান নেই তাঁদের ধারণা দর্শন (কার্য) আত্মা বা সত্ত্ব বা জীবাত্মা বা পুরুষের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই প্রকার দৃষ্টিকে পালি সাহিত্যে সৎকায় দৃষ্টি (সৎকায় দিট্ঠি) বলে অভিহিত করা হয়েছে। পালি 'সৎকায়' শব্দের অর্থ নাম ও রূপের পৃথক পৃথক বিদ্যমানতা। 'দিট্ঠি' শব্দের দ্যোতনা হল মিথ্যাদৃষ্টি। 'সৎকায় দিট্ঠি' শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হল নাম-রূপের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তৎপ্রতি মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত বিশ্বাস।

দর্শনকার্যে যা প্রকৃতপক্ষে উপস্থিত থাকে তা হচ্ছে চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় বা রূপপুঞ্জ। প্রকৃত দর্শন হল মানসিক বা মনগ্রাহ্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে দর্শন ক্রিয়ায় এই দুই বিষয়ই নিশ্চিতরূপে উপস্থিত থাকে। তৎসত্ত্বেও সাধারণ মানুষ মনে করে আত্মা বা সত্ত্ব জীবাত্মা বা পুরুষ দর্শন করে। মানুষের এই প্রকার ধারণাকে আত্মধারণা বা সৎকায় দৃষ্টি বলা হয়েছে।

যতদিন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি সৎকায় দৃষ্টি থেকে মুক্ত না হবেন ততদিন পর্যন্ত তার পক্ষে দুঃখময় নরক বা পশু বা প্রেত জীবন লাভ করা থেকে রেহাই নেই। যদিও সে মানব জন্মে ও দেবজন্মে কৃত পুণ্যের ফল-স্বরূপ সুখী জীবন যাপন করে তবু তৎকৃত অকুশল কর্মের দুঃখময় ফল মানবেতর জীবন ভোগ করতে হয়। তাই ভগবান বুদ্ধ নির্দেশ দিয়েছেন : সৎকায় দৃষ্টির বিনাশ (ধ্বংস সাধন) নিতান্ত প্রয়োজন : "সৎকায় দিট্ঠিপ্পহানায় সতো ভিক্ষু পরিব্বজে।" এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা এরূপ :—যদি প্রত্যেক মানুষ ইচ্ছা করে সে যেন জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু কবলিত না হয়, এ ব্যাপারে কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে না।

মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। পুনর্জন্ম কোন জীবের কোন স্তরে হবে তা কারো ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। নরক, পশুযোনি এবং প্রেতলোকে জন্মগ্রহণ কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা রোধ করা যায় না। এই সকল জীবস্তরে জন্মগ্রহণ স্বীয় কর্ম প্রভাবেই হয়। এই কারণে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন বিবর্তন অত্যন্ত ভয়াবহ। সংসারের দুঃখময় পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য সকলের সচেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন। অতঃপর সংসার থেকে নিবৃত্তি বা নির্বাণ লাভের উপায় কি তা জানার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। নির্বাণ লাভ করা এ জীবনে যদি সম্ভব নাও হয় তবু নরক, পশুযোনি বা প্রেতলোকে উৎপন্ন হওয়ার কারণ রোধ করার জন্য সচেষ্টিত হতে হবে। এ জন্য সর্বপ্রথম সংসার দৃষ্টির মূলোৎপাটন করতে হবে। সংসার দৃষ্টি আর্যমার্গ ও আর্যফল লাভে এবং শীল সমাধি প্রজ্ঞা অনুশীলন দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যায়। শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা কি ভাবে অনুশীলন করা যেতে পারে? ‘সতো’ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ দ্বারা। ‘পরিব্রজে’ অর্থাৎ ক্রেশ বিমুক্তি দ্বারা। সংসার দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যোগী পুরুষকে দর্শন-শ্রবণ-স্মরণ-স্বাদ-স্পর্শ এবং মনন প্রভৃতি কায়িক এবং মানসিক কর্মের নিরন্তর নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের কাজে নিরত থাকতে হবে। বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনরত যোগী পুরুষ ক্রমে ভাবনার দ্বারা আর্যমার্গ লাভ করবেন। সংসার দৃষ্টি তখন সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হবে এবং নরক, পশুযোনি বা প্রেতলোকে উৎপত্তির দ্বার তার নিকট রুদ্ধ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে প্রত্যেক দর্শন ক্রিয়ায় শুধুমাত্র দর্শনীয় বিষয়কে নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ করা। প্রতিটি দর্শন-ক্রিয়া এভাবে ধারণা করতে হবে — ‘দেখছি, দেখছি’। নিরীক্ষণ করা বা ধারণা করা বা পর্যবেক্ষণ করা বা ভাবনা করা অর্থে বোঝায় মনকে দৃশ্যমান বিষয়ের প্রতি একাগ্রভাবে সন্নিবিষ্ট রেখে তাকে সুস্পষ্টরূপে জানা। দেখছি দেখছি বলে পর্যবেক্ষণ করলে সময়ে কোনো দর্শনীয় বস্তু দেখা যায়, সময়ে দর্শন-চিন্তা, সময়ে রূপচক্ষু অথবা যে স্থান থেকে দেখা হয় সে স্থানও দেখা যায়। এই তিনের যে কোন একটিকে নির্দিষ্টরূপে দর্শনই ভাবনার কাজ। যদি এভাবে দেখা না হয় তবে দর্শনক্রিয়াকে অবলম্বন করে সংসার দৃষ্টি উৎপন্ন হবে। যার ফলে দর্শনক্রিয়াকে ব্যক্তি বা ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন নিত্য সুখ ও আত্মা বলে মনে হবে। তজ্জন্য আসক্তি বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হবে। এই ক্রেশসমূহ তখন কর্মে পরিণত হবে এবং সেই কর্মই পুনর্জন্মের কারণ হবে। এভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ কার্যকরী হয় এবং দুঃখময় সংসার প্রবর্তন নিরবচ্ছিন্নভাবে গতি প্রাপ্ত হয়। শুধুমাত্র দর্শন ক্রিয়া হতে উৎপন্ন সংসারের আবর্তন-বিবর্তনকে রুদ্ধ করার জন্য — ‘দেখছি, দেখছি’ রূপে প্রত্যেক দর্শন ক্রিয়াকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে।

অনুরূপভাবে শ্রবণ কার্যের সময় দুই ধাতু যথা নাম ও রূপ বিদ্যমান থাকে। কর্ণকে নির্ভর করে শ্রবণ কার্য উৎপন্ন হয়। কর্ণ এবং শব্দ দুইটি হল রূপধাতু এবং শ্রবণ কার্যকে জানা হল মনধাতু। এই দুই অর্থাৎ কর্ণ ও শব্দ নামক রূপকে এবং মনকে সঠিকভাবে জানার জন্য প্রত্যেক শ্রবণ কার্যের সময় — ‘শুনছি, শুনছি’ রূপে ধারণা করতে হবে। ঠিক একইভাবে প্রত্যেক গন্ধ গ্রহণ কালে — ‘গন্ধ পাচ্ছি, গন্ধ পাচ্ছি’ রূপে এবং প্রত্যেক স্বাদ গ্রহণ কালে — ‘জানছি, জানছি’ রূপে ধারণা করতে হবে।

শারীরিক বেদনা অনুভব কালেও — ‘জানছি, জানছি’, অথবা ‘অনুভব করছি, অনুভব করছি’ রূপে ধারণা করতে হবে। সকল দেহে ‘কায়-প্রসাদ’ নামক এক প্রকার রূপধাতু আছে যা স্পর্শ (অনুভূতি) গ্রহণ করে। প্রত্যেক স্পর্শে দুইটি রূপধাতু বিদ্যমান, স্পর্শেন্দ্রিয় এবং স্পর্শ (অনুভূতি) এবং একটি মনধাতু উপস্থিত থাকে। এই মনধাতু হল স্পর্শানুভূতি বা স্পর্শকে জানা। এই বিষয়গুলিকে পরিষ্কারভাবে জানার জন্য প্রত্যেক স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে — ‘স্পর্শ হচ্ছে, স্পর্শ হচ্ছে’ রূপে অনুশীলন করতে হবে। সাধারণ স্পর্শ বিষয়ে একথা বলা হল। তাছাড়া বিশেষ স্পর্শানুভূতিও আছে যা দুঃখপ্রদ বা প্রতিকূল স্পর্শ যথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসারতা বা ক্লান্তি অনুভব করায়, গরম বা শীত অনুভব করায়, ব্যথা বা যন্ত্রণা ইত্যাদি অনুভব করায়। এই সকল মুখ্য বেদনা অনুভূতি কালে — ‘জড়তা-ক্লান্তি-গরম-শীত-ব্যথা-অসারতা-যন্ত্রণা (অনুভব করছি)’ বা যখন যা অনুভূত হয় তখন তা ধারণা করতে হবে। নড়াচড়া করবার সময়ও নানা প্রকার স্পর্শানুভূতি হয়। মন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে বা চলতে ফিরতে বা প্রসার করতে ইচ্ছা করে বলে রূপের নড়াচড়া বা গতি লাভ করা, বিস্তার করা, নত করা প্রভৃতি শারীরিক কর্ম সম্পাদিত হয়। (এ সকল কার্য প্রথম প্রথম ধারণা করা যায় না। ভাবনা অনুশীলন কর্মে দক্ষতা অর্জন করলে এরূপ ধারণা করা সম্ভব হয়। শ্রুতময় জ্ঞান অর্জনের জন্য একথা এখানে বলা হল)। দৈহিক সকল প্রকার কর্ম মন দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে। মন যখন ইচ্ছা করে তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়। এ সকল বিষয় দ্রুত লুপ্ত হয়ে যায় বা থেকে যায়। (এসকল কার্য সম্পাদন মুহূর্তে কি প্রকারে ধারণা করতে হয় তা পরে আলোচনা করা হবে)।

শারীরিক যে কোন কার্য সম্পাদনের পূর্বে মনে কাজ করবার ইচ্ছা জাগে যার ফলে হাত-পা ইত্যাদিতে কর্ম শুরু হয়; যথা শক্ত করা, শিথিল করা, নোয়ানো বা প্রসার করা, এদিক ওদিক সঞ্চালন করা ইত্যাদি। এ সকল কর্ম কায়-প্রসাদে আঘাতের মত আসে। এরূপ প্রত্যেক রূপের ক্রিয়ার সঙ্গে অনুভূতি-গুণের যখন সংঘাত হয়

তখন কায় বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় যা স্পর্শানুভূতিকে অনুভব করে বা জানে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রূপের কর্মই অধিকাররূপে আধিপত্য বিস্তার করে। যদি ঐরূপ উপলব্ধি না হয় তবে মিথ্যাদৃষ্টিতে জড়িতে পড়তে হবে — যেমন আমি নত হচ্ছি অথবা আমি বিস্তার করছি অথবা আমার হাত, আমার পা ইত্যাদি। নমিত হওয়া, বিস্মৃত হওয়া, গতি প্রাপ্ত হওয়া প্রভৃতিকে নিয়ে (উক্তভাবে) অনুশীলন চালানোর অর্থ হল মিথ্যাদৃষ্টির অবসান করা।

চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েও বলতে হয়, সকল মানসিক কর্ম যথা — চিন্তা করা, কল্পনা করা ইত্যাদি মনজাত বা মনকে নির্ভর করে উৎপন্ন হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যত সব মানসিক কর্ম, দেহকে নির্ভর করে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক কর্ম নাম-রূপ সংস্কৃতির অভিব্যক্তিঃ মনবাস্তব বা দেহ হল রূপ; আবার চিন্তা করা, কল্পনা করা ইত্যাদি হল মন। নাম-রূপকে (বা মন ও রূপকে) সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য — ‘চিন্তা করছি, কল্পনা করছি’ রূপে ধারণা করতে হবে।

উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী কিছু সময় (বা দিন) ভাবনা অনুশীলন করলে সমাধির উন্নতি হবে। যোগী দেখতে পাবেন মন আর পূর্বের মত যত্রতত্র বিচরণ করছে না বরঞ্চ নির্দিষ্ট ধ্যেয় বিষয়ে একাগ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতারও কিছু উন্নতি হয়েছে। প্রতিটি পর্যবেক্ষণের সময় তিনি শুধুমাত্র দেখতে পান নাম ও রূপ নামক দুই ধাতুর কার্যপ্রক্রিয়া। পর্যবেক্ষণের সময় তিনি উপলব্ধি করেন বিষয় (রূপ) এবং মনই মাত্র উৎপন্ন হচ্ছে।

এভাবে বেশ কিছু দিন ভাবনা অনুশীলন করে ভাবনার গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন যে বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নিত্য রূপে বিদ্যমান থাকে না — সবই যেন অনিত্যতার প্রবাহ। যখন নূতন বিষয় উৎপন্ন হয়, তার প্রত্যেকটি উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধারণা করা হয় এবং তারপর তা বিনাশ প্রাপ্ত হয় (অন্তর্ধান হয়)। পরক্ষণে অন্য বিষয় উৎপন্ন হয়, তাও ধারণা করা হয় এবং তাও পরক্ষণে লয় প্রাপ্ত হয়। এভাবে বিষয়ের উৎপত্তি এবং বিনাশ অবিরত চলতে থাকে — তাতেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কিছুই নিত্য বা স্থায়ী নয়। তখন যোগী সিদ্ধান্তে আসেন — বিষয় বা বস্তু কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কারণ সেগুলির উৎপত্তি এবং বিনাশ পর্যবেক্ষণ বা ধারণাকালে তিনি অনিত্যতার প্রমাণ পেয়ে যান। ইহা অনিচ্ছানুপস্ফসনা ঞ্জাণ (অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান)।

এই অনিচ্ছানুপস্ফসনা জ্ঞান লাভের পর যোগী হৃদয়ঙ্গম করেন উৎপত্তি এবং বিনাশ কোনটাই কাম্য নয়। ইহা দুঃখানুপস্ফসনা জ্ঞান (দুঃখানুদর্শন জ্ঞান)। তা ছাড়াও

যোগী দেহে সচরাচর নানা প্রকার বেদনা যথা ক্লান্তি, গরম, জ্বালা, যন্ত্রণা ইত্যাদি অনুভব করেন। এ সকল বেদনাকে ধারণা (অনুভব) করার সময় তিনি সাধারণতঃ মনে করেন এ দেহ একটি দুঃখপুঞ্জ। ইহা দুঃখানুপস্‌সনা এগাণ (দুঃখানুদর্শন জ্ঞান)।

যোগী তখন প্রত্যেক পর্যবেক্ষণ কার্যের সময় বুঝতে পারেন যে নাম-রূপ নিজস্ব স্বভাববশতঃ কাজ করে যাচ্ছে — ইহা কারও ইচ্ছাপ্রসূত কর্ম নয়। তখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করেনঃ এ সবই ধাতুর কাজ, এগুলিকে শাসন করা যায় না, এগুলি কোন পুরুষও নয়, জীবাত্মাও নয়। ইহা অনন্তানুপস্‌সনা এগাণ (অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান)। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হলে মার্গজ্ঞান ও ফলজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে এবং নির্বাণ দর্শন হয়। নির্বাণ দর্শন বিমুক্তির প্রথম স্তর, তখন যোগী মানবেতর দুঃখময় জীবন লাভ থেকে মুক্ত হন। তাই প্রত্যেকের অন্ততঃ বিমুক্তির প্রথম সোপানে (স্তরে) আরোহণের চেষ্টা করা উচিত।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি বিদর্শন ভাবনার প্রকৃত পদ্ধতি হল ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে অবিরত যে দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শ-স্বাদ-গ্রহণ ও স্পর্শন-মনন কার্য চলতে থাকে তখন তার ধারণা বা পর্যবেক্ষণ বা ভাবনা করা। নতুন যোগীর পক্ষে অবিরত আগত নাম রূপ ক্রিয়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়, কারণ তাঁর স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা এখনও দুর্বল। দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কর্ম অতি দ্রুত সম্পাদিত হয়। দর্শনের সময় শ্রবণ কর্ম, শ্রবণের কার্য এক সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। সাধারণতঃ দর্শন-শ্রবণ-চিন্তন-কল্পনাকার্য একসঙ্গে সম্পন্ন হয় বলে মনে হয়। কোনটি আগে, কোনটির পরে সম্পন্ন হল তা বোঝা যায় না কারণ তা অত্যন্ত দ্রুত সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে দর্শনের সময় শ্রবণ কার্য এবং শ্রবণের সময় দর্শন কার্য সম্পন্ন হয় না। এইসব ঘটনা এক সময়ে একটা মাত্র সংঘটিত হতে পারে। যে যোগী সবেমাত্র অনুশীলন আরম্ভ করেছেন এবং এখনও স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞার স্কুরণ করতে সমর্থ হননি, তাঁর পক্ষে অবিরত পর পর সংঘটিত নাম-রূপ ক্রিয়ার ঘটনা পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। নবযোগীর পক্ষে সকল নাম-রূপ ক্রিয়ার ঘটনা অনুধাবন না করে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া নিয়েই অনুশীলন শুরু কতে হবে। দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়া যখন ঘটে তখন মনোযোগ দেওয়া যায়। যদি যোগী দৃশ্য বা শব্দে মনোযোগ না দেন তবে তিনি দর্শন ও শ্রবণ কার্যকে আক্ষেপ না করে সময় কাটাতে পারেন। আমাদের স্পর্শ-গ্রহণ কুচিৎ সম্পাদিত হয়। স্বাদ গ্রহণ শুধুমাত্র আহারের সময় হয়। যোগী দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শ ও স্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হওয়ার সময় যে সকল কার্য পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। সাধারণতঃ দৈহিক স্পর্শানুভূতি স্পষ্টভাবে সর্বসময়ে বিদ্যমান থাকে। উপবেশন কালে দৈহিক ঋজুতা এবং কঠিনতা

স্পর্শানুভূতি স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। তাই উপবেশনরত অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করে — ‘বসেছি, বসেছি’ রূপে ধারণা করতে হবে।

দেহকে সোজা করে উপবেশন করার মধ্যে অনেক কায়িক কর্ম মনের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে সম্পন্ন হয়। এই দেহ একটি বায়ুপূর্ণ রবারের বলের মত যা ভিতরের বায়ুর চাপের দ্বারা গোলাকার আকৃতি রক্ষা করে। উপবেশন অবস্থাতে শরীরকে স্থির অবস্থায় রাখার জন্যও অবিরত বিবিধ শারীরিক কর্মের প্রয়োজন হয়। ভারী দেহকে সোজা স্থির করে রাখার জন্যও অনেক শক্তির প্রয়োজন। মানুষ সাধারণতঃ মনে করে শিরা-উপশিরাই দেহকে এভাবে সোজা ও স্থির করে রাখে। এ ধারণার মধ্যেও সত্যতা আছে, কারণ শিরা-উপশিরা, রক্ত, মাংস, হাড় প্রভৃতি রূপধাতু ব্যতীত আর কিছু নয়। শরীরের ঋজুতা যা শরীরকে স্থির অবস্থায় রাখে তা রূপ বিভাগের অন্তর্গত এবং তা বায়ুপূর্ণ বলের মত শিরা-উপশিরায়, রক্তে, মাংসে (ইত্যাদি) সর্বদেহে উৎপন্ন হয়। দেহের এই ঋজুতাই বায়ুধাতু। বায়ুধাতুর উপস্থিতিতে দেহ স্থির অবস্থায় থাকে এবং ইহাই দেহ-ঋজুতা যা অবিরত উৎপন্ন হচ্ছে। গাঢ় তন্দ্রা অবস্থায় ঋজুতা থেকে কোন ব্যক্তির যে বিচ্যুতি হয় তার কারণ তখন দেহে ঋজুতা উৎপাদনের উপাদান সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। গাঢ় তন্দ্রা বা নিদ্রা মনের ভবাস্ত্র অবস্থা। ভবাস্ত্র অবস্থায় মানসিক কর্ম অনুপস্থিত থাকে এবং গাঢ় তন্দ্রা বা নিদ্রা অবস্থায় দেহ শায়িত থাকে। গমন কালে মানসিক কর্ম অবিরত উৎপন্ন হয়, কারণ এ সময় ঋজুতা উৎপাদক বায়ুধাতু অনবরত উৎপন্ন হতে থাকে। এ সকল বিষয় অবগত হওয়ার জন্য ‘বসেছি, বসেছি, বসেছি’ বলে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। (ইহা দ্বারা একথা বুঝায় না যে শারীরিক ঋজুতা সন্ধান করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।) শুধুমাত্র উপবেশন অবস্থার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে অর্থাৎ শরীরের নিচের বৃত্তাকার অংশে এবং উপরের সোজা স্থির অংশে মনোযোগ দিতে হবে।

উপবেশনরত অবস্থার প্রতি চিন্তা সংযোগ করে একটি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ অনুশীলন অত্যন্ত সহজ এবং তাতে বেশি প্রচেষ্টারও দরকার হয় না। এই প্রকার অনুশীলনে বীর্য প্রকাশের প্রয়োজন কম বরং এতে সমাধিই প্রবল হয়। যোগী এরূপ অনুশীলনে বেশিক্ষণ ‘বসেছি, বসেছি, বসেছি’ রূপে বার বার পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আলস্য অনুভব করতে পারেন; সমাধি প্রবল এবং বীর্য প্রকাশ কম হলে সাধারণতঃ আলস্য আসে। ইহা খীনমিদ্ধ (দেহ মনের অলসতা এবং অকর্মণ্যতা), তখন আরও বীর্য উৎপন্ন করতে হবে এবং পর্যবেক্ষণীয় বিষয়ও বৃদ্ধি করতে হবে। ‘বসেছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করার পর, শরীরের যে স্থানে স্পর্শ অনুভূত হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট স্থানে চিন্তা স্থাপন করে — ‘স্পর্শ হচ্ছে’ রূপে ধারণা করতে হবে। হাত, পা বা কোমরে

অর্থাৎ শরীরের যে কোন স্পর্শ অনুভূতি স্থানে চিত্ত স্থাপন করে — ‘স্পর্শ হচ্ছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করলেই চলবে।

দৃষ্টান্ত : উপবেশনরত অবস্থাকে ‘বসেছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করার পর, দেহের যে স্থানে স্পর্শানুভূতি হচ্ছে সে স্থানে মন স্থাপন করে — ‘স্পর্শ হচ্ছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এরূপ পর্যবেক্ষণ উপবেশনরত অবস্থা এবং স্পর্শানুভূতি স্থানে অনুক্রমে ‘বসেছি, স্পর্শ হচ্ছে, বসেছি, স্পর্শ হচ্ছে, বসেছি, স্পর্শ হচ্ছে’ বলে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ স্থানে ধারণা করা, পর্যবেক্ষণ করা, ভাবনা অর্থে একটি বিষয়ে চিত্তকে স্থির করা বুঝায়। যাদের ভাবনা অনুশীলনের অভ্যাস আছে তাঁদের পক্ষে এ কাজ সহজ হবে আর যাদের অভ্যাস নেই তাঁদের পক্ষে এরূপ অনুশীলন একটু কঠিন হবে বই কি।

নতুন যোগীদের পক্ষে সহজতর ভাবনা পদ্ধতি হচ্ছে শ্বাস নেওয়া ও প্রশ্বাস ফেলার সময় উদরের যে উঠা-নামা হয় তা নিয়ে ভাবনা আরম্ভ করা। এভাবে অনুভূত এবং উত্থান-পতন নিয়ে ভাবনা আরম্ভ করা নবযোগীদের পক্ষে উত্তম। বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক শিক্ষায় সহজ পাঠ অধিগত করা যেমন প্রাথমিক কর্তব্য, তেমনি বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনেও নতুন যোগী সরল পদ্ধতিতে অনুশীলন আরম্ভ করে সহজে সমাধি এবং প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

বিদর্শন ভাবনার উদ্দেশ্য হল দেহস্থ কোন মুখ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাবনা আরম্ভ করা। নাম ও রূপ, এ দুয়ের মধ্যে মনধাতু অতি সূক্ষ্ম; রূপ ধাতু বিশেষ স্পষ্ট। সে কারণে নবযোগীর পক্ষে প্রথমতঃ রূপধাতুকে নিয়ে ভাবনা অনুশীলন করাই শ্রেয়। রূপধাতুর মধ্যে আবার উপাধারূপ (রূপ থেকে উৎপন্ন রূপ) অতি সূক্ষ্ম এবং স্পষ্ট নয় তবে মহাভূতরূপ। (পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু) স্পষ্ট এবং মূখ্যরূপে প্রতিভাত। তাই রূপধাতুকে ভাবনা অনুশীলনে প্রথমে স্থান দেওয়া হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের উত্থান-পতনে বায়ু-ধাতুই প্রধানতঃ স্পষ্ট। ঋজুতা (প্রক্রিয়া) এবং উদরের গতিশীলতা (উত্থান-পতন) যা ভাবনায় পর্যবেক্ষণ করা হয় তা বায়ুধাতুর কাজ ব্যতীত আর কিছু নয়। তাতে দেখা যাবে বায়ুধাতুই প্রথমতঃ স্পষ্ট (বা স্পর্শ) হয়। সতিপট্টান সূত্রের উপদেশ অনুযায়ী যোগীকে গমন, দাঁড়ান, উপবেশন, শয়নকালে — ‘যাচ্ছি দাঁড়িয়েছি-বলেছি-শয়ন করছি’ রূপে স্মৃতি সহকারে সম্পন্ন করতে হবে (বা এ সকল কার্যে স্মৃতিশীল থাকতে হবে)। অন্যান্য শারীরিক কর্মেও যখন যা ঘটে তার প্রতি যোগীকে স্মৃতিশীল থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে অর্থ কথায় উল্লেখ আছে যোগীকে অন্য তিন ধাতুর চাইতে বায়ু-ধাতুর প্রতিই প্রাথমিকভাবে স্মৃতিশীল হতে হবে। সাধারণতঃ প্রত্যেক শারীরিক কর্মে চার মহাভূতরূপই প্রবল থাকে এবং তাদের যে কোন একটিকে অনুভব করতে

হবে। উপবেশনরত অবস্থায় উদরের উত্থান-পতন শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় তাই উদরের উত্থান ও পতনের প্রতি মনযোগ রেখে পর্যবেক্ষণ বা ভাবনা আরম্ভ করতে হয়।

শ্রুতময় জ্ঞান আহরণের জন্য বিদর্শন ভাবনার কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য পদ্ধতির অবতারণা করা গেল। এমন বিস্তৃতভাবে মৌলিক অনুশীলনের বিষয় বলা হবে। উদরের উঠা-নামা ভাবনা করবার সময় যোগীকে উদরের উপর মন রাখতে হবে। তাতে তিনি শ্বাস গ্রহণের সময় উদরের উর্ধ্বগতি এবং প্রশ্বাস ত্যাগ কালে উদরের অধোগতিকে লক্ষ্য করবেন। তিনি উর্ধ্বগতির সময় — ‘উঠছে’ রূপে আর অধোগতির সময় — ‘নামছে’ রূপে মানসিক ধারণা করবেন। যদি উদরের উর্ধ্ব ও নিম্নগতির অনুভূতি না হয় (তাতে চিত্ত সংযোগ করেও) তবে দুই হাত উদরের উপর স্থাপন করতে হবে। যোগী কোন কারণে বা অবস্থাতে তাঁর স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি পরিবর্তন করবেন না, অর্থাৎ শ্বাসের গতি দীর্ঘ, হ্রস্ব, রুদ্ধ বা ত্বরান্বিত করবেন না এবং গভীরও করবেন না। যদি তিনি তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির পরিবর্তন করেন তবে শীঘ্র তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এ অবস্থায় যুক্তিযুক্ত যে যোগী স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বজায় রাখবেন এবং উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণে নিরত থাকবেন।

উদরের উর্ধ্বগতির মুহূর্তে — ‘উঠছে’ এবং নিম্ন বা অধোগতির মুহূর্তে ‘নামছে’ রূপে মানসিক ধারণা করতে হবে। এভাবে ধারণা করার সময় কখনও মুখে শব্দ উচ্চারণ করবেন না। বিদর্শন ভাবনায় ‘নাম’ মাধ্যমে জানার চাইতে প্রকৃত বিষয়কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই যোগীর পক্ষে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত (উদরের) উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতির প্রতি সর্বদা এমনি স্মৃতিশীল থাকতে হবে যেন তিনি এই দুই গতিকে চোখ দিয়ে দেখছেন। যখন উর্ধ্বগতি আরম্ভ হয় তখন মনকে সে গতির নিকট বেঁধে দিতে হবে। উর্ধ্বদিকে এক খণ্ড পাথর ছুঁড়লে তা যেমন উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয় তেমনি প্রতিবার জ্ঞাতা মনকেও উদরের গতির সঙ্গে নিবদ্ধ রাখবে। সেরূপ যখন উদরের নিম্নগতি আরম্ভ হয়, জ্ঞাতা মনকে নিম্নগতির সঙ্গে নিবদ্ধ রাখবে।

যখন পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোন বিশেষ বিষয় বা নিমিত্ত থাকবে না তখন যোগী এই দুই গতির (উদরের উঠা-নামা) পর্যবেক্ষণ করে — ‘উঠছে নামছে’, ‘উঠছে, নামছে’, ‘উঠছে, নামছে’ রূপে ধারণা করে অনুশীলনরত থাকবেন। এরূপ অনুশীলনরত থাকাকালে এমনও হতে পারে মন এই পর্যবেক্ষণ হতে সরে এসে অন্যত্র ভ্রমণ করছে। সমাধি যখন দুর্বল থাকে তখন মনকে বেশে রাখা কঠিন হয়। যদিও মনকে ‘উঠছে, নামছে’ অনুশীলনে নিবদ্ধ রাখা হয়েছে তবুও সে অন্যত্র

ঘুরে বেড়াবে। এরূপ ভ্রাম্যমাণ মনকে একা ছেড়ে দিতে নেই; যখনই মন অন্যত্র গমন করবে তখন মন ‘ঘুরছে, ঘুরছে’ রূপে ধারণা করতে হবে। এক বা দুইবার এরূপ ধারণা করলে মন ভ্রমণ থেকে বিরত হয়। তখন পূর্ব অনুশীলন যথা ‘উঠছে, নামছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ রত হতে হবে। যখন মনে হবে মন আবার অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে তখন ‘পৌঁছেছি, পৌঁছেছি’ রূপে ধারণা করতে হবে। তারপর আবার — ‘উঠছে, নামছে’ রূপে ধারণা করে উদরের উঠা-নামা গতির উপর অনুশীলন আরম্ভ করতে হবে। কল্পনায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে ‘দেখা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে’ রূপে ধারণা করতে হবে তারপর নিয়মিতভাবে পূর্ব-রূপ অনুশীলন করে যেতে হবে। কল্পনায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কথা আরম্ভ হলে ‘কথা বলছি, কথা বলছি’ রূপে ধারণা করতে হবে। অর্থাৎ সকল মানসিক কার্যে ধারণা করতে হবে। দৃষ্টান্ত : চিন্তা করার সময় ‘চিন্তা করছি’ বিবেচনা করার সময় ‘বিবেচনা করছি’, কল্পনা করার সময় ‘কল্পনা করছি’, সঙ্গ দেওয়ার সময় ‘সঙ্গ দিচ্ছি’ আনন্দ করার সময় ‘আনন্দ করছি’, অনুভব করার সময় ‘অনুভব করছি’, আলস্য এলে ‘আলস্য এসেছে’, সুখ অনুভব করলে ‘সুখ অনুভব করছি’, বিরক্তি লাগলে ‘বিরক্তি লাগছে’ — অর্থাৎ যখন যা ঘটে বা মনে উৎপন্ন হয় তখন তাদের সেভাবে ধারণা করতে হবে। মানসিক কার্যাবলী নিয়ে এরূপ ভাবনা করাকে চিন্তানুপসসনা (চিন্তানুদর্শন) বলা হয়।

সাধারণ মানুষের বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে কার্যকরী জ্ঞানের অভাবে তারা মনের প্রকৃত অবস্থা অবগত নন। এরূপ জ্ঞানের অভাবে তারা মনকে পুরুষ, আত্মা অথবা জীবাত্মা মনে করে মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়। সাধারণতঃ তাদের বিশ্বাস আমি কল্পনা করছি, আমি চিন্তা করছি, আমি পরিকল্পনা করছি, আমি জানছি ইত্যাদি। তারা মনে করে এক জীবাত্মা বা আত্মা শিশুকাল থেকে বার্ষিক্য পর্যন্ত (এ দেহে) বর্ধিত হয় ও বেঁচে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে দেহে কোন জীবাত্মার অস্তিত্ব নেই। বস্তুতঃ এ দেহে মনধাতুর নিরবচ্ছিন্ন গতি বা ক্রিয়া রয়েছে যা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিক্ষণে পর পর উৎপন্ন হচ্ছে। এই সত্য অবগত হবার জন্য ভাবনা অনুশীলন নিয়মিতভাবে করতে হবে। মন এবং মনের উৎপত্তির প্রকৃতি বিষয়ে ভগবান বুদ্ধ ধর্মপদ বলেছেন :-

দুরঙ্গমং একচরং, অসরীরং গুহাসয়ং

যে চিন্তং সঞ্ঞমেসসন্তি, মোক্খন্তি মারবন্ধনা।

দুরঙ্গমং = প্রতিনিয়ত দূরে গমন করে।

মন সাধারণতঃ দূরে, অতিদূরে গমন করে। যোগী যখন আপন গৃহে তাঁর

কর্মস্থানকে উপলক্ষ করে ভাবনা অনুশীলন করেন তখন তিনি বুঝতে পারেন তাঁর মন বহুদূর স্থানে বিচরণ করছে। তিনি আরও উপলব্ধি করেন, তার মন পূর্ব পরিচিত স্থানে চিন্তা বা কল্পনামাত্রই ঘুরে বেড়াতে পারে। এই সত্য ভাবনার মাধ্যমে আবিষ্কার করা যায়।

একচরং = সাধারণতঃ একক রূপে ক্ষণে ক্ষণে পর পর উৎপন্ন হয়। যারা এ সত্য বিষয়ে অজ্ঞ তারা মনে করে এক মনই এক জীবনকালে বা এক জীবন প্রবাহে দেহে অবস্থান করে। তারা জানে না যে নূতন মন প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হয়। তারা মনে করে অতীতের দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি এবং বর্তমানের দর্শন, শ্রবণ একই মনপ্রসূত বা এক মনযুক্ত এবং দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, জানা প্রভৃতি একাধিক কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। এরূপ ধারণাই মিথ্যাদৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে নূতন মন প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হচ্ছে। এ সত্য ভাবনা অনুশীলনে উন্নতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়। চিন্তা বা কল্পনা করার সময় তা পরিষ্কারভাবে অনুভূত হয়। কল্পনা অন্তর্হিত হয়ে যায়, যখন ‘কল্পনা করছি, কল্পনা করছি’ রূপে ধারণা করা হয়, সেরূপ পরিকল্পনা করাও অন্তর্হিত হয়, যখন ‘পরিকল্পনা করছি, পরিকল্পনা করছি’ রূপে ধারণা করা হয়। এ সকলের উৎপত্তি, পর্যবেক্ষণ এবং অন্তর্ধান, মালার পুঁতির মতন মনে হয়। এক্ষেত্রে পূর্বক্ষণের মন পরবর্তী ক্ষণের মন নয়। এই দুই ক্ষণের মন ভিন্ন ভিন্ন। এ সত্য ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধ হয় এবং তার জন্য ব্যক্তি বিশেষের ভাবনা অনুশীলন করা দরকার।

অসরীরং = দেহহীন।

মনের কোন আকৃতি বা রূপ নেই। রূপ ধাতুর মত একে পরখ করার কোন সহজ উপায় নেই। রূপের শারীরিক গঠন মাথা, হাত, পা ইত্যাদি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান এবং তা সহজেই চেনা যায়। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় রূপ কি? তবে নির্দিষ্ট করে তা দেখান যায়। কিন্তু মনের সহজ বর্ণনা দেওয়া যায় না; কারণ এর কোন রূপও নেই, আকৃতিও নেই। গবেষণা গৃহে এর কোন পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলে না। তবে যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারেন, যদি বলা হয় — যা কোন বিষয় বা বস্তুকে জানে তাই মন। মনকে বিশেষভাবে জানতে হলে ভাবনার প্রয়োজন, তবেই মন যখন উৎপন্ন হয় তখন মনকে জানা যাবে। ভাবনা যখন সুন্দরভাবে অগ্রসর হয় তখন বিষয়ের প্রতি মনের সংযুক্তি হওয়া সহজে হৃদয়ঙ্গম হবে বা জানা যাবে। তখন মনে হবে মন যেন বিষয়ের প্রতি দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। মনের বিশেষ প্রকৃতিকে জানার জন্য ভাবনা অনুশীলনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গুহাসয়ং = গুহায় বাস করে।

মনবাস্তব এবং দেহে অবস্থিত অন্যান্য ইন্দ্রিয়দ্বারকে নির্ভর করে মন উৎপন্ন হয় - তাই মনকে গৃহবাসী বলা হয়।

যে চিত্তং সঞ্জ্ঞমেসসত্তি, মোক্ষন্তি মারবন্ধনা-যদি যোগী মনকে সংযত করতে পারেন তবে তিনি মার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি — প্রতিটি মন উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা দ্বারা মনকে সংযত করা যায়। যোগী মনকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করতে পারলে মৃত্যু-বন্ধন থেকে মুক্ত হন। সুতরাং প্রতিবার মন উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সংযত করার প্রয়োজন আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় — মনের কোন ইচ্ছাকে — ‘ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে’ রূপে এক বা দুইবার পর্যবেক্ষণ করা যায় তবে ইচ্ছার বিলুপ্তি হয়। তারপর সেই উদরের উঠা-নামায় — ‘উঠছে নামছে; উঠছে, নামছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করে যেতে হবে।

অধিক সময় উপবেশন রত থাকায় দেহে নানা প্রকার অস্বস্তিকর অনুভূতি — ভারী, গরম, শীত ইত্যাদি অনুভূত হয়, এ সকল অনুভূতিকে (যখন উৎপন্ন হয় তখন) পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ এই অনুভূতির মধ্যে মন নিবদ্ধ করে এভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে — ভার অনুভব করলে ‘ভারী, ভারী’ অথবা গরম অনুভব করলে ‘গরম, গরম’ অথবা দুঃখবেদনা অনুভব করলে ‘দুঃখ, দুঃখ’; আবার হুল ফুটান রূপ অনুভূতি হলে ‘হুল ফুটছে, হুল ফুটছে’ অথবা ক্লান্ত মনে হলে ‘ক্লান্তি, ক্লান্তি’ ইত্যাদি। এ সকল অস্বস্তিকর অনুভূতি দুঃখবেদনা (দুঃখানুভূতি)। এ সকল পর্যবেক্ষণ বেদনানুপসন্না (বেদনানুদর্শন) বলা হয়।

বেদনানুপসন্না জ্ঞানের অভাবে এ সকল অনুভূতি সমূহের প্রতি মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়। এ সকল অনুভূতি নিজের অনুভূতি মনে হবে, যেমন আমি ভার অনুভব করছি, আমি গরম অনুভব করছি, আমি বেদনা অনুভব করছি, পূর্বে আমি আরাম অনুভব করতাম বা করেছি, এখন অস্বস্তি অনুভব করছি — আত্মায় বিশ্বাস আছে বলে এরূপ মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে অস্বস্তিকর অনুভূতি দেহে উৎপন্ন হয় দেহের উপরে প্রতিকূল চাপ বা অবস্থার কারণে। প্রতিনিয়ত বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ফলে যেমন বৈদ্যুতিক আলো নিয়ত জ্বলতে থাকে তেমনি অস্বস্তিকর অনুভূতির ক্ষেত্রেও প্রতিটি প্রতিকূল চাপ দেহের মধ্যে উদ্ভব হলে নব নব অনুভূতি পর্যায়ক্রমে আবিস্কৃত হতে থাকে।

এসকল অনুভূতি পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। প্রথমে ভার, ভার; গরম, গরম; দুঃখ, দুঃখ’ রূপে পর্যবেক্ষণকালে যোগীর অনুভব হয় যেন সে অনুভূতি প্রবল হতে প্রবলতর হচ্ছে এবং তাঁর মনে হবে যেন উপবেশন অবস্থার পরিবর্তন

করতে ইচ্ছা হচ্ছে। তখন তাঁর মনকে বা এরূপ ইচ্ছাকে — ‘ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তারপর আবার মনকে ভার অথবা গরম অনুভূতির মধ্যে ফিরিয়ে এনে — ‘ভারী, ভারী বা গরম, গরম’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যদি ভাবনা কার্য অতি ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা সহকারে পরিচালনা করা হয় তবে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বা অনুভূতির অবসান হবে।

একটি প্রবাদ আছে — ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা যোগীকে নির্বাণের দিকে পরিচালনা করে। এই প্রবাদ বাক্য ভাবনা অনুশীলনে খুবই যুক্তিযুক্ত। যদি যোগী সহিষ্ণুতা সহকারে অস্বস্তিকর অনুভূতি সহ্য করতে না পারেন তবে ভাবনার সময় বার বার তাঁর উপবেশন অবস্থা পরিবর্তন করতে ইচ্ছা হবে। এতে মনের একাগ্রতায় বাধা আসবে এবং বিফল হবেন। সমাধি লাভ ব্যতীত বিদর্শন-প্রজ্ঞা লাভের কোন উপায় নেই। বিদর্শন জ্ঞান ব্যতীত মার্গফল লাভ এবং নির্বাণ দর্শন হয় না। ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা ভাবনাকার্যে নিতান্ত প্রয়োজন। দৈহিক অস্বস্তিকর অনুভূতি সহ্য করার জন্য সহিষ্ণুতা নিতান্ত প্রয়োজন। বাহিরের এমন কোন প্রকার উপদ্রব নেই যাতে এরূপ সহিষ্ণুতা ধারণের প্রয়োজন আছে। একে খণ্ডিসংবরণ বলা হয়। অস্বস্তিকর অনুভূতি উৎপন্ন হলে সঙ্গ সঙ্গ উপবেশন অবস্থা পরিবর্তনের কোন দরকার নেই। সে সময় অনুসারে ‘ভার, ভার; গরম, গরম’ রূপে পর্যবেক্ষণ করে ভাবনা কার্য চালিয়ে যেতে হবে। এরূপে সাধারণ দুঃখদায়ক বেদনার অচিরে উপশম হবে। এতে সমাধি প্রবল হয়ে অসহনীয় দুঃখের উপশম ঘটাবে। এরূপ দুঃখবেদনার উপশম হলে পুনরায় উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করে — ‘উঠছে নামছে, উঠছে’ রূপে ভাবনা কার্য চালাতে হবে।

এমনও দেখা যায় সহিষ্ণুতা সহকারে অস্বস্তিকর অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করলেও সহজে বেদনার উপশম হচ্ছে না। এমতাবস্থায় উপবেশন অবস্থা পরিবর্তন ব্যতীত উপায় নেই। অবশ্য যোগীকে কঠিন প্রতিকূল অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে হয়। সমাধি প্রবল না হলে দুঃখপ্রদ অনুভূতির উপশম হয় না। এ পরিস্থিতিতে মন উপবেশন অবস্থা পরিবর্তন করতে চাইবে এবং মনকে তখন — ‘চাইছে, চাইছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তারপর শরীরের যে অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ তোলা হচ্ছে তার উপর মন রেখে — ‘তুলছি, তুলছি’ রূপে ধারণা করতে হবে, অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ যখন যে দিকে প্রসারিত হবে, তখন তাতে মন রেখে ভাবনা করতে হবে। এ সকল কায়িক কর্ম ধীরে ধীরে সম্পন্ন করতে হবে এবং সঙ্গ সঙ্গ ‘তুলছি তুলছি, রাখছি রাখছি, স্পর্শ করছি, স্পর্শ করছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আবার শরীর যখন দোলে তখন ‘দুলছে দুলছে’ — রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে; পা তোলার সময় — ‘উঠছে, উঠছে’, পা যখন নামবে তখন — ‘নামছে,

নামছে' পা যখন নিচে রাখা হয় তখন — 'রাখছি, রাখছি' রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যখন পর্যবেক্ষণ করার মত কিছু থাকে না তখন উদরের উঠা-নামাতে মন দিয়ে — 'উঠছে, নামছে' উঠছে, নামছে' রূপে ভাবনায় নিবিষ্ট হতে হবে। ভাবনার সময় মনকে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এ দুইয়ের মধ্যে কোন ছেদ বা বিরতি না হয়। পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণের পর পরবর্তী পর্যবেক্ষণ স্পষ্টতর হবে (অর্থাৎ পর পর সম্পন্ন হবে)। সেইরূপ পূর্ব সমাধির পর পরবর্তী সমাধির সময়ের ব্যবধান নিকটতর হবে এবং পূর্ব জ্ঞানে (বা প্রজ্ঞা)-র পর পরবর্তী প্রজ্ঞার ব্যবধান নিকটতর হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞার ক্রমবিকাশ হয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করলে শেষ স্তরে মার্গজ্ঞান লাভ হয়।

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন কালে যোগীকে আগুন জ্বালার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। প্রাচীন যুগে আগুন জ্বালাতে হলে শুষ্ক কাষ্ঠে আগুন না ধরা পর্যন্ত কোন প্রকার বিরতি না দিয়ে অনবরত দুটি প্রস্তর খণ্ড ঘর্ষণ করতে হত। কাষ্ঠগুলি উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হলে, আরও শক্তি প্রয়োগ দরকার হত এবং ঘর্ষণ কার্যও অনবরত চালিয়ে যেতে হত। আগুন জ্বলে উঠলেই তবে তার বিরতি এবং বিশ্রাম। অনুরূপভাবে যোগীকে দৃঢ়তা সহকারে একটি পর্যবেক্ষণের পর আর একটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে; পূর্ববর্তী সমাধির পর পরবর্তী সমাধি উৎপন্ন করে যেতে হবে। তারপর (পূর্ব) দুঃখপ্রদ অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করার পর আবার তাঁকে উদরের উঠা-নামায় — 'উঠছে, নামছে' রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

যোগী নিয়মিত উদরের উঠা-নামা অনুশীলনে রত থাকা কালে দেহের কোন স্থানে চুলকানি অনুভব করতে পারেন। তখন তিনি সেই স্থানে মন নিবদ্ধ করবেন এবং — 'চুলকাচ্ছে, চুলকাচ্ছে'। রূপে পর্যবেক্ষণ করবেন। চুলকানি একটি অস্বস্তি কর অনুভূতি। যখনই চুলকানো উৎপন্ন হয় তখন ঐ স্থান চুলকাতে ইচ্ছা হয়। মনকে তখন — 'ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে' রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে; তখনই চুলকাবেন না বরঞ্চ আবার 'চুলকাচ্ছে, চুলকাচ্ছে' রূপে পর্যবেক্ষণ করবেন। এভাবে ভাবনা করলে চুলকানি সাধারণতঃ কমে যায়। তারপর উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করুন। যদি মনে হয় চুলকানি এখনও কমেই এবং ঐ স্থান চুলকানো প্রয়োজন তখন 'ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে' রূপে পর্যবেক্ষণ করবেন; হাত যখন তুলবেন তখন 'তুলছি, তুলছি', হাত যখন উঠতে থাকবে তখন 'উঠছে, উঠছে', হাত যখন ঐ স্থান চুলকায় তখন 'চুলকাচ্ছি, চুলকাচ্ছি' হাত যখন তুলে নিচ্ছেন তখন 'তুলছি, তুলছি' হাত যখন পূর্ব স্থান স্পর্শ করছে তখন 'স্পর্শ করছে, স্পর্শ করছে' এবং জানছি, জানছি' রূপে পর্যবেক্ষণ করবেন। পরক্ষণেই কালবিলম্ব না

করে পুনরায় উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করে চলবেন। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বা উপবেশন অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে উক্তরূপে পর পর পর্যবেক্ষণ করে খুবই সতর্কতার সঙ্গে পরিবর্তন করতে হবে।

সতর্কতার সঙ্গে ভাবনা কার্য পরিচালনা করার সময় দেখা যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহের কোন না কোন স্থানে দুঃখপ্রদ অনুভূতি বা অস্বস্তিকর বেদনা উৎপন্ন হয়। মানুষ সাধারণতঃ অস্বস্তি অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই স্থান পরিবর্তন করে নেয়। এবং তা করবার সময় সাধারণ অস্বস্তিকর ক্লাস্তি, গরম অনুভূতি প্রভৃতির প্রতি মোটেই জ্ঞক্ষেপ করে না। সামান্য বেদনা অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই নিতান্ত অসতর্কভাবে তা করে ফেলে। তাতে অস্বস্তিকর বেদনা পূর্ণ রূপ পেতে পারে না। এ কারণে বলা হয় ঈর্ষাপথ (অবস্থান) দুঃখপ্রদ অনুভূতিকে বহিঃপ্রকাশ থেকে গোপন রাখে। তাতে মানুষ মনে করে তারা কয়েকটি দিন-রাত সুস্থ অনুভব করছে। তারা মনে করে, দুঃখপ্রদ বেদনার আক্রমণ কোন এক বিপদসূচক রোগের লক্ষণ।

প্রকৃত সত্য কিন্তু এই ধারণার বিপরীত। কোন ব্যক্তি পরীক্ষামূলকভাবে একাসনে কতক্ষণ দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থার পরিবর্তন না করে বসে থাকতে পারেন প্রত্যক্ষ করতে পারেন। আসন গ্রহণের পাঁচ বা দশ মিনিট পর এভাবে বসে থাকা অস্বস্তিকর অনুভূত হবে এবং পনের বা বিশ মিনিট পর একাসনে বসে থাকা অসহনীয় মনে হবে। তখন মাথা উঁচু বা নিচু করে বা হাত-পায়ের অবস্থান পরিবর্তন করে বা দেহ দোলায়িত করে (সামনে বা পেছনের দিকে) তাঁকে তাঁর পূর্বস্থিত অবস্থার পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে। এই অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে অনেকবার আসন পরিবর্তন হয়-মাত্র একদিনের এরূপ পরিবর্তনকে যদি গণনা করা হয় তবে দেখা যাবে তার সংখ্যা অনেক। এসব পরিবর্তন অজান্তেই হয়, কারণ এসবকে কেউ জ্ঞক্ষেপ করে না। অপর পক্ষে কেন যোগী যখন সর্বদা তাঁর সকল কর্মে স্মৃতিশীল হন তখন তিনি এ সকল প্রকৃতিগত শারীরিক চাপ প্রভৃতিতে পরিষ্কাররূপে পর্যবেক্ষণ করে যান। এগুলি তাদের নিজের প্রকৃতিকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ না করে পারে না, কারণ যোগী তাঁদের পূর্ণ প্রকাশ দর্শন না করা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে যান। কোন দুঃখপ্রদ অনুভূতি উৎপন্ন হলে তিনি তা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি আসন পরিবর্তন করেন না। যখন মনে পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগে তিনি সঙ্গে সঙ্গে — ‘ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করেন এবং দুঃখপ্রদ অনুভূতিতে মন নিবদ্ধ করে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যান। তিনি তখনই নড়াচড়া করেন বা আসন বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিবর্তন করেন যখন বেদনা অসহনীয় হয়ে উঠে। এক্ষেত্রেও তিনি ইচ্ছারূপ মনকে পর্যবেক্ষণ

করেন এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রত্যেক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে পরিবর্তন কার্য সম্পাদন করেন। এই কারণে ঈর্ষাপথ (অবস্থান) দুঃখপ্রদ অনুভূতিকে গোপন রাখতে পারে না। কখনও কখনও যোগী দেহের এখানে সেখানে দুঃখপ্রদ অনুভূতি অনুভব করেন অথবা গরম, চুলকানি, ব্যথা ইত্যাদি অনুভব করেন; এমন কি সর্বদেহে জ্বালাময় দুঃখ অনুভূতি অনুভব করেন। এই প্রচণ্ড জ্বালাময়ী দুঃখ অনুভূতিকে ঈর্ষাপথ উপেক্ষা করতে বা গোপন করে রাখতে পারে না।

যোগীর উপবেশন অবস্থা থেকে দাঁড়াবার ইচ্ছা হলে প্রথমে এরূপ ইচ্ছা মনকে — ‘ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করবেন। তারপর হাত-পা প্রভৃতি পর পর বিস্তার করার সময় ‘তুলছি, সরিচ্ছি, বিস্তার করছি, চাপ দিচ্ছি’ ইত্যাদি রূপে পর্যবেক্ষণ করে যেতে হবে। যখন শরীর সামনের দিকে অবনত হচ্ছে তখন ‘অবনত হচ্ছে, অবনত হচ্ছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দাঁড়ানোর সময় দেহ হালকা বোধ হয় এবং দাঁড়ান ক্রিয়া হয়ে থাকে। এর প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে। এবং দাঁড়ানোর সময় — ‘দাঁড়াচ্ছি, দাঁড়াচ্ছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দাঁড়ান কাজ ধীরে ধীরে করতে হবে। ভাবনা অনুশীলন কালে যোগীকে মনে রাখতে হবে তিনি যেন তাঁর সকল কাজ রুগ্ন ব্যক্তির মত অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন করেন। বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ সব সময় অতি সন্তর্পণে ধীর গতিতে চলেন ব্যথা-বেদনা এড়ানোর জন্যে, ঠিক সেইভাবে যোগী তাঁর সকল কর্ম ধীর গতিতে সম্পন্ন করবেন। ধীর গতি স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞাকে সহজে আকর্ষণ করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি সাধারণতঃ হালকা মনে জীবন যাপন করে থাকেন। যিনি সবে মাত্র মনকে সুসংযত ভাবে দেহের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করছেন এবং স্মৃতি ও প্রজ্ঞা এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসেনি তাঁর দৈহিক ও মানসিক কর্ম প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। দৈহিক ও মানসিক কর্মের দ্রুত গতিকে ধীর গতিতে নিয়ে আসা এবং স্মৃতি ও প্রজ্ঞার স্ফুরণে সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিতান্ত দরকার। তাই অনুশীলন কার্যে ধীর গতি বজায় রেখে সকল কাজ সম্পন্ন করতে উপদেশ দেওয়া হয়। অনুশীলন কার্যে যোগীর পক্ষে নিজকে অন্ধ ব্যক্তির মত ব্যবহার করা খুবই যুক্তিযুক্ত। যে ব্যক্তির আচরণ অসংযত অর্থাৎ নির্দিষ্ট চারদিক অবলোকন করেন তিনি কখনও ধীর বা শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন না। অপরপক্ষে অন্ধ ব্যক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সুসংযত। সে এক জায়গায় অধোবদনে স্থির হয়ে বসে থাকে। সে কখনও কিছু দেখা জন্য ঘাড় ফিরাবার চেষ্টা করে না, তার কাছে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না বলে। যদি কেত তার কাছে এসেও কথা বলে তবুও সে অধোদন অবস্থায় থাকে। যোগীর পক্ষে এরূপ অবিচলিত ও প্রশান্ত ব্যবহার

অনুকরণযোগ্য। যোগী ভাবনা কার্য পরিচালনা করার সময় ঠিক সেরূপ ব্যবহার করবেন, তিনি তাঁর চারদিকে তাকাবেন না, তাঁর মন শুধুমাত্র ভাবনা বিষয়ে নিবদ্ধ থাকবে, উপবেশন অবস্থায় তিনি কেবল উদরের উঠা-নামা স্মৃতি সহকারে পর্যবেক্ষণ করবেন। এমনকি কোন অত্যাশ্চর্য ঘটনাও যদি ঘটে, তবুও তিনি সতর্কতার সঙ্গেও সেদিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, তিনি কেবলমাত্র সে ঘটনাকে 'দেখছি, দেখছি' রূপে পর্যবেক্ষণ করে যাবেন এবং তারপর নিয়মিত 'উঠছে-নামছে' রূপে ভাবনারত থাকবেন। যোগীর পক্ষে অঙ্গব্যক্তির আচরণের মত পরম শ্রদ্ধা এবং ধৈর্য সহকারে ভাবনা কার্যে রত থাকা উচিত।

কোন কোন মহিলা যোগীর আচরণ পূর্ণমাত্রায় সঠিক পথে চালিত হতে দেখা যায়। তাঁরা উপদেশ মত পূর্ণ মর্যাদায় অত্যন্ত সংযতরূপে অনুশীলন কার্য চালিয়ে যান। তাঁরা অতীব প্রশান্ত মনে সর্বদা ভাবনা বিষয়ে লিপ্ত থাকেন। পদচালনার সময় কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবলমাত্র পদচালনার উপর চিত্ত নিবদ্ধ রাখেন। তাঁদের পদক্ষেপ হালকা, সাবলীল এবং ধীর গতি। তাঁরা অন্য সকল যোগীদের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

যোগীর নিজের পক্ষে বধিরের মতও ব্যবহার করা উচিত। সাধারণত: মানুষ কোন শব্দ শুনলে যে দিক থেকে আসে সেদিকে ফিরে দেখে বা কোন ব্যক্তি কথা বললে তার দিকে ফিরে উত্তর দেয়। অপরপক্ষে বধির ব্যক্তি সদা অবিচলিত ও প্রশান্ত থাকে সে কোন শব্দ বা কারো বাক্যে জ্বল্প করে না, কারণ সে কিছুই শুনতে পায় না। যোগীকে ঠিক বধির ব্যক্তির ব্যবহার নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে হবে। তিনি যেন কোন অনাবশ্যক বাক্য বা কথার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মনোযোগ না দেন। তিনি যদি কোন শব্দ বা কথা শোনে তবে 'শুনছি শুনছি' রূপে তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তারপর নিয়মিত ভাবনায় 'উঠছে, নামছে' রূপে ধারণ করে ভাবনা করবেন। তিনি এমনভাবে ভাবনা অনুশীলনে রত থাকবেন যেন অন্য লোকের চোখে তাঁকে বধির রূপে প্রতীয়মান হয়।

যোগীকে স্মরণ রাখতে হবে নিয়মিত নিবিড়ভাবে ভাবনা অনুশীলন করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য। ভাবনা ছাড়া অন্য বিষয়ের (যা দেখেন বা শোনে) প্রতি তাঁর কোন কর্তব্য নেই। সেগুলিকে তিনি গ্রাহ্যই করবেন না তা যতই আশ্চর্য এবং আকর্ষণীয় হোক না কেন। কোন দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হলে এমনভাবে তা অগ্রাহ্য করবেন যেন তিনি তা দেখছেন না। তেমনি কোন শব্দ বা কথা কানে এলে এমনভাবে অগ্রাহ্য করবেন যেন তিনি তা শোনে নি। এই সব কাজ দুর্বল রুগ্ন ব্যক্তির মতই ধীরে ধীরে সম্পন্ন করতে হবে।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ানোর শারীরিক কর্ম অতি ধীর ও

সত্তর্পণে সম্পন্ন করতে হবে। দাঁড়ানোর সময় ‘দাঁড়াছি, দাঁড়াছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি কোন কারণে চারিদিকে দেখতে হয় ‘তাকাছি, দেখছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চলার সময় প্রতি পদক্ষেপ — ‘ডান, বাঁ’ অথবা ‘হাঁটছি, হাঁটছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে পা তোলা থেকে পা রাখা পর্যন্ত গতির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। দ্রুতগতিতে হাঁটলে বা দূর পথ অতিক্রম করতে হলে প্রতি পদক্ষেপ ‘ডান, বাঁ’ অথবা ‘হাঁটছি, হাঁটছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করলেই চলবে। ধীর গতিতে চলার সময় (অর্থাৎ চংক্রমণ সময়ে) প্রতি পদক্ষেপকে তিন ভাগে ভাগ করে — ‘তুলছি-যাচ্ছি-রাখছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। অনুশীলনের প্রথম দিকে পদক্ষেপকে দুভাগে ভাগ করে চলতে হবে — ‘তুলছি’ (পা তোলা আরম্ভ থেকে) — ‘রাখছি’ (পা নামানো শুরু থেকে) রূপে পর্যবেক্ষণ করতে করতে চলতে হবে। এই অনুশীলনে প্রথম পদক্ষেপ থেকে যেকোন তুলছি, রাখছি রূপে আরম্ভ হয় ঠিক সে রূপেই শেষ করতে হবে। এখানে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে — ‘প্রথম পায়ের পদক্ষেপ যখন নানান হয় তখন দ্বিতীয় পা সাধারণত: পরবর্তী পদক্ষেপ আরম্ভ করার জন্য তোলা হয়, লক্ষ্য রাখতে হবে এরূপ যেন না হয়। পূর্বপদক্ষেপ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ আরম্ভ হবে অর্থাৎ পূর্বপদক্ষেপ — ‘তুলছি, রাখছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করার পরবর্তী পদক্ষেপ ‘তুলছি, রাখছি’-রূপে আরম্ভ হবে। দুই বা তিন দিন এরূপ অনুশীলন করার পর এটা সহজ হয়ে যাবে। এই অনুশীলনকে তিন ভাগে ভাগ করে করতে হবে যথা — ‘তুলছি—যাচ্ছি—রাখছি’। আরম্ভ করার সময় যোগী দ্রুত পদে হাঁটলে এভাবেই অনুশীলন করবেন — ‘ডান, বাঁ’ অথবা ‘হাঁটছি, হাঁটছি’ এবং যখন ধীর গতিতে হাঁটবেন তখন ‘তুলছি, যাচ্ছি, রাখছি’ রূপে অনুশীলন করবেন।

চংক্রমণ (বা গমন) কালে যোগীর বসতে ইচ্ছা হলে ‘ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। যদি তিনি কিছু দেখেন ‘তাকাছি, দেখছি, তাকাছি, দেখছি’; আসনে বসার জন্য যাওয়া কালে—‘তুলছি, রাখছি, থামবার সময় ‘থামছি, থামছি’, ফিরবার সময় ‘ফিরছি, ফিরছি’, যখন বসতে ইচ্ছা করেন ‘ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন। বসার সময় দেহ ভারী বোধ হয় এবং নিচের দিকে টান লাগে। এগুলির প্রতিও স্মৃতি রাখতে হবে এবং ‘বসছি, বসছি, বসছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বসার পর হাত-পা যথাস্থানে স্থাপন করতে হয়। এ সময় ‘সরাচ্ছি, নামাচ্ছি, বিস্তার করছি’ ইত্যাদি রূপে পর্যবেক্ষণ করবেন। যদি আর কিছু করণীয় না থাকে তবে শান্তভাবে বসে উদরের উঠা-নামায় মন নিবদ্ধ করে যথারীতি ‘উঠছে, নামছে’ রূপে ভাবনায় রত থাকবেন।

ভাবনাকালে দুঃখবেদনা, ক্লান্তি, গরম (ঠাণ্ডাও) অনুভূত হয়, তখন সেগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তারপর নিয়মিত অনুশীলন উদরের উঠা-নামায় — ‘উঠছে, নামছে’ রূপে ভাবনা করতে হয়। যদি নিদ্রাভাব আসে তবে ‘নিদ্রা, নিদ্রা’ রূপে পর্যবেক্ষণ করুন। নিদ্রার জন্য তৈরী হবার সময় যত প্রকার কাজ করতে হয় তাদের প্রত্যেকটি উক্তরূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যখন শরীর দোলাবেন তখন ‘দোলাচ্ছি, দোলাচ্ছি’ যখন পা বিস্তার করবেন ‘বিস্তার করছি, বিস্তার করছি’ যখন শরীর শায়িত করবেন তখন ‘শুয়ে পড়ছি, শুয়ে পড়ছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করবেন।

শুয়ে পড়া ইত্যাদি অতি সাধারণ কাজ হলেও অবহেলা করবেন না। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেও বোধ বা প্রজ্ঞালাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞার পূর্ণতা লাভ হলে যে কোনো মুহূর্তে বোধি লাভ হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে অতীতকাল ভদন্ত আনন্দ স্থবির শায়িত হবার মুহূর্তে অর্হত্ব লাভ করেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের চতুর্থ মাসের প্রারম্ভে প্রথম ধর্মসঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। ধর্মসঙ্গীতির অর্থ ভিক্ষুসঙ্ঘের সঙ্গীতি বা সম্মেলন যেখানে ভগবান বুদ্ধের সকল বাণী শ্রেণী-ভাগ, পরীক্ষিত, গৃহীত এবং আবৃত্তি করা হয়েছিল। সে সময় ৫০০ ভিক্ষু নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৪৯৯ জন অর্হৎ ছিলেন, শুধুমাত্র ভদন্ত আনন্দ ছিলেন স্রোতাপন্ন। সঙ্গীতিতে অন্যান্যদের ন্যায় অর্হৎরূপে যোগদান করবার জন্য তিনি সঙ্গীতির অধিবেশনের মাত্র একদিন আগে সম্যক্ বীর্য প্রকাশ দ্বারা ভাবনা আরম্ভ করেন। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থ দিনে তিনি কায়গতানুস্মৃতি বা কায়ানুদর্শন নিয়েই ভাবনা আরম্ভ করেন। বলা হয়ে থাকে তিনি কায়ানুপস্সনা সতিপট্ঠান ভাবনায় সারারাত্রি চংক্রমণ করে কাটিয়েছিলেন। হয়তো তিনি ‘ডান-বাঁ বা হাঁটছি, হাঁটছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে করতে চংক্রমণ করেছিলেন। তিনি একরূপে প্রতি পদক্ষেপে কায়িক-মানসিক সকল কর্মের পর্যবেক্ষণ করতে করতে রাত্রির শেষ যাম পর্যন্ত নিবিড় ভাবনায় রত ছিলেন। কিন্তু তিনি তখনও পর্যন্ত অর্হত্ব লাভ করতে পারেন নি।

তখন ভদন্ত আনন্দ চিন্তা করলেন—“আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ভগবান বুদ্ধ আমাকে বলেছিলেন — ‘তোমার পারমী পূর্ণ হয়েছে। ভাবনা অভ্যাস করতে থাক। নিশ্চয়ই একদিন তুমি অর্হত্ব লাভ করবে।’ আমি চরম এবং পরম প্রচেষ্টা করেছি, সাধনক্ষেত্রে যা অন্য কেহ করেনি। আমার অকৃতকার্যতার কারণ কি?” তখন তাঁর স্মৃতিপথে এল “অহো! আমি সারারাত অতিরিক্ত বীর্য প্রকাশ করে চংক্রমণ করেছি। তাতে বীর্য বৃদ্ধি পেয়েছে, সমাধি উৎপন্ন কম হয়েছে, ঔদ্ধত্যই

এর জন্য দায়ী, এখন চংক্রমণ বন্ধ করে বীর্যকে সমাধির সমস্তরে আনতে হবে। তারপর তিনি শুয়ে ভাবনা করবার জন্য অগ্রসর হলেন। ভদন্ত আনন্দ তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে বিছানায় বসলেন এবং শয়ন করার উদ্যোগ করেছেন। শয়ন করার মুহূর্তেই ভদন্ত আনন্দ অর্হত্ব লাভ করলেন অর্থাৎ ‘শুয়ে পড়ছি, শুয়ে পড়ছি’ — রূপে পর্যবেক্ষণ করার সময়ই তিনি অর্হৎ হলেন।

এভাবে অর্হত্ব লাভ করার ঘটনা অর্থ কথায় বর্ণিত এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। কারণ ইহা চার ঈর্ষাপথের যথা চংক্রমণ (সীমিত স্থানে গমনাগমন), দাঁড়ান, উপবেশন এবং শয়ন এই চার নিয়মিত অনুশীলনের বাইরের ঘটনা। সেই মুহূর্তে ভদন্ত আনন্দকে পুরোপুরি দাঁড়ান অবস্থায় বলা যায় না কারণ তাঁর পদদ্বয় মেঝে থেকে উপরে উঠেছে, উপবেশন বা বসা অবস্থায়ও বলা যায় না কারণ তাঁর দেহ শয্যা গ্রহণের জন্য নোয়ানো হয়েছে, শায়িত অবস্থায়ও বলা যায় না কারণ তাঁর শির বালিশ স্পর্শ করেনি এবং পুরোপুরি বিছনায় এখনও শায়িতও হননি। ভদন্ত আনন্দ স্রোতাপন্ন ছিলেন। তাই তাঁকে আরও তিন উচ্চ স্তরের পরিপূর্ণতা সাধন করতে হত, যথা — স্কৃদাগামী মার্গ এবং ফল, অনাগামী মার্গ এবং ফল, অর্হত্ব মার্গ এবং ফল। ইহা এতক্ষণ মাত্র সময়ে প্রতিভাত হয়েছিল। সুতরাং কোন প্রকারের বিরতি বা ছেদ না দিয়ে ভাবনা অনুশীলন করা প্রয়োজন।

শায়িত অবস্থায় ভাবনা অনুশীলনে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যখন নিদ্রা আসে এবং শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা হয় তবে — ‘নিদ্রা, নিদ্রা, ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে’, হাত তোলার সময়, ‘তুলছি, তুলছি’, কোন অঙ্গ বিস্তার করার সময় ‘বিস্তার করছি, বিস্তার করছি’, স্পর্শ হলে ‘স্পর্শ করছি, স্পর্শ করছি’ শরীরের কোন অংশে চাপ দিলে ‘চাপছি, চাপছি’, শোবার সময় ‘শুয়ে পড়ছি, শুয়ে পড়ছি’ এবং শয়ন কার্য অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন করতে হবে। বালিশে মাথা স্পর্শ করলে ‘স্পর্শ হচ্ছে, স্পর্শ হচ্ছে’ সমস্ত শরীরে বহু স্পর্শ স্থান আছে, প্রত্যেকটি স্পর্শ স্থান এক একটি করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শয়ান অবস্থাতেও অনেক কর্ম আছে যেমন হাত-পাগুলিকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এ কর্মগুলি সতর্কভাবে ‘তুলছি তুলছি, বিস্তার করছি; নোয়াছি, নোয়াছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পাশ ফিরাবার সময় ‘ফিরাছি ফিরাছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং শরীরকে বিছনায় সম্পূর্ণ শায়িত করার পর উদরের উঠা-নামায় মনসংযোগ করে ভাবনায় রত হতে হবে।

শুয়ে শুয়ে ভাবনা অনুশীলন করলেও মন অন্যত্র ভ্রমণ করতে পারে। ভ্রাম্যমাণ মনকে তখন ‘যাচ্ছে, যাচ্ছে’; যখন কোন স্থানে যেতে থাকে তখন ‘পৌছাচ্ছে, পৌছাচ্ছে’; যখন পৌছে গেল তখন ‘কল্পনা করছি, কল্পনা করছি’; ‘চিন্তা করছি,

চিন্তা করছি' ইত্যাদি এবং যখন অন্য কোন নিমিত্ত না থাকে তখন উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণে ফিরে আসতে হবে। এইভাবে দুই বা তিনবার পর্যবেক্ষণ করার পর মনের অন্য চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনও হতে পারে থুথু গিলতে বা ফেলতে ইচ্ছা হয় অথবা দুঃখকর অনুভূতি, গরম, চুলকানি অনুভূতি প্রভৃতি আসতে পারে, অথবা নানা দৈহিক কর্ম অর্থাৎ হাত পায়ে অবস্থান পরিবর্তনের ইচ্ছাও হবে। যখন যা মনে আসে বা করতে ইচ্ছা হয় তখন প্রত্যেকটি কর্ম ভাবনারত হয়ে করতে হবে। (সমাধি উৎপন্ন হলে বা সমাধি শক্তি আয়ত্ব হলে চোখ খোলা, চোখ বন্ধ করা, চোখের পাতা নাড়াচাড়া করা প্রভৃতিও ভাবনা সহকারে সম্পন্ন করতে পারা যায়)। যখন অন্য কোন কর্ম না থাকে তখন উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করবেন।

হয়তো এভাবে রাত্রি অনেক হয়ে গেছে এবং নিদ্রার সময় চলে যাচ্ছে তাহলেও নিদ্রায় আত্ম সমর্পণ না করে ভাবনা করা উচিত। যিনি ভাবনা অনুশীলনে গভীর শ্রদ্ধাশীল এবং নিষ্ঠাবান তাঁকে ভাবনা অনুশীলনে রত থাকার জন্য কয়েকটি বিন্দ্রি রাত্রি কাটাতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

অর্থ কথায় বলা হয়েছে — ভাবনা অনুশীলন কালে চতুরঙ্গবীর্য গুণ পরিবর্ধন করা নিতান্ত প্রয়োজন। এরূপ দুষ্কর তপশ্চর্যা কালে যোগী অস্থিকঙ্কাল সার হয়, দেহ ধমনী সমাকুল হয়, রক্ত-মাংস শুকিয়ে যায়, তবুও অধ্যবসায় দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয় অধিগত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেন তাঁর বীর্য এবং প্রচেষ্টা পরিত্যাগ না করেন। এই উপদেশগুলি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপালন করতে হবে। যদি সমাধি অত্যন্ত প্রবল হয় তবে নিদ্রা না গিয়েও থাকা সম্ভব এবং নিদ্রাকেও জয় করা যায়। যদি নিদ্রাভাব প্রবল হয় তবে তাঁর নিদ্রা যাওয়া উচিত। যখন নিদ্রাভাব আসবে তখন 'নিদ্রা, নিদ্রা' রূপে ধারণা করবেন, যখন চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসবে তখন — 'বন্ধ হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে' যখন চোখের পাতা ভারী মনে হয় তখন — 'ভারী হয়েছে, ভারী হয়েছে', যখন চোখ ঝলসায় তখন 'ঝলসাচ্ছে, ঝলসাচ্ছে, —এভাবে ভাবনা করলে নিদ্রাভাব চলে যায় এবং পুনঃ নিজকে সজীব মনে হবে। এ সজীব অনুভূতিকেও — 'সজীবতা অনুভব করছি, সজীবতা অনুভব করছি' রূপে ধারণা করতে হবে। তারপর 'উঠছে-নামছে' রূপে উদরের গতিতে মন নিবদ্ধ করে ভাবনায় রত হতে হবে। মানসিক দৃঢ়তা সত্ত্বেও যদি জেগে থাকতে পারা না যায় তবে শায়িত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়া সহজভাবে হবে। নতুন যোগী প্রথমতঃ উপবেশন অবস্থায় এবং চংক্রমণের মাধ্যমে ভাবনা অনুশীলন চালিয়ে যাবেন।

গভীর রাত্রে যখন ঘুমোতেই হবে তখন শুয়ে শুয়ে 'উঠছে, নামছে' অনুশীলনে

মন রাখুন। তাহাতে সুন্দ্রা হবে। নিদ্রার সময় ভাবনা অনুশীলন সম্ভব নয়। নিদ্রা যোগীর বিশ্রামের সময়। এক ঘণ্টা নিদ্রাই এক ঘণ্টা বিশ্রাম। যদি যোগী দুই, তিন বা চার ঘণ্টা নিদ্রা উপভোগ করতে চান তবে তাঁর বিশ্রামও দীর্ঘতর হবে। কোন ক্রমেই যোগীর চার ঘণ্টার বেশি নিদ্রা উপভোগ করা উচিত নয়। চার ঘণ্টা সময় নিয়মিত ঘুমের পক্ষে যথেষ্ট।

নিদ্রা ভঙ্গের পর মুহূর্ত থেকেই যোগী ভাবনা অনুশীলনে নিরত হওয়া প্রয়োজন। সর্বদা নিবিড় ভাবনায় নিরত থাকা যোগীর কর্তব্য। কারণ তিনি মার্গ এবং ফল লাভের নিমিত্ত প্রকৃত প্রেরণা নিয়ে কাজে নেমেছেন। যদি জাগরণ ‘মুহূর্ত’ তিনি ধরতে না পারেন তবে তিনি ‘উঠছে, নামছে’ নিয়ে ভাবনা আরম্ভ করবেন অথবা যদি তিনি কিছু চিন্তা করছেন বলে প্রথমে জানতে পারেন তবে ‘চিন্তা করছি, চিন্তা করছি’ রূপে ভাবনা আরম্ভ করে ‘উঠছে, নামছে’ ভাবনায় মন নিবদ্ধ করবেন অথবা তিনি যদি প্রথমে শব্দ শ্রবণ করেন তবে ‘শুনছি, শুনছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে করতে ভাবনা আরম্ভ করবেন এবং ‘উঠছে নামছে’ ভাবনায় রত হবেন। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শারীরিক কার্যও আরম্ভ হয়। যেমন পাশ ফেরা বা হাত-পা নাড়াচাড়া করা। এই কার্যগুলিও ভাবনা সহকারে পরপর করতে হবে। যদি তিনি শারীরিক কার্য বিষয় জানতে পারেন তবে তা পর্যবেক্ষণ বা ধারণা করে কাজ আরম্ভ করবেন; অথবা যদি তিনি কোন বেদনাদায়ক অনুভূতিকে সর্বপ্রথম জানতে পারেন তবে সেই অনুভূতিকে পর্যবেক্ষণ করার পর দৈহিক কার্যের প্রতি পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করবেন। যদি তিনি জাগ্রত হয়ে শান্তভাবে শুয়ে থাকেন তবে ‘উঠছে, নামছে’ রূপে ভাবনা করবেন। যদি তাঁর শয্যা ত্যাগের ইচ্ছা হয় তবে ‘ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করার পর অন্য সকল কার্য অর্থাৎ হাত-পা ইত্যাদি যথাস্থানে রাখা পর পর পর্যবেক্ষণ করবেন। শয্যা ত্যাগের সময় ‘উঠছি, উঠছি’ দেহকে উপবেশন অবস্থায় আনার সময় ‘বসছি, বসছি’ এবং হাত-পা যথাস্থানে রাখা প্রভৃতি কাজ পর্যবেক্ষণ সহকারে করতে হবে। যদি অন্য কোন কাজ না থাকে ‘উঠছে, নামছে’ ভাবনায় রত হবেন।

এতক্ষণ চার ঈর্ষাপথের ভাবনা বিষয়ের বর্ণনার সঙ্গে এক ঈর্ষা পথ বা অবস্থা থেকে অন্য ঈর্ষাপথ অবস্থায় পরিবর্তন বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ইহা সাধারণ ভাবনা বিষয়ের বর্ণনা মাত্র যা ভাবনা সময়ে যথাবিধি অনুশীলন করতে হবে। অনুশীলন আরম্ভ করার প্রাথমিক অবস্থায় এতগুলি কার্যের পর্যবেক্ষণ কঠিন বোধ হবে এবং বহু কার্যই বাদ পড়ে যাবে। তবে সমাধি প্রগাঢ় হলে ক্রমে এ সকল কার্যের অনুশীলন সহজতর হবে এবং আরও অধিক বিষয়ের অনুশীলন করা সম্ভব হবে। স্মৃতি এবং সমাধির ক্রম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞাও দ্রুত

বৃদ্ধি হবে এবং আরও অনেক বিষয়ের অনুভূতি হবে। উন্নত পর্যায়ের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

মুখ ধোয়া এবং স্নানের সময়ও ভাবনা কার্য চালিয়ে যেতে হবে। সাধারণত: এ সকল কার্য তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হয় এবং তার ভাবনা কার্যও সে গতিতে করতে হবে। জলের পাত্র নেবার জন্য হাত বাড়ালে ‘হাত বাড়াচ্ছি, হাত বাড়াচ্ছি’ পাত্র ধরলে ‘ধরছি, ধরছি’ পাত্র জলে ডুবালে ‘ডুবাচ্ছি, ডুবাচ্ছি’ জল আনার সময় ‘আনছি, আনছি’ ঠাণ্ডা লাগলে ‘ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা’ দেহ ঘর্ষণ কালে ‘ঘর্ষণ, ঘর্ষণ’ ইত্যাদি ইত্যাদি। কাপড় বদলানোর সময়, কাপড় পরা সময়, বিছানা করার সময়, দরজা খোলার সময় ইত্যাদিতেও যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হয় তা পৃথক পৃথক রূপে বিস্তৃত ভাবনা কার্য দ্বারা যতদূর সম্ভব পর পর করে যেতে হবে।

আহার করার সময় আহাৰ্য বস্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে ‘তাকাচ্ছি, দেখছি; তাকাচ্ছি, দেখছি, খালায় হাত লাগালে ‘স্পর্শ করছি, গরম গরম’; ভাত বা আহাৰ্য বস্তু গ্রাস তৈরি করার সময় ‘গ্রাস তৈরি করছি’ গ্রাস গুছিয়ে ধরার সময় ‘ধরছি, ধরছি’, গ্রাস তোলার সময় ‘তুলছি, তুলছি’ ঘাড় নোয়াবার সময় ‘নোয়াচ্ছি, নোয়াচ্ছি’, মুখে খাবার রাখার সময় ‘রাখছি, রাখছি’ হাত মুখ থেকে তুলে নেবার সময় ‘তুলে নিচ্ছি, তুলে নিচ্ছি’, খালায় হাত রাখার সময় ‘স্পর্শ হচ্ছে, স্পর্শ হচ্ছে’, ঘাড় সোজা করার সময় ‘সোজা করছি, সোজা করছি’, আহাৰ্য চিবাবার সময় ‘চিবোচ্ছি, চিবোচ্ছি’, স্বাদ গ্রহণের সময় ‘স্বাদ পাচ্ছি’ বা ‘জানছি, জানছি’। আহাৰ্য ভাল লাগলে ‘ভাল লাগছে, ভাগ লাগছে’, তৃপ্তি পেলে ‘তৃপ্তি পাচ্ছি, তৃপ্তি পাচ্ছি’, গিলবার সময় ‘গিলছি, গিলছি, ইত্যাদি রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আহার আরম্ভ করার সময় থেকে শেষ করা পর্যন্ত ভাবনার অনুশীলনের বর্ণনা এইরূপ। ভাবনা অনুশীলনের প্রথম দিকে অনেক ভুল ত্রুটিও হবে। তজ্জন্য মনে সংশয় আনা ঠিক হবে না। বরং যথাসম্ভব অনুশীলন কার্য চালাতে হবে। ভাবনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর চেয়েও অধিক কাজ অতি সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

ভাবনা অনুশীলনের এত বিস্তৃত এবং পুঞ্জানুপুঞ্জ যে বর্ণনা দেওয়া হল তার সবগুলি মনে রাখাও সম্ভব নয়। তাই সহজে মনে রাখা যায় এমন কয়েকটি দরকারী এবং মুখ্য বিষয়ের পুনরায় সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল।

চংক্রমণ বা নির্দিষ্ট গমনাগমনকালে যোগী প্রতি পদক্ষেপের গতির উপর মন রেখে ভাবনা করবেন। যদি দ্রুত গমন হয় তবে প্রতি পদক্ষেপ — ‘ডান-বাঁ’ রূপে পর্যবেক্ষণ করবেন। মন সদা পদক্ষেপের গতির প্রতি নিবদ্ধ রাখবেন। আর যদি পদক্ষেপ ধীর গতি হয় তবে ‘তুলছি-ফেলছি, তুলছি-ফেলছি’ রূপে ধারণা করবেন। উপবেশন অবস্থায় উদরের উঠা-নামা নিয়ে ভাবনা করার সময়

‘উঠছে-নামছে’ রূপে ধারণা করবেন। শুয়ে ভাবনা করার সময়ও উদরের উঠা-নামার ভাবনা করলে ‘উঠছে-নামছে’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

যদি উঠছে-নামছে রূপে ভাবনা করার সময় মন অন্যত্র ভ্রমণ করে তবে তাকে ছেড়ে দিতে নেই, তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করতে হবে। কল্পনা করলে ‘কল্পনা করছি’, চিন্তা করলে ‘চিন্তা করছি’; যদি মন অন্যত্র যায় ‘যাচ্ছে, যাচ্ছে’, মন যদি কোথাও পৌঁছায় তবে ‘পৌঁছাচ্ছে, পৌঁছাচ্ছে’, রূপে প্রত্যেক বিষয়ে ভাবনা করতে হবে। তারপর নিয়মিত উদরের উঠা-নামায় মন নিবদ্ধ করে ভাবনা করতে হবে। যদি হাত-পা অথবা দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্লাস্তি বোধ হয়, গরম, হুল ফুটান, ব্যথা, চুলকানি ইত্যাদি অনুভূত হয় সঙ্গে সঙ্গে তা অনুসরণ করে ‘ক্লাস্তি, গরম, হুল ফুটছে, ব্যথা লাগছে, চুলকাচ্ছি’ রূপে উপশম না হওয়া পর্যন্ত অনুভূতি অনুসারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তারপর উদরের ‘উঠা-নামায়’ ভাবনা করতে হবে হাত-পা বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করার সময় অর্থাৎ যা যা ঘটে তার পর পর পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তারপর মনকে উদরের উঠছে-নামছে পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত করতে হবে।

যদি ভাবনা অনুশীলনে পূর্ববর্ণিতভাবে অগ্রসর হওয়া যায় তবে যথাসময়ে ভাবনার নিমিত্ত বা বিষয় ক্রমান্বয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রাথমিক অবস্থায় অনেক ভুলত্রুটি হবে, কারণ ভ্রাম্যমাণ মন কোন বাধা না পেয়ে যত্রতত্র ভ্রমণ করতে চায়। তাতে যোগী হতোদ্যম হবেন না। ভাবনার প্রথম দিকে এসব অসুবিধা ভোগ করতে হলেও কিছুকাল ভাবনা অনুশীলনের পর মন আর যথেষ্ট ভ্রমণ করতে পারবে না, কারণ মনের প্রত্যেক গতিবিধি আয়ত্বের মধ্যে এসে যাবে। তখন মন যে বিষয়ে ধাবিত হবে তার মধ্যেই নিবিষ্ট করা যাবে। যখন ‘উঠছে’ রূপ ঘটনার প্রকাশ পাবে, মন তাকে পর্যবেক্ষণ করবে এবং তখন মন এবং বিষয় একীভূত বা সমীভূত হয়ে উঠবে। যখন ‘নামছে’ রূপ ঘটনার প্রকাশ পাবে, মন তাকে পর্যবেক্ষণ করবে এবং তখন মন ও বিষয় একীভূত বা সমীভূত হয়ে উঠবে। মন এবং বিষয় উভয়ের সর্বদা মিলন ঘটবে যা পর্যবেক্ষণের সময় বিষয়কে জানে বা জ্ঞাত হয়। রূপ বা বিষয় এবং জ্ঞাতা মন যুগ্মভাবে উৎপন্ন হয় এবং এই দুই ব্যতীত তাদের মধ্যে আর তৃতীয় কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই যাকে পুরুষ বা আত্মা বলা যায়। এ সত্য যোগী যথাসময়ে ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞাত হবেন।

রূপ এবং মন এই দুইটি যে পৃথক সত্য তা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় ‘উঠছে, নামছে’ রূপে পর্যবেক্ষণের সময়। রূপ এবং মন ধাতু যুগ্মভাবে সংযুক্ত হয় এবং তাদের উৎপত্তি সমীভূত বা একই সময়ে হয়ে থাকে। সেরূপ প্রক্রিয়া ‘উঠা’

(অর্থাৎ রূপের নিমিত্ত রূপে উৎপত্তি) মনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে একীভূত হয় — মনই তা জানে। সেরূপ রূপ প্রক্রিয়া — ‘নামা’ মনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে একীভূত হয় — মনই তা জানে। অনুরূপভাবে তোলা, বিস্তার করা, রাখা প্রভৃতি সেই সেই মনের সঙ্গে মিলিত হয় — তাহাই মন জানে। রূপ বা বিষয়ের এবং মনের পৃথক উৎপত্তি জ্ঞানই নাম-রূপ-পরিচ্ছেদ জ্ঞান। সকল বিদর্শন জ্ঞানের মধ্যে ইহাই প্রথম জ্ঞান।

দীর্ঘদিন ভাবনা অনুশীলনে স্মৃতি ও সমাধির উন্নতি লাভ ঘটে। উচ্চ পর্যায়ের ভাবনায় অনুভূত হবে যে প্রত্যেক পর্যবেক্ষণের সময় প্রত্যেক প্রক্রিয়ার উৎপত্তি হয় এবং পর মুহূর্তে বিলয় হয়। মানুষ সাধারণতঃ মনে করে দেহ এবং মন সারা জীবন একইরূপ থাকে এবং তা নিত্য; শৈশবের দেহ বর্ধিত হয়ে বর্ষীয়ান হয় এবং শিশুর সরল ও নির্বোধ মন বর্ধিত হয়ে অধিক বয়সে পরিণত মন হয় — দেহ ও মন উভয়ই এক এবং একই ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে কিঞ্চিৎ তা নয়। কিছুই নিত্য নয়। প্রত্যেক বিষয়ই ক্ষণেকের জন্য উৎপন্ন হয় এবং পরমুহূর্তে বিলয় হয়। চোখের পলক পড়ার সময় পর্যন্তও কিছুই স্থায়ী হয় না। পরিবর্তন যে কিরূপ দ্রুতগতিতে চলছে তা যথাসময়ে অনুভূত হবে। যোগী ভাবনাকালে — ‘উঠছে, নামছে’ ইত্যাদি রূপে ভাবনা অনুশীলনকালে অনুভব করেন যে এ সকল প্রক্রিয়া একটির পর একটি দ্রুতবেগে উৎপন্ন হয় এবং লুপ্ত হয়। যোগী পর্যবেক্ষণের সময়ে প্রতি বিষয়ের উৎপত্তি-বিলয় দর্শনে সন্তোষ লাভ করেন এবং উপলব্ধি করতে পারেন যে সংসারে কিছুই নিত্য নয়। সর্ব বিষয়ের এ অনিত্যতা জ্ঞানকে অনিচ্ছানুপস্ফুট বা অনিত্যানুদর্শন জ্ঞান বলে।

তখন যোগী সর্ববস্তু বা বিষয়ের নিত্য পরিবর্তনশীলতাকে দুঃখ মনে করেন এবং তাহা কোন প্রকারে প্রত্যাশা করেন না। একে বলা হয় দুঃখানুপস্ফুট জ্ঞান। আরও নানা প্রকার দুঃখ অনুভূতি দ্বারা ক্লিষ্ট হয়ে দেহকে কেবলমাত্র দুঃখপুঞ্জ মনে করেন। ইহাও দুঃখানুপস্ফুট বা দুঃখানুদর্শন জ্ঞান।

যোগী আরও উপলব্ধি করবেন যে রূপ এবং মনধাতু কারও ইচ্ছার অনুসরণ করে না বরঞ্চ এগুলি নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে এবং কোন কারণ নির্ভরশীল বা কিছুতে আশ্রিত হয়ে স্বকর্ম সম্পন্ন করে। যোগী যখন দেহ ও মনের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণে রত থাকেন তখন তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে এ প্রক্রিয়াগুলোকে অবরোধ করা যায় না এবং প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কোন ব্যক্তিও নয়, জীবাত্মাও নয় এবং আত্মাও নয়। একে বলা হয় অনন্তানুপস্ফুট বা অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান।

যে যোগী অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা জ্ঞান পুরোপুরি অর্জন করেন তিনিই নির্বাণ দর্শন করেন। অতীতকাল থেকে বুদ্ধ, অর্হৎ এবং আর্যগণ বিদর্শন ভাবনা

অনুশীলনের মাধ্যমে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছেন। নির্বাণ লাভের এই-ই একমাত্র মার্গ। প্রকৃতপক্ষে চার স্মৃত্যুপস্থান ভাবনাই (সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে জাগ্রত থাকা) বিদর্শন ভাবনা। সুতরাং সতিপট্ঠান বা স্মৃত্যুপস্থান ভাবনাই নির্বাণ সাক্ষাতের (একায়ন) মার্গ।

আচার্যের সম্ভাষণ: যোগীবৃন্দ, বিপস্সনা ভাবনা অনুশীলন করবার জন্য আপনাদের এখানে আগমন। আপনাদের মনে রাখতে হবে বুদ্ধ, অর্হৎ এবং আর্যগণ যে মার্গপথে বিচরণ করেছেন সে মার্গই অনুসরণ করতে এসেছেন। যাঁদের নিকট বর্তমান এই সুযোগ এসেছে তা তাঁদের পূর্ব পারমীর ফল। এ সুযোগ লাভের জন্য তাঁদের আনন্দিত হওয়া উচিত। এই নিশ্চিত জ্ঞানমার্গে বিচরণ করার ফলে সমাধি এবং প্রজ্ঞার উচ্চতর জ্ঞানে উন্নীত হবেন, যে উন্নত জ্ঞান বুদ্ধ, অর্হৎ এবং আর্যগণ অধিগত হয়েছিলেন। এমন পবিত্র সমাধি বর্ধিত করবেন যা পূর্বে কখনও ধারণা করতে পারেননি এবং তৎপ্রভাবে বিশুদ্ধ সুখও অনুভূত হবে। অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন ভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে। অতঃপর জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করলে নির্বাণ সাক্ষাৎকার হবে। এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য খুব দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না, সম্ভবতঃ একমাস, বিশ দিন, পনের দিন। পূর্ব পারমীর প্রবল প্রভাবে সাত দিনের মধ্যেও লক্ষ্যে পৌছাতে পারেন। যোগীবৃন্দ, তাই অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে এবং পূর্ণ আস্থায় ভাবনা অনুশীলনে অগ্রসর হবেন। আপনাদের একাগ্র প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই মার্গ ও ফল জ্ঞান লাভ এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ ঘটবে এবং সঙ্কায়দিট্ঠি (আত্মাদৃষ্টি) এবং বিচিকিৎসা (ত্রিরত্নে সন্দেহ) মুক্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন-বিবর্তন মাধ্যমে আর নরক, অসুর, প্রেত ও পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে নিরন্তর দুঃখভোগ করতে হবে না। সকল যোগী তাঁদের সম্যক প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করুক।

সমাপ্ত

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন

দ্বিতীয় খণ্ড

পরমপুজ্য বিদর্শনাচার্য মহাসী সেয়াদ প্রণীত Basic Exercises in Satipatthana Vipassana Meditation পুস্তকের অনুবাদ ।

অনুবাদক
শ্রী সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া

VIDARASHAN BHAVANA ANUSHILAN (Part II) SUBHUTIRANJAN BARUA

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৩৯১ সন

অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রীতিরঞ্জন বড়ুয়া

১৯, ইডেন হাসপাতাল রোড, কলিকাতা-৭৩

দ্বিতীয় প্রকাশ : বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২০১০

প্রকাশনায় : বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ

প্রাপ্তিস্থান

- ১। শ্রী সুপ্রীতিরঞ্জন বড়ুয়া
১৯ ইডেন হাসপাতাল রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭৩
- ২। শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার
১ বুডিডষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলি-৭০০০০১২
- ৩। শ্রীসুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া
বোধি নিকেতন, ৩২, গ্রীণ পার্ক, কলি-৭০০০৫৫
- ৪। ন্যাশনাল বুক সপ
২১ কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭০০০৭৩

ভূমিকা

আমরা প্রত্যেকে সুখ ও শান্তির প্রত্যাশী। পৃথিবীতে এমন কোন লোক দেখা যায় না যিনি জীবনে সুখ কামনা করেন না। আমরা সকলেই যে জাগতিক সুখের জন্য ব্যাকুল তা খুবই ক্ষণস্থায়ী। বার বার এই সুখ আমাদের কাছে আসে ও পরমুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়। তাই এই জাগতিক সুখে আমরা তৃপ্ত হতে পারি না। আমরা যে সুখ ও শান্তির পিছনে ছুটে চলেছি তা ষড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ কোন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে পরিতৃপ্ত হতে বা স্থায়ীসুখ লাভ করতে পারে না। তাহলে আমরা এত দুঃখকষ্টের বিনিময়ে এই ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের জন্য লালায়িত হব কেন?

জাগতিক সুখ লাভের সঙ্গে সঙ্গে হারাতে হয় বলেই তার পরিণামও দুঃখের। দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সাংসারিক সুখে বীতশ্রদ্ধ মানুষ ইহজীবন ও পরজীবনে নিবিড় আনন্দ ও পরম শান্তির অন্বেষণে বিদর্শন ভাবনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই পরমশান্তি কেহ কারো কাছ থেকে গ্রহণ করতে বা কেহ কাউকে দান করতে পারে না। তা নিজেই অর্জন করতে হয় বুদ্ধ নির্দেশিত আধ্যাত্মিক পথে জীবন পরিচালিত করে এবং বিদর্শন ভাবনায় আত্মনিয়োগ করে।

বিদর্শন ভাবনা বা লোকোত্তর কর্ম পার্থিব মনকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে নিরাসক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে মন জাগতিক আসক্তি রহিত হয়ে লোকোত্তর মনে রূপান্তরিত হয়। লোকোত্তর মন নির্বাণ আয়তন অবলম্বন করে নির্বাণ ধাতুতে বিলীন হয়। ইহাই চিত্তের নিরোধ দর্শন, প্রজ্ঞালাভ ও সত্যাদর্শন। এইভাবে বিদর্শন-যোগী ইহজীবনে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন এবং পরম শান্তির অধিকারী হয়ে জীবন ধন্য করেন। বিশ্বের অসংখ্য মানুষ আজকাল অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এই

সত্যদর্শনে প্রয়াসী হয়েছেন। আমাদের দেশের ভাবনা অনুরাগীরা যাতে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাকে পাথেয় করে সেই অনন্তসুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করতে উৎসাহী হন সেই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তিকা অনুবাদে প্রয়াসী হয়েছি।

‘বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন’ প্রথম খণ্ড প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যে এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে ১১ শ্রীনাথ দাস লেন কলিকাতা-১২ নিবাসী শ্রীমতী জ্যোতিষ্ময়ী বড়ুয়ার বদান্যতায়। তিনি তাঁর পরলোকগত স্বামী পুলিন বিহারী বড়ুয়া মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের ছাপা খরচ বাবদ পাঁচশত টাকা সাহায্য করে আমার অশেষ কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন।

আমার এবং এই পুস্তকপাঠে উপকৃত যোগীবৃন্দের পুণ্যাংশ তাঁর প্রয়াত স্বামীর পারলৌকিক হিতের জন্য বর্ষিত হউক — এই কামনা করি।

আশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৩৯১

বোধি নিকেতন

৩২ গ্রীণ পার্ক

কলিকাতা-৫৫

শ্রী সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া

উৎসর্গ

তরুণ বয়সে যাঁর সান্নিধ্যলাভে বুদ্ধকথা জ্ঞাত হতাম সেই
 পরমপূজ্য প্রয়াত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়ার স্মৃতির
 উদ্দেশ্যে এই পুস্তক শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে অর্পিত হল ।

ইতি
 সুভূতি

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন

বিদর্শন ভাবনা আরম্ভের পূর্বে করণীয় বিষয়

যিনি আন্তরিকভাবে ভাবনার মাধ্যমে জীবনে উৎকর্ষ সাধন করতে চান বা ইহজীবনে বিদর্শন জ্ঞান লাভ করতে চান তাঁকে বিদর্শন ভাবনায় নিরত থাকাকালীন সময়ে সর্বাত্মক বৈষয়িক চিন্তা ও কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। সে সময়ে গৃহী-যোগীকে গৃহীশীল^১ (চরিত্র সংযম নিয়মাবলী) এবং ভিক্ষু-যোগীকে ভিক্ষুশীল^২ প্রতিপালন করতে হবে। শীলপালন চরিত্র বিশুদ্ধির অন্যতম অঙ্গ। ভাবনা বৃদ্ধি এবং বিদর্শন জ্ঞান উপলব্ধির পক্ষে শীল পালন অপরিহার্য। তাই শীলকে ধ্যান বিষয়ের প্রাথমিক সোপান রূপে গণ্য করা হয়। যোগীর এরূপ বিশ্বাস থাকা উচিত যে তাঁর কায় মন বাক্যের বিশুদ্ধতাই তাঁকে ইন্দ্রিয় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যোগী যদি কোন সময় আর্ষের (স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ-এর) প্রতি ঘৃণাভাব বশতঃ নিন্দা বা উপহাস করে থাকেন তবে তিনি তাঁর কর্মস্থানাচার্যের (ভাবনা শিক্ষক) মাধ্যমে কৃতকর্মের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা ভিক্ষা করবেন। ত্রিপিটকের অর্থকথায় বলা হয়েছে যে ভাবনা অনুশীলন কালে যোগীকে বুদ্ধের শরণাগত হতে হবে। একথার বিশেষত্ব এই যে তিনি ভাবনার সময় কোন অশুভ-ভীতিপ্রদ দৃশ্য দর্শনে বা চিন্তে ভয় হলে তাতে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাবেন। যোগী নিজেকে বিদর্শন আচার্যের নিকট সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করবেন এর বিশেষ সুবিধা হলঃ আচার্য তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ সরল মনে ভাবনা বিষয়ক আলোচনা বা পথ নির্দেশ ও উপদেশ প্রদানে দ্বিধাবোধ করবেন না। সুতরাং যোগী সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বুদ্ধ এবং বিদর্শন আচার্যের নিকট নিজেই সমর্পণ করবেন। যদি কোন যোগী এরূপ নিজেই সমর্পণ করতে দ্বিধাবোধ করেন, তবে তিনি অন্ততঃ আচার্যের নির্দেশ ও উপদেশ অনুযায়ী ভাবনা কার্য অনুশীলন করবেন। নির্বাণ পরম কল্যাণকর এবং উত্তম ব্যবস্থা। আর্ষ অষ্টাঙ্গিক মার্গও কল্যাণ প্রদায়ী পথ। নিরবচ্ছিন্ন বা অবিরাম

১. গৃহীশীল : পঞ্চশীল - প্রাণীহত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা-ভাষণ এবং নেশাদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা।
২. ভিক্ষুশীল : ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ পুস্তকে বর্ণিত শীল পালন।

ভাবনা অনুশীলন তাঁকে নিশ্চিত মার্গজ্ঞান ও নির্বাণে উন্নয়ন করবে। তাই যোগী তাঁর মনকে (নির্বাণমুখী করে) একান্তভাবে ভাবনায় নিবিষ্ট করবেন। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাবনা করলে ভাবনানুশীলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণ এবং আর্যগণ (বিমুক্ত এবং বিমুক্তি মার্গে আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ) অনুরূপ অবিরাম ভাবনানুশীলন করেই নির্বাণ দর্শন করেছেন। যোগীর পক্ষে গৌরব করার বিষয় এই যে, তাঁরা পূর্ব বুদ্ধগণের আবিষ্কৃত, প্রদর্শিত এবং আচরিত মার্গ পরিক্রমায় সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। বুদ্ধের নয়গুণে শ্রদ্ধা স্থাপন করে এবং তাঁর শরণাগত হয়ে যোগী পূর্ণোদ্যমে ভাবনা আরম্ভ করবেন। বুদ্ধের নয় গুণ হল : তিনি অহঁত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন, সুগত লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমানব শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। তারপর যোগী, নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বজীবের প্রতি অসীম, অপ্রমেয় মৈত্রী বিস্তার করবেন (নিজকে ভালবাসার ন্যায় তাদের প্রতি ভালবাসা প্রসারিত করবেন)। তৎসঙ্গে এ দেহের নশ্বরতা, অশুচিতা প্রভৃতি দেহের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম (মৃত্যু) ভাবনা করবেন এবং সর্বজীব চির-সঞ্চরণমান মৃত্যু-পথের অভিযাত্রীরূপে মৃত্যু ভাবনা করবেন। পদ্মাসনে বসে ভাবনা অনুশীলন করাই উত্তম। পায়ের পাশে বা উপরে পা রেখে (পায়ে চাপ সৃষ্টি না করে, মেরুদণ্ড সোজা রেখে) বসে যোগীর অধিক সময় ভাবনানুশীলন আরামপ্রদ হতে পারে। যাঁরা মেঝেতে বসে বা পদ্মাসনে বসে ভাবনানুশীলনে কষ্টবোধ করেন তাঁরা অন্য কোন আরামদায়ক আসনে বসে ভাবনা চর্যা করতে পারেন। তারপর যোগী পরবর্তী পর্বসমূহ বর্ণিত ভাবনানুশীলন উপদেশ অনুসরণ করে ভাবনা আরম্ভ করবেন।

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন পদ্ধতির মৌলশিক্ষা

প্রথম শিক্ষা পর্ব

আরম্ভ : যোগী প্রথমত: তাঁর উদরে মন সংযোগ করবেন। তাতে তিনি তাঁর উদরের উঠা-নামার গতি জানতে সক্ষম হবেন। প্রথম অবস্থায় যদি উঠা-নামার গতি সম্যক উপলব্ধি না হয় তখন এক বা দুই হাত উদরের উপর স্থাপন করবেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাসের উর্ধ্বগতি এবং প্রশ্বাসের নিম্নগতি স্পষ্টভাবে অনুভূত হবে। তখন শ্বাসের উর্ধ্বগতিকে ‘উঠছে’ আর প্রশ্বাসের নিম্নগতিকে ‘নামছে’, এরূপ প্রত্যেকবার উঠা-নামার প্রতিটি গতিকে ‘উঠছে-নামছে’ বলে মনে মনে ধারণা করতে হবে (বা জানতে হবে)। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস উঠা-নামার কাজকে সম্যকরূপে অবগত হবার জন্য সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। যোগীর এমন ধারণা হতে পারে যে এই অনুশীলন উদরের আকার পর্যবেক্ষণ মাত্র, তা প্রকৃত উঠা-নামার পর্যবেক্ষণ নয়। বস্তুত: যোগীর এরূপ চিন্তা করা উচিত নয়। তিনি শুধুমাত্র উঠা-নামার গতির প্রতি অবহিত হবেন। নূতন যোগীর পক্ষে ‘স্মৃতি’, ‘সমাধি’ ও ‘প্রজ্ঞা’ ভাবনায় এটাই সহজতম পন্থা। দীর্ঘ সময় এভাবে তিনি ভাবনা (ধ্যান) অনুশীলন করলে তাঁর নিকট উদরের সংকোচন ও প্রসারণ ব্যতীত শ্বাস উঠা-নামাই স্পষ্ট অনুভূত হবে। বিদর্শন ভাবনায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করলে তবেই যোগী ষড়ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় (নাম-রূপের)^১ পর্যায়ক্রমে ঘটনাগুলি (ইন্দ্রিয়দ্বারে আগত গ্রাহ্য বিষয়) এবং তার গমন অনুধাবন করতে বা জানতে সক্ষম হবেন। নূতন যোগীর স্মৃতি-সমাধি দুর্বল, তাঁদের ষড়ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি ঘটনা পরস্পরের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট বা মন সংযোগ করা কঠিন। তিনি প্রতিটি ঘটনা পরস্পরের প্রতি

১. স্মৃতি : কায়, বেদনা, চিত্ত, ধর্ম পর্যবেক্ষণ দ্বারা মার্গজ্ঞান উৎপাদন।

২. সমাধি : চিত্তের শান্ত্যাব উৎপাদনের নামই সমাধি।

৩. প্রজ্ঞা : নাম-রূপের অনিত্যতা, দুঃখময়তা ও অনাত্মতা দর্শন।

৪. মন এবং কায় : নাম হল বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও কল্কত্রয়। আর রূপ হল, চক্ষু, শ্রোত্র, স্পর্শ, জিহ্বা, কায়, স্ত্রীভাব, পুংভাব, হৃদয়বাস্তব-দশক প্রভৃতি এবং রূপ জীবিতেন্দ্রিয় নবক।

কি প্রকারে চিন্তা সংযোগ করতে হবে তাই ভেবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন বা দিশেহারা হন। অথবা মানসিক বিষয় সন্ধানে ব্যথা সময় নষ্ট করেন। উঠা-নামারূপ (উদরের) গতি সর্বদা বিরাজমান। প্রকৃতপক্ষে তার অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন হয় না। নূতন যোগীর পক্ষে উঠা-নামারূপ গতিতে চিন্তাসংযোগ করা খুবই সহজ। এ কারণে প্রথম শিক্ষা পর্বকে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন পদ্ধতির মৌলশিক্ষা রূপে অভিহিত করা হল। যোগী ভাবনায় অগ্রসর হলে, পরবর্তী অনুশীলন পদ্ধতির বিষয় বর্ণনা করা হবে। যোগী কেবলমাত্র উদরের উঠা-নামার গতিতে মন রেখে বা জ্ঞাত হয়ে ভাবনা অনুশীলন কার্য চালিয়ে যাবেন।

এখানে একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে যোগী উদরের উঠা-নামা সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি গতিকে মন দিয়ে উর্ধ্বগতি হলে ‘উঠছে’ নিম্নগতি হলে ‘নামছে’ ধারণা করবেন। কদাচ মুখে উচ্চারণ করবেন না। উর্ধ্ব বা নিম্নগতিকে প্রকট করার জন্য দ্রুত বা গভীর শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগে বিরত থাকবেন। যদি শ্বাস-প্রশ্বাসকে দ্রুত এবং গভীর করেন, তবে শীঘ্র তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন এবং অধিক সময় ভাবনা অনুশীলনে সক্ষম হবেন না। যোগী কেবলমাত্র উদরের উঠা-নামার উপর মনসংযোগ করে সহজ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করবেন।

দ্বিতীয় শিক্ষা পর্ব

উদরের প্রতিটি উঠা-নামা পর্যবেক্ষণকালে ‘উঠছে-নামছে’ রূপে জেনে ভাবনা করার সময় অন্যান্য মানসিক ক্রিয়া বা ধারণা ইত্যাদি যেমন-কোন চিন্তা, ইচ্ছা, কল্পনা ভাবনার সময় মনে আসতে পারে। এ সকল মানসিক কর্মকে অগ্রাহ্য করা বা তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা কখনই উচিত নয়। যখন যা ঘটে বা উপস্থিত হয় তখনই তা অবহিত হওয়া উচিত এবং মনে সে বিষয় উপস্থিত হয়েছে বলে জানা একান্ত দরকার। যদি যোগী কোন কল্পনা করেন তখন তিনি ‘কল্পনা করছি’ এরূপ অবহিত হবেন; যদি কোন চিন্তা করেন তখন তিনি ‘চিন্তা করছি’ এরূপ অবহিত হবেন; যদি কোন সঙ্কল্প করেন তখন তিনি ‘সঙ্কল্প করছি’, কোন সন্দেহ বা অভিপ্রায় মনে এলে ‘সন্দেহ করছি’ ‘অভিপ্রায় হয়েছে’ কিছু বুঝতে পারলে ‘বুঝতে পারছি’ এরূপ অবহিত হবেন বা জানবেন। যদি মন ভাবনার বিষয় থেকে অন্যত্র চলে যায় তখন ‘মন অন্যত্র ঘুরছে’ বলে জানবেন। যদি কল্পনায় কোথাও যাচ্ছেন বলে মনে হয় তখন ‘যাচ্ছি’, সেখানে পৌঁছলে ‘পৌঁছেছি’, কারো সঙ্গে দেখা হলে ‘দেখা হচ্ছে’, কথা বললে ‘কথা বলছি’, তর্ক করলে ‘তর্ক করছি’ এরূপ অবহিত হবেন বা জানবেন। যদি কোন মূর্তি, বর্ণ, আলো ইত্যাদি নিমীলিত

চক্ষে উপস্থিত হয় তখন তা 'দেখছি' বলে জানবেন। এ সকল মানসিক নিমিত্ত (বিষয়) মন থেকে লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত 'দেখছি, দেখছি' পর্যায়ে অবহিত চিন্তে জানতে হবে। নিমিত্তগুলি মন থেকে অন্তর্হিত হলে যোগী পুনরায় প্রথম শিক্ষা পর্বে বর্ণিত অর্থাৎ উদরের উঠা-নামায় মন দিয়ে 'উঠছে-নামছে' ধারণায় ভাবনা করবেন। এরূপে নিয়মিত ভাবনা অনুশীলন করে যেতে হবে। ভাবনা করার সময় যদি থুথু গিলে ফেলার ইচ্ছা হয় 'ইচ্ছা হয়েছে', যদি বাইরে ফেলার ইচ্ছা হয় 'ইচ্ছা হয়েছে', ফেলার সময় 'ফেলছি' ধারণা করে করে অবহিত চিন্তে এসব কাজ করবেন। তারপর প্রথম শিক্ষা পর্বে বর্ণিত অর্থাৎ উদরের উঠা-নামার চিন্তা সংযোগ করে 'উঠছে-নামছে' রূপে ভাবনা করবেন। যদি ঘাড় নোয়াতে ইচ্ছা হয় 'ইচ্ছা হয়েছে', নোয়াবার সময় 'নোয়াচ্ছি', ঘাড় সোজা করবার ইচ্ছা হলে 'ইচ্ছা হয়েছে', সোজা করবার সময় 'সোজা করছি', —এরূপ ধারণা মনে জাগ্রত রেখে তা করবেন। দেহ সোজা করতে ইচ্ছা হলে 'ইচ্ছা হয়েছে', সোজা করার সময় 'সোজা করছি' এরূপে ধারণায় অবহিত থাকবেন। দেহ বা ঘাড় নোয়ানো বা সোজা করার সময় তা ধীরে ধীরে নোয়ান ও সোজা করা ক্রিয়ায় জাগ্রত থেকেই করতে হবে। এ সকল কাজ সম্পন্ন হবার পর যোগী পুনঃ পূর্বের মতন উদরের উঠা-নামায় স্মৃতিশীল হবেন।

তৃতীয় শিক্ষা পর্ব

যোগী যখন অধিক সময় একাসনে একই ভাবে আসীন বা শায়িত অবস্থায় ভাবনা অনুশীলন করবেন তখন অত্যন্ত ক্লান্তি বা তীব্র বেদনা দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনুভব করতে পারেন। এমতাবস্থায় তিনি মনকে সেই বেদনায়ুক্ত স্থানে স্থাপন করবেন এবং বেদনায় অবহিত হয়ে ভাবনা চালিয়ে যাবেন। ক্লান্তি বোধ করলে 'ক্লান্ত, ক্লান্ত' এবং বেদনা বোধ করলে 'বেদনা, বেদনা বা ব্যথা ব্যথা' ধারণা করে ভাবনা করবেন। ক্লান্তি বা বেদনায় মন নিবিষ্ট করে অতি ধীরে বা অতি দ্রুতগতিতে যেন প্রত্যবেক্ষণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। সাধারণতঃ এরূপ ক্লান্তি বা বেদনাভূতি ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। এমনও হতে পারে সেরূপ ক্লান্তি বা দুঃখানুভূতির তীব্রতা এত বৃদ্ধি পাবে যে তা অসহনীয় হয়ে উঠবে। যদি এসময় যোগী তাঁর আসীন বা শয়ান অবস্থার পরিবর্তন করতে চান তবে প্রথমতঃ এ পরিবর্তনের ধারণা মনে রেখে 'ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে', এরূপ মনে মনে জানবেন এবং যখন যে অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ পরিবর্তন করবেন তখন তার উপর মন বা স্মৃতি রেখে পর পর সেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (অতি দ্রুত বা অতি ধীরে না করে) পরিবর্তন করবেন।

উদাহরণ : যদি যোগীর হাত বা পা তুলতে ইচ্ছা হয় তবে ‘ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে’ যখন হাত-পা তুলছেন তখন ‘তুলছি, তুলছি’, হাত-পা বাড়ানোর সময় ‘বাড়াচ্ছি, বাড়াচ্ছি’, হাত-পা নামানোর সময় ‘নামাচ্ছি, নামাচ্ছি’, হাত-পা রাখার সময় ‘রাখছি, রাখছি’ যথাস্থানে হাত-পা স্পর্শ করলে ‘স্পর্শ করছি, স্পর্শ করছি’ এরূপ মনে মনে ধারণা করতে হবে। ধীর গতিতে এ সকল ক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে। যেই মুহূর্তে যোগী পরিবর্তিত অবস্থায় আসীন বা শায়িত হলেন সেই মুহূর্তে যোগী পুনরায় উদরের উঠা-নামায় চিত্ত সংযোগ করে ‘উঠছে-নামছে’ ধারণায় ভাবনারত হবেন। যোগী যদি তাঁর পরিবর্তিত আসনে বা শয়নে, শরীরের বা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গরম বা অস্বস্তি অনুভব করেন এবং পুনর্বীর পূর্বাসীন অবস্থার পরিবর্তন করতে চান তখনও তিনি পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে নূতন অবস্থায় আসীন হয়ে ভাবনারত হবেন।

যোগী যদি শরীরের কোন অংশে চুলকানি অনুভব করেন তবে সেই স্থানে মন নিবিষ্ট করে যথা নিয়মে ‘চুলকাচ্ছে চুলকাচ্ছে’ ধারণা করে (অতি ধীরে বা অতি দ্রুত ভাবে নয়) চুলকাবেন। এভাবে ভাবনা করে যদি চুলকানির উপশম হয় তখন যোগী পুনঃ উদরের উঠা-নামায় মনসংযোগ করে ‘উঠছে-নামছে’ ধারণায় ভাবনা করবেন। যদি যোগী অনুভব করেন যে, চুলকানির যন্ত্রণা অসহ্য হয়েছে এবং সেই চুলকানির জায়গা চুলকাতে ইচ্ছা করেছে তখন তিনি প্রথমতঃ মনে মনে ধারণা করবেন ‘ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে’, তারপর হাত তোলার সময় ‘তুলছি, তুলছি’, যখন হাত চুলকানি স্থান স্পর্শ করেছে তখন ‘স্পর্শ করছি, স্পর্শ করছি, আবার যখন চুলকাচ্ছেন তখন ‘চুলকাচ্ছি, চুলকাচ্ছি’ এরূপ ধীরে ধীরে এ সকল কাজ সম্পন্ন করবেন। চুলকানির উপশম হলে হাত সরানোর ইচ্ছা হবে তখন ‘ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে’, এবং ধীরে ধীরে হাত তোলার সময় ‘তুলছি, তুলছি’ যথাস্থানে হাত রাখবার সময় ‘রাখছি, রাখছি’, হাত পূর্ব রক্ষিত স্থানে দেহ স্পর্শ করলে — ‘স্পর্শ হচ্ছে, স্পর্শ হচ্ছে, ধারণা করবেন। অতঃপর পূর্ব নিয়মে উদরের উঠা-নামায় মন স্থাপন করে ‘উঠছে-নামছে’ ধারণায় ভাবনা করবেন।

যদি যোগী শরীরের কোন অংশে দুঃখজনক বেদনা অনুভব করেন তখন তিনি সেই বেদনাস্থানে মন স্থাপন করে বেদনাকে সে নামে ‘ব্যথা-ব্যথা’ ‘দুঃখ-দুঃখ’ ‘চাপ-চাপ’, ‘ক্লান্তি-ক্লান্তি’, ‘অস্থিরতা-অস্থিরতা’ বলে ধৈর্য সহকারে যথানিয়মে অনুধাবন করে ভাবনা করবেন। কিছুক্ষণের মধ্যে যোগী বেদনার উপশম অনুভব করবেন অথবা পূর্বাপেক্ষা অধিক বেদনার সম্মুখীন হবেন। বেদনাভূতি তীব্র আকার ধারণ করলে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। যোগী যথানিয়মে দৃঢ়তা সহকারে

ভাবনা চর্যা চালিয়ে যাবেন। এভাবে ভাবনা চালিয়ে গেলে বেদনার উপশম হয়। কিছুক্ষণ পর যদি আবার বেদনা তীব্র আকার ধারণ করে তখন সেই বেদনাকে অবহেলা বা অগ্রাহ্য করে উদরের উঠা-নামায় মন নিবদ্ধ করে 'উঠছে-নামছে' রূপ ভাবনায় নিরত হবেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে যোগী যখন সমাধিতে (প্রতিটি নিমিটে বা দেহ-মনের ঘটনায় চিত্তসংযোগ ব্যাপারে) অগ্রসর হন তখন অসহনীয় বেদনা অনুভব করেন। সে সময় যোগীর মনে হয় : তাঁর দেহের কোন অংশে অসম্ভব যন্ত্রণা বা জ্বালা অনুভূত হচ্ছে যেন ধারাল ছুরির আঘাত বা তীক্ষ্ণ সূঁচের খোঁচার মত লাগছে অথবা যেন পোকা-মাকড় শরীরের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। আবার কোন কোন সময় যোগী ভীষণ চুলকানি, দংশন, ঠাণ্ডা ইত্যাদি অনুভব করেন। যখনই তিনি ভাবনা ত্যাগ করবেন তখনই তাঁর মনে হবে সকল দুঃখানুভূতির অবসান হয়েছে। যোগী যখনই পুনঃ ভাবনায় বসবেন তখনই আবার সেই বেদনার পুনরাবির্ভাব হবে। এ সকল পীড়াদায়ক উপসর্গগুলি আসলে ক্ষতিকর কিছু বা কোন ব্যাধি নয়। এগুলি সাধারণ দেহধর্ম এবং সচরাচর মানবদেহে বিদ্যমান। সাধারণ অবস্থায় মানুষের মন বিভিন্ন জাগতিক বিষয়ে লিপ্ত থাকে বলে তখন এ সকল অকিঞ্চিৎকর বেদনা অনুভূত হয় না ভাবনায় অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার বিকাশ হেতু মন অনুভূতি প্রবণ হয়, তাই যোগী সকল (আগন্তুক) বেদনানুভূতি অতিক্রম না করা পর্যন্ত তা জানতে সক্ষম হন দৃঢ়তা সহকারে যোগী ভাবনানুগত হলে এ সকল উপসর্গ দ্বারা তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। যদি যোগী এ সকল বেদনার উপস্থিতিতে ভীত হন এবং ভাবনায় সন্দেহ প্রকাশ করে ভাবনা বন্ধ করেন তাহলে ভাবনা পরিপক্ষ না হওয়া পর্যন্ত বার বার যোগী এ সকল (আগন্তুক) বিষয়ের সম্মুখীন হবেন। যদি দৃঢ়তা সহকারে ভাবনা চর্যায় লিপ্ত থাকেন তবে এ সকল বেদনাদায়ক অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবেন। পরবর্তীকালে এমন অবস্থা হবে যোগী ভাবনাকালে কোনরূপ বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন না।

যদি যোগী দেহ দোলাতে ইচ্ছা করেন তখন 'ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে' এরূপ ধারণা করবেন এবং দেহ যখন দোলাচ্ছেন তখন 'দুলছে-দুলছে' ধারণা করবেন, এমনও হয় ভাবনার সময় দেহ সামনে পেছনের দিকে দুলতে থাকে। এজন্য ভীত বা বিচলিত হওয়ার কারণ নেই, এরূপ দোলানিতে খুশী হওয়ার বা 'তা হোক' এরূপ মনে করারও প্রয়োজন নেই। দেহ দোলনে মন রেখে ভাবনা করলেই তা স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় যোগীর কাজ হবে প্রতি দোলনে 'দুলছি দুলছি' রূপে ভাবনা করা। ভাবনা করা সত্ত্বেও যদি দেহের দোলন বৃদ্ধি

পায় তবে যোগী দেওয়াল বা থামে দেহ লাগিয়ে অথবা বিছানায় শুয়ে উদরের উঠা-নামায় মন দিয়ে ভাবনা করবেন। দেওয়াল বা থামে দেহ লাগানোর সময় বা শোয়ার সময় তা যথাযথ ভাবে ধারণা করে সে কার্য সম্পাদন করবেন, হঠাৎ করবেন না। যদি কোন সময় দেহ নড়ে বা কাঁপে তখন পূর্ববিধি অনুসারে 'নড়ছে-নড়ছে', 'কাঁপছে-কাঁপছে' ধারণা করে ভাবনারত থাকবেন। ভাবনা গভীর হলে বা ভাবনায় অগ্রসর হলে যোগী কখনও শীতলতা, শিহরণ ইত্যাদি অনুভব করেন, তা ছাড়াও যোগীর পৃষ্ঠদেশে বা সর্বদেহে আবরণও অনুভূত হয়। এ সকল সুখময় অনুভূতি 'প্রীতি' ছাড়া আর কিছ নয়। ইহা সাধারণতঃ ভাবনা কার্য সম্যকভাবে চললে অনুভূত হয়। যোগীর মন ভাবনায় নিমগ্ন থাকাকালীন সামান্য শব্দ শ্রবণে দেহ চমকে উঠে। এর কারণ হল: সুষ্ঠু ভাবনা চলাকালে বাইরের মৃদু শব্দও যোগীর মনে গভীর রেখাপাত করে। যোগী যদি ধ্যানাসন পরিবর্তন করতে চান তবে প্রথমতঃ মনে সেরূপ ধারণা করবেন তারপর ধীরে ধীরে আনুক্রমিক যখন যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থান পরিবর্তন করা দরকার সেভাবে করবেন।

ভাবনা চর্চায় রত থাকাকালে যদি যোগী তৃষ্ণা অনুভব করেন তবে তিনি ধারণা করবেন 'তৃষ্ণা হয়েছে, তৃষ্ণা হয়েছে'। যদি তখন দাঁড়াতে ইচ্ছা হয় 'ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে', তারপর যখন যে অঙ্গের স্থান পরিবর্তন করতে হয় তখন তাতে মন রেখে বা পরিবর্তনের ধারণা মনে জাগ্রত করে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হবে। দাঁড়ানোর সময় ধারণা করবেন 'দাঁড়াছি, দাঁড়াছি' সম্মুখের দিকে তাকালে 'তাকাছি, তাকাছি' সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর সম্মুখের দিকে পা বাড়াবার ইচ্ছা হলে 'ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে' পা বাড়ানোর সময় প্রতি পদক্ষেপে ধারণা করবেন 'যাচ্ছি যাচ্ছি' অথবা ডান-বাঁ, ডান-বাঁ ইত্যাদি। হাঁটবার সময় প্রতি পদক্ষেপে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে অবহিত থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

চংক্রমণ বা সীমিত স্থানে গমনাগমন ভাবনাকালে অনুরূপ নীতি অনুসরণ করে ভাবনা করতে হয়। চংক্রমণ ভাবনাকালে প্রতি পদক্ষেপের গতিতে মনসংযোগ রেখে নিম্নরূপ দু পর্যায়ে ভাবনা করবেন : (পা) 'তুলছি-রাখছি, তুলছি-রাখছি; এ পর্যায়ে ভাবনা রপ্ত হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে (পা) 'তুলছি-নিচ্ছি-রাখছি', 'তুলছি-নিচ্ছি-রাখছি' অথবা 'উপরে উঠছে, সামনে যাচ্ছে, নিচে নামছে'।

জলপাত্রের উদ্দেশ্যে যখন জলপাত্র বা জলের কলের নিকট পৌঁছাবেন তখন তিনি মনে মনে ধারণা করবেন 'তাকাছি-দেখছি', যখন আসছেন 'আসছি-আসছি',

হাত বাড়ানোর সময় ‘হাত বাড়াচ্ছি হাত বাড়াচ্ছি’, পাত্র ধরার সময় ‘ধরছি, ধরা হলে ‘ধরেছি ধরেছি’ গ্লাস বা কাপ জলে ডুবাবার সময় ‘ডুবাচ্ছি, ডুবাচ্ছি’ বা জল নেবার সময় ‘নিচ্ছি-নিচ্ছি’, গ্লাস ঠোট স্পর্শ করলে স্পর্শ করছে, স্পর্শ করছে’ বা ‘লেগেছে’ বা ঠাণ্ডা অনুভব করলে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, জল পান করার সময় ‘পান করছি, পান করছি’, গ্লাস রাখার সময় ‘রাখছি, রাখছি’, গ্লাস রেখে হাত তোলার সময় ‘তুলছি-তুলছি’, হাত যথাস্থানে রাখার সময় ‘রাখছি-রাখছি’, হাত শরীর স্পর্শ করলে ‘লাগছে-লাগছে’, পেছনে ফিরার ইচ্ছা হলে ‘ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে’, সামনে ফিরার সময় ‘ফিরছি, ফিরছি’, অগ্নিসর হবার সময় ‘যাচ্ছি-যাচ্ছি’, যথাস্থানে পৌছে থামার ইচ্ছা হলে ‘ইচ্ছা হয়েছে ইচ্ছা হয়েছে’, থামাবার সময় ‘থামছি-থামছি’। যদি তিনি বসবার আগে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে চান তবে উদরের উঠা-নামায় মনঃসংযোগ করে ‘উঠছে-নামছে’ ধারণা করে দাঁড়ান অবস্থায় ভাবনা করবেন। যদি তিনি বসতে ইচ্ছা করেন ‘ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে’ বসবার জন্য যাওয়ার সময় ‘যাচ্ছি-যাচ্ছি’, যথাস্থানে পৌছালে ‘পৌছেছি-পৌছেছি, বসবার জন্য ফিরলে ‘ফিরছি-ফিরছি’, বসতে ইচ্ছা হলে ‘ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে’, বসবার সময় ‘বসছি, বসছি’, বসবার সময় দেহের নিচুগতির দিকে মন রেখে বসবেন। যথাস্থানে বসবার সময় প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তনের গতি মনে রেখে হাত-পা ঠিক ঠিক জায়গায় স্থাপন করবেন। তারপর উদরের উঠা-নামার প্রতি চিন্তা নিবিশ্ট করে ‘উঠছে-নামছে’ ধারণা করে ভাবনা করবেন।

যদি যোগীর শয়ন করার ইচ্ছা হয় ‘ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে’। শয়ন করার সময় প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতির উপর মনঃসংযোগ করে ‘তুলছি তুলছি’, ‘ছড়াচ্ছি ছড়াচ্ছি’, ‘ঝুঁকছি, ঝুঁকছি’ ইত্যাদি ভাবনা করতে করতে শুয়ে পড়বেন। যখন শয়ন করছেন ‘শুচ্ছি-শুচ্ছি’, মাথা বালিশে স্পর্শ করলে ‘স্পর্শ করছে’, এরূপ ভাবনা করতে করতে শয্যা গ্রহণ করবেন। তারপরও হাত-পা-দেহ যথাস্থানে রাখার সময় এগুলির প্রত্যেকটির পরিবর্তনের গতির উপর মন রেখে ধীরে ধীরে স্থাপন কার্য সম্পাদন করবেন। তৎপর তিনি পুনরায় উদরের উঠা-নামায় মন রেখে ভাবনারত হবেন। যদি তিনি ব্যাথা-গরম-ঠাণ্ডা-ক্লান্তি-চুলকানি ইত্যাদি অনুভব করেন তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সেটাতে মনঃসংযোগ করে তা অনুভূত হচ্ছে বলে ধারণা করবেন। শায়িত অবস্থায়ও যদি ঢোক গিলতে, থুথু ফেলতে, ব্যাথা বা অন্য কোন রকম অনুভূতি হয় অথবা চিন্তের নানা ক্রিয়া যথা চিন্তা ভাব বা বিচার, ধারণা, কল্পনা ইত্যাদি মনে উদয় হয় অথবা হাত, পা ইত্যাদি দেহের অঙ্গের

স্থান পরিবর্তন করতে হয় তা উপবেশনকালীন ভাবনার ন্যায় তাতে চিন্তাসংযোগ করে করতে হবে। তারপর উদরের উঠা-নামায় মন দিয়ে যথাবিধি ভাবনা করবেন। যখন তন্দ্রা অনুভূত হয় তখন ‘তন্দ্রা, তন্দ্রা’ এবং ঘুম পেলে ‘ঘুম পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে’ ধারণা করবেন। যোগী ভাবনায় অগ্রসর হলে বা ভাবনা গভীর হলে তাঁর তন্দ্রা ও ঘুমের নেশা কেটে যাবে তখন যোগী নিজেকে সম্পূর্ণ সতেজ মনে করবেন। তারপর পুনঃ উদরের উঠা-নামা লক্ষ্য করে ‘উঠছে-নামছে’ ধারণা করে ভাবনা করবেন। ঘুমের ভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব না হলে যতক্ষণ ঘুমিয়ে না পড়েন ততক্ষণ ভাবনা চালিয়ে যাবেন।

ঘুম ভাঙ্গ সন্ততি বা অবচেতন মনের অবিরাম গতি ব্যতীত আর কিছু নয়। ইহা জন্মাক্ষণের (প্রতিসন্ধির) প্রথম এবং মৃত্যুক্ষণের শেষ চিন্তাক্ষণের (প্রতিসন্ধির) প্রথম এবং মৃত্যুক্ষণের শেষ চিন্তাক্ষণের অবস্থা সদৃশ। এরূপ চিন্তের (ঘুমন্ত চিন্তের) অবস্থা দুর্বল তাই ইহা বিষয় জানতে সক্ষম হয় না। জাগ্রত অবস্থায় দর্শন, শ্রবণ, চিন্তা প্রভৃতির মধ্যাক্ষণে ভবাঙ্গ-নিয়ম যথাবিধি সংঘটিত হয়। ভবাঙ্গ চলন (ভবাঙ্গ সন্ততি) কার্যতঃ ক্ষণস্থায়ী, তাই সাধারণতঃ স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় না। নিদ্রাকালে ভবাঙ্গচলন অধিক সময় স্থায়ী হয়, তাই তা সহজে প্রকট হয়। নিদ্রার সময় ভাবনা করা সম্ভব হয় না।

ঘুম থেকে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ‘জাগছি-জাগছি’ ধারণায় ভাবনা করবেন। নতুন যোগীর পক্ষে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা করা সম্ভব নাও হতে পারে। অবশ্য জাগরণ সম্বন্ধে সচেতন হলেই তিনি ভাবনা আরম্ভ করতে পারেন। উদাহরণ: জেগে ওঠার পর মনে যদি কোন কল্পনা আসে তবে সে কল্পনা আসতেই ‘কল্পনা হচ্ছে, কল্পনা হচ্ছে’ ধারণা করে ভাবনা শুরু করে দেবেন। তারপর উদরের উঠা-নামায় অবহিত হয়ে উঠছে নামছে’ ধারণায় ভাবনা করবেন। তারপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (হাত-পা-দেহ) যা কিছুর স্থান পরিবর্তন প্রয়োজন অর্থাৎ পাশ ফিরলে, হাত-পা প্রসারিত করলে তাতে মন রেখে ওঠার চিন্তা করলে ‘চিন্তা করছি, চিন্তা করছি’, যদি ওঠার ইচ্ছা করেন ‘ইচ্ছা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে’, ওঠার জন্য শরীরকে প্রস্তুত করা কালে ‘প্রস্তুত হচ্ছে, প্রস্তুত হচ্ছে’, যখন ধীরে ধীরে দাঁড়াতে সচেষ্ট হচ্ছেন ‘দাঁড়াছি-দাঁড়াছি’ ধারণা করে এ সকল কার্য সম্পাদন করবেন। উপবিষ্ট (বসা) অবস্থায় থাকলে ‘বসেছি-বসেছি’, তারপরও কিছুক্ষণ বসে ভাবনারত থাকতে চাইলে উদরের উঠা-নামায় মন দিয়ে ভাবনারত হবেন।

যোগী যখন হাত-মুখ ধোবেন, স্নান করবেন তখন সকল কাজ যথা : তাকান,

দেখা, হাত-পা বাড়ান, কিছু ধরা, জলে কিছু ডোবান (বা জলের কল খোলা) জল ঢালা, আরাম লাগা (ঠাণ্ডা বা গরম জলে) দেজ মার্জন ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে করবেন এবং তাকাচ্ছি, দেখছি, বাড়াচ্ছি, ধরছি, ডুবাচ্ছি, ঢালছি, আরাম লাগছে, ঘসছি ইত্যাদি চেতনায় অবহিত থেকে অবগাহন বা স্নান ভাবনা সম্পন্ন করবেন। যোগী আহার কার্য সম্পন্ন করার সময় খাদ্যের দিকে তাকালে ‘তাকাচ্ছি’, দেখলে ‘দেখছি’ গ্রাস তৈরি করলে ‘তৈরি করছি’, গ্রাস মুখের দিকে তুললে ‘তুলছি’ ঘাড় সম্মুখে নত করলে ‘নোয়াচ্ছি’, খাদ্য মুখ স্পর্শ করলে ‘স্পর্শ করছে’, মুখে পুরে দিলে ‘দিচ্ছি’, মুখ বন্ধ করলে ‘বন্ধ করছি’, হাত ফিরিয়ে আনলে ‘আনছি’, থালা স্পর্শ করলে ‘স্পর্শ করছি’, ঘাড় সোজা করলে ‘সোজা করছি’, চিবাতে ‘চিবাচ্ছি’, স্বাদ অনুভব করলে ‘স্বাদ পাচ্ছি’, গিলবার সময় ‘গিলছি’, আহার গলার মধ্য দিয়ে ভিতরে (পেটে) যাওয়ার সময় গলায় লাগলে ‘লাগছে’ এরূপ প্রত্যেক কাজে ধারাবাহিকভাবে মন নিবিষ্ট করে আহার ভাবনা করবেন। এরূপ ভাবনার প্রথম দিকে কিছু কিছু ক্রটি হবে, তাতে যোগী যেন নিরুৎসাহ না হন। বরঞ্চ যথাবিধি ভাবনাচর্যা চালিয়ে যাবেন। ভাবনায় পরিপক্বতা লাভ করলে যোগী অনায়াসে আহার-ভাবনা করতে সক্ষম হবেন এবং ভুল কম হবে। উন্নততর ভাবনা শিক্ষাকালে উক্ত বিষয়ে আরও বিস্তৃত ভাবনাবিধি জানতে পারবেন।

ভাবনায় অগ্রগতি

একদিন একরাত এরূপে ভাবনা অনুশীলন করার পর যোগী নিজেই বুঝতে পারবেন যে তিনি ভাবনায় কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন এবং নিয়মিত উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরত থাকতে পারেন। তখন তিনি (উদরের) উঠা-নামার পর যে একটি ছেদ আছে তা অনুভব করতে পারেন। যদি যোগী আসীন অবস্থায় ভাবনা করেন তবে এভাবে অবহিত হয়ে সেই ছেদ পরিপূরণ করবেন : ‘উঠছে-নামছে-বসেছি’। ‘বসেছি’ বলার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের আসীন অবস্থায় মন স্থাপন করবেন। আর যদি যোগী শায়িত অবস্থায় ভাবনা করেন তবে এই ছেদ পরিপূরণের জন্য এভাবে অবহিত হয়ে ভাবনা করবেন : ‘উঠছে-নামছে-শুয়েছি’। ‘শুয়েছি’ বলার সঙ্গে সঙ্গে যোগী শায়িত দেহের অবস্থার উপর মন স্থাপন করবেন। এভাবে ভাবনা করা যোগী যদি সহজ মনে করেন তবে এবার থেকে সেভাবেই এ তিন পর্যায়ে ভাবনা করবেন। আবার যদি যোগী মনে করেন এই ছেদটি ‘উঠছে’ ধারণা করার পরে হচ্ছে বা ‘নামছে’ ধারণা করার পরে হচ্ছে তখন যোগী এরূপ অবহিত হয়ে ভাবনা করবেন যথা ‘উঠছে, বসেছি (বা শুয়েছি)’ এবং ‘নামছে,

বসেছি (বা শুয়েছি)’। যোগীর যদি এ তিন পর্যায়ে বা চার পর্যায়ে ভাবনা করা সহজ এবং সম্ভব মনে না হয় তবে তিনি স্বাভাবিক দুই পর্যায় ভাবনায় অর্থাৎ উদরের উঠা-নামা অনুধাবন করে ‘উঠছে নামছে’ পর্যায়ে ভাবনা করবেন।

যোগী যখন উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করে নিবিষ্ট মনে ভাবনা করেন তখন দেহের নড়াচড়া বা কোন কিছু দর্শন বা শ্রবণ হলে বিচলিত হবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত যোগী নিবিষ্ট মনে নিবিড়ভাবে উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করে ভাবনা করতে পারছেন তখন মনে করতে হবে দর্শন এবং শ্রবণের (মন নিবিষ্ট না করেও) কার্যও উদরের উঠা-নামা পরিপ্রেক্ষিতে সুসম্পন্ন হচ্ছে। যদি যোগী ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু দেখেন তখন তিনি অবহিত চিন্তে ‘দেখছি, দেখছি’ রূপে দুবার বা তিনবার ধারণা করে পুনঃ উদরের উঠা-নামায় অবহিত হয়ে ‘উঠছে নামছে’ ধারণায় ভাবনা করবেন। যদি কোন ব্যক্তি বা অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় তখন তিনি ‘দেখছি, দেখছি’ রূপে দু’বার বা তিনবার ধারণা করে পুনরায় উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণে রত হবেন। যদি কোন শব্দ শ্রবণ করেন তখন ‘শুনছি-শুনছি ধারণা করার পর উদরের উঠা-নামায় মনোনিবেশ করে ভাবনা রত হবেন। যদি যোগী এরূপ কোন শব্দ বা দৃশ্য মনে মনে স্পষ্ট ধারণা করতে অপারগ হন এবং তাতে ভাবনায় মনোনিবেশ না করে তা নিয়ে চিন্তা আরম্ভ করেন তাহলে ভাবনা প্রকট বা পরিচ্ছন্ন হবে না। এরূপ অবস্থায় মনে ক্লেশ বা কলুষতা উৎপন্ন হয়। এরূপ চিন্তা মনে উদয় হলে তিনি দুই বা তিনবার ‘চিন্তা করছি, চিন্তা করছি’ ধারণা করে পুনঃ উদরের উঠা-নামায় মন দিয়ে ভাবনা আরম্ভ করবেন, দেহ নড়াচড়া করার সময় বা হাত-পা সঞ্চালনের সময় যদি কোন কাজের ভুল হয় তখন ‘ভুল হচ্ছে, ভুল হচ্ছে’ ধারণা করবেন। তৎপর উঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করে ভাবনা শুরু করবেন। কোন কোন সময় যোগী অনুভব করবেন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস অতি মৃদু বা ধীরে ধীরে হচ্ছে এবং তৎসঙ্গে উদরের উঠা-নামাও দুর্বল এবং অপ্রকট হচ্ছে। এমতাবস্থায় তিনি উপবেশন অবস্থায় থাকলে ‘বসেছি, স্পর্শ হয়েছে (অর্থাৎ শরীর আসন স্পর্শ করেছে) অথবা শায়িত অবস্থায় থাকলে — ‘শুয়েছি, স্পর্শ হয়েছে’ (অর্থাৎ শরীর বিছানা স্পর্শ করেছে) — এরূপ ধারণায় ভাবনা করবেন। এরূপ স্পর্শে জাগ্রত থেকে ভাবনা করার সময় পুরো দেহ (আসন বা বিছানার) একস্থানে স্পর্শ করেছে ধারণা না করে দেহের বিভিন্ন অংশ আসন বা বিছানায় ক্রমাগত বিস্তারিত হয়ে স্পর্শ করেছে ধারণা করবেন। দেহের ছয় বা সাত অংশ আসন বা বিছানা স্পর্শ করেছে তা জেনে জেনে ভাবনা করবেন।

চতুর্থ শিক্ষা পর্ব

এভাবে কিছুকাল ভাবনানুশীলনের পর যোগী যদি মনে করেন যে ভাবনায় তিনি অগ্রসর হচ্ছেন না তখন তিনি ভাবনায় অনিচ্ছা বা আলস্য অনুভব করতে পারেন। তখন তিনি আলস্যতাকে মনে মনে ধারণা করে ‘আলস্য, আলস্য’ রূপে পর্যবেক্ষণ করবেন। ভাবনায় স্মৃতি (পূর্ণ চিন্তা সমর্পণ), সমাধি (পূর্ণ একাগ্রতা), প্রজ্ঞায় (যথাভূত দর্শন) যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় না হলে যোগী তাঁর ভাবনা পদ্ধতির প্রকৃত নিয়মানুবর্তিতা (ঠিক মত হচ্ছে কিনা) সম্বন্ধে সন্ধিহান হবেন। এরূপ সন্দেহ হলে তিনি ‘সন্দেহ হয়েছে, সন্দেহ হয়েছে’ ধারণা করে ভাবনা করবেন। কোন কোন সময় তিনি ভাবনায় উৎকর্ষতা প্রত্যাশা করবেন। এরূপ অবস্থায় অবহিত চিন্তে ‘আশা করছি-আশা করছি’ রূপে ধারণা করবেন। কোন কোন সময় বিগত ভাবনা বিষয় স্মরণ, কিরূপে ভাবনা করা হয়েছে বা ভাবনা পদ্ধতি বিষয় মনে আসতে পারে, তখন তিনি ‘স্মরণ করছি, স্মরণ করছি’ মনে ধারণা করে ভাবনা করবেন, কোন কোন সময় ভাবনা বিষয় পরীক্ষা করে দেখতে চাইবেন অর্থাৎ ভাবনা বিষয় কি নাম বা রূপ? (এখানে নাম অর্থে মন বা চিন্তা আর রূপ অর্থে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় বা বস্তু)। এরূপ মনে হলে তিনি ‘পরীক্ষা করছি, পরীক্ষা করছি’ মনে ধারণা করে ভাবনা করবেন। কোন কোন সময় তিনি ভাবনায় অগ্রগতি না দেখে দুঃখিত হবেন। তখন তিনি ‘দুঃখিত-দুঃখিত’ মনে ধারণা করে ভাবনা করবেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁর ভাবনায় অগ্রগতি দেখে সুখী হবেন। তখন তিনি ‘সুখী-সুখী’ মনে তা স্মরণ করে ভাবনা করবেন। এভাবে যখন যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় তখন তাতে মনঃসংযোগ করে দু’-তিনবার ধারণা করে, সেই ভাব অন্তর্হিত হলে পুনঃ উদরের উঠা-নামায় অবহিত হয়ে ‘উঠছে-নামছে’ ধারণা করতে করতে ভাবনা করবেন।

সকালে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর থেকে রাত্রিকালে নিদ্রার পূর্ব সময় পর্যন্ত ভাবনা কার্য অনুশীলন করবার সময়। এভাবে যোগী নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাবনা চর্যায় নিরত থাকবেন। ভাবনাচর্যায় কোন প্রকার বিরাম বা বিরতির অবকাশ নেই। ভাবনায় কিছু অগ্রসর হলে বা বিশেষ কোন স্তরে উন্নীত হলে তন্দ্রা বা নিদ্রাও অনুভব করবেন না। তখন তিনি দিনরাত ভাবনা চর্যা চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষাপর্বের সংক্ষিপ্তসার

মানসিক ঘটনা বা চিন্তা কুশল হোক আর অকুশল হোক (তাতে কিছু আসে যায় না) যোগী শুধু মাত্র মানসিক ঘটনাগুলির প্রতি অবহিত হয়ে ভাবনা করবেন।

দেহের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গের ছোট বড় সব রকমের পরিবর্তন অবহিত হয়ে ভাবনা করবেন। শারীরিক প্রত্যেক সুখ বা দুঃখ অনুভূতি অবহিত হয়েও যোগী ভাবনা করবেন। মানসিক বিষয় (চিন্তার বিষয়) কুশল হোক আর অকুশল হোক তাতে অবহিত হয়েও যোগী ভাবনা করবেন। ভাবনার সময় কোন নিমিত্ত বা বিষয় যদি (মন দ্বারে বা পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দ্বারে) না আসে তবে যোগী উদরের উঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করে ‘উঠছে-নামছে’ মনে মনে ধারণা করতে করতে ভাবনা করবেন। যোগীকে যদি কোন কাজে কোথাও যেতে হয় তবে তিনি ‘যাচ্ছি, যাচ্ছি’ বা ডান-বাঁ (ডান বা বাঁ পায়ের পদক্ষেপের গতি) অনুধাবন করতে করতে পথ অতিক্রম করবেন। চংক্রমণ ভাবনা (সীমিত স্থানে সোজাসুজি গমনাগমন করে ভাবনা) করবার সময় পূর্ববর্ণিত দুই বা তিন পর্যায় (যেটা সুবিধা বা সহজ মনে হয়) পদক্ষেপ গতি অবহিত হয়ে ভাবনা করবেন। যথা — উঠছে নামছে প্রথম পর্যায়; উঠছে-যাচ্ছে-নামছে—দ্বিতীয় পর্যায়। [চংক্রমণ ভাবনাকালে যোগীর সীমিত স্থানের দুই শেষ সীমায় পৌছে পিছন ফিরতে ইচ্ছা হবে তখন ‘ইচ্ছা হয়েছে’ এবং ফিরবার সময় ‘ফিরছি ফিরছি’ ধারণা করতে হবে। তারপর যথারীতি দুই তিন পর্যায় উক্তভাবে গমনাগমন করা।]

এভাবে দিনরাত নিরবচ্ছিন্ন ভাবনা চর্যায় নিরত থাকলে ভাবনাচর্যায় নিয়ত স্মৃতি সংযোগ হেতু উদয়-ব্যয় জ্ঞান (ভাবনা অগ্রগতির চতুর্থ জ্ঞান) লাভে সমর্থ হবেন। এমন কি বিদর্শন জ্ঞানের পরবর্তী উন্নততর জ্ঞানগুলি লাভ করে পরিশেষে সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন।

সমাপ্ত

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন

(তৃতীয় খণ্ড)

পরমপূজ্য বিদর্শনাচার্য মহাসী সেয়াদ প্রণীত
Practical Insight Meditation
 পুস্তকের অনুবাদ

অনুবাদক
 শ্রী সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া

VIDARASHAN BHAVANA ANUSHILAN

(Part III)

SUBHUTIRANJAN BARUA

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৩৯১ সন

অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রীতিরঞ্জন বড়ুয়া

১৯, ইডেন হাসপাতাল রোড, কলিকাতা-৭৩

দ্বিতীয় প্রকাশ : বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২০১০

প্রকাশনায় : বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ

প্রাপ্তিস্থান

- ১। শ্রী সুপ্রীতিরঞ্জন বড়ুয়া
১৯ ইডেন হাসপাতাল রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭৩
- ২। শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার
১ বুডিডষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলি-৭০০০০১২
- ৩। ন্যাশনাল বুক সপ
২১ কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭০০০৭৩
- ৪। মহাবোধি বুক এজেন্সি
৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

ভূমিকা

“বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন” পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড (মহাসী সেয়াদ প্রণীত Practical Insight Meditation এর অনুবাদ) প্রকাশিত হল। বিদর্শন বৌদ্ধ ভাবনা পদ্ধতি। বিদর্শনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষরূপে অথবা যথাভূত দর্শন। প্রশ্ন হতে পারে কার দর্শন? বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে বলেছিলেন ‘গহকারকো দিটেঠাসি’। দেহরূপ গৃহ নির্মাতাকে দর্শন করাই বিদর্শন ভাবনার প্রধান কাজ। বুদ্ধের সাধনাও ছিল জীবনের মূলে যে ‘গহকূটং’ (গৃহের উপকরণ) বিদ্যমান রয়েছে তাকে পর্যবেক্ষণ করা এবং গৃহের যাবতীয় উপকরণ ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া। বুদ্ধের ধর্ম বিধৃত হয়ে আছে জীবনের উপাদান সমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করার মধ্যে। জীবনের মূল উপাদানগুলিকে দেখতে হলে বিশেষ পদ্ধতিতে তাকে অবলোকন করতে হয়। জীবনকে চতুর্দিক থেকে সামগ্রিকভাবে অবলোকন করার উপায় আবিষ্কার করা যায় বিদর্শনের পথ অনুসরণ করে।

আমাদের জীবন পঞ্চকক্ষের সমষ্টি মাত্র। প্রতিটি কক্ষকে আমরা কখনো পৃথক পৃথকভাবে দেখবার চেষ্টা করি না। তার কারণ দেখবার পদ্ধতি আমাদের অনেকের নিকট জানা নেই। কখনো কখনো সংক্ষেপে পঞ্চকক্ষকে আমরা নাম-রূপ বলেও অভিহিত করে থাকি। নাম-রূপের উত্থান পতন যিনি বুঝতে পারেন, যিনি এদের ক্রিয়া পদ্ধতি অনুধাবন করতে পারেন তাঁর পক্ষেই বস্তুত: বুদ্ধবাণীর মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব।

বুদ্ধের ধর্ম বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্ম। বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়ন্ত্রিত অনুধাবন বা পর্যবেক্ষণ। এর অন্য একটি লক্ষ্য হচ্ছে কোন সর্বগ্রাহ্য নীতি আবিষ্কার করা এবং তাকে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। বোধিতরু তলে বসে সিদ্ধার্থ যে সার্বিক নীতি আবিষ্কার করেছেন পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী তাই তিনি মানুষের কল্যাণে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে সমৃদ্ধতর জীবনলাভ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে ‘বিদর্শন’ প্রয়োগের দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা করে এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করে।

আলোচ্য পুস্তকের অনুবাদক শ্রীসুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া বৌদ্ধ দর্শনের পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করার যোগ্য ব্যক্তি। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি যেমন বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনায় ব্যয় করেছেন, তেমনি দীর্ঘদিন থেকে বিদর্শন

ভাবনা অনুশীলনে রত আছেন। অর্থাৎ এই ব্যক্তির মধ্যে বৌদ্ধ সাধন পদ্ধতি ও প্রয়োগের (theory and practice) অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে আপন জীবনের গভীর উপলব্ধি থেকে। এই উপলব্ধি সচরাচর স্বল্প লোকের জীবনেই ঘটে থাকে। এই পুস্তকে বিদর্শন বিষয়ে যা কিছু সন্নিবিষ্ট হয়েছে পরিবেশনার গুণে ও উপলব্ধির উজ্জ্বল আলোকে তা হয়ে উঠেছে অতুলনীয়।

জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতির সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত যে কখনো ভালভাবে একে নিরীক্ষণ করার কথা ভাবি না। অথচ সূক্ষ্মভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ধারাকে পর্যবেক্ষণ করলে এর মধ্য থেকেই জীবন উপলব্ধির নতুন রস আন্বাদন করা সম্ভব। ভাবনা অনুশীলনের প্রাথমিক স্তররূপে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে সহজ সরলভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন বিদর্শন অনুশীলন গ্রন্থে। যারা কখনও বিদর্শন অনুশীলন করেননি তাঁরাও যাতে প্রাথমিক স্তরে ভাবনা অনুশীলন করতে পারেন সেভাবে বিষয়গুলিকে এই বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন গ্রন্থে ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বাইরের দিক থেকে আমাদের সম্বন্ধে লালিত এই দেহকে যতখানি আকর্ষণীয় মনে হয় মনশ্চক্ষুতে অবলোকন করলে তা ততখানিই অলোভনীয়রূপে প্রকাশ পায়। বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করলে ভ্রান্ত দৃষ্টি অপসারিত হয়ে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়ে উঠে। বিশেষ দর্শন বস্তুকে সম্বন্ধে আমাদের নিকট প্রকাশিত করে, ফলে চিন্তে অনাসক্তির সঞ্চার হয় এবং এই অনাসক্ত ভাবনাই আমাদের মুক্তিপথের সন্ধান দেয়।

সুভূতিবাবু অনূদিত সব কয়টি বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের পাণ্ডুলিপি পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রতিটি পুস্তকের অনুবাদ সবদিক থেকে পরিপূর্ণ ও চমৎকার। বিদর্শন শাস্ত্রের মতন দূরূহ বিষয়ের পুস্তক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সুভূতিবাবু বাংলা সাহিত্যের একটি খুবই স্বল্প আলোচিত দিকের প্রতি বাঙালি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের আনন্দ এই কারণেও যে একজন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে এতে কোন ক্রটি বা ফাঁক থেকে যায়নি। তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতার গুণে বিদর্শন ভাবনার মত জটিল বিষয়ের আলোচনা সাধারণ পাঠকের নিকটও সহজ বোধ্য হয়ে উঠেছে। এই পুস্তক পাঠে সাধারণ পাঠক যেমন বৌদ্ধশাস্ত্রের এক অনাস্বাদিত অধ্যায়ের সঙ্গে সহজে পরিচিত হতে পারবেন তেমনি বিদর্শন ভাবনাকারীরাও যে বিরাট লাভবান হবেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

মহাবোধি সোসাইটি

অনাগারিক মুনীন্দ্র

৪ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

আশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৩৯২ সাল, ২৫২৯ বুদ্ধাব্দ

অনুবাদের নিবেদন

মানুষের দুঃখের অবসান এবং সুখ ও সমৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্য বিশ্বের নানা দেশে শত শত গবেষণাগারে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক নিরন্তর যে চেষ্টা চালাচ্ছেন তা কেবলমাত্র মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও ভৌতিক বা দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষের মন বা চিত্তের উৎকর্ষ সাধনের চিন্তা করেছেন পৃথিবীতে এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই অল্প। আবার অশান্ত ও চঞ্চল চিত্তকে সযত্নে প্রশিক্ষণের দ্বারা সুসংহত করে সংসারের সকল ক্লেশ থেকে মুক্তির উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন সেরূপ ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

আড়াই হাজার বছর পূর্বে বুদ্ধদেশিত ‘স্মৃতিপ্রস্থান’ সূত্রে চিত্তের উৎকর্ষতা সাধনের সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। বুদ্ধ এই সূত্রে ঘোষণা করেছেন: সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধির জন্য, দুঃখ-অনুশোচন অনুতাপ অতিক্রমণের জন্য, বেদনা-শোক নিরসনের জন্য, সম্যক মার্গে বিচরণের জন্য এবং নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চার স্মৃতিপ্রস্থান (স্মৃতি উৎপাদন) ভাবনাই একমাত্র মার্গ। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা হচ্ছে যথাক্রমে: কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন এবং ধর্মানুদর্শন (মনপ্রাহ্য বিষয়) ভাবনা। দুঃখের কারণ স্বরূপ চিত্তের আবিলতা মোচনের উদ্দেশ্যে শান্তি কামীদের এই মার্গ অনুসরণ করা একান্ত উচিত। কি প্রকারে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করতে হয় তার নির্দেশ দিতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন — কায়ানুদর্শন (কায়-প্রক্রিয়া (স্বভাব) পর্যবেক্ষণ), বেদনানুদর্শন (সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা অনুভূতিদর্শন), চিত্তানুদর্শন (লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি ১৬ প্রকার চিত্তের উৎপত্তি বিষয় পর্যবেক্ষণ) এবং ধর্মানুদর্শন (চিত্তের ভাব এবং চিত্তগ্রাহ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ) প্রভৃতির যখন যেটা চিত্তে উৎপন্ন হয় তখন সেটার প্রতি স্মৃতি স্থাপন (মনঃসংযোগ) করা।

পরমপূজা আচার্য ভদন্ত শোভন অগ্গমহাপণ্ডিত (মহাসী সৈয়াদ) তদীয় আচার্য ভদন্ত মিংগুণ জেতবন সৈয়াদর (ব্রহ্মদেশের থাটন নিবাসী) তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল কঠোরভাবে নিরবচ্ছিন্ন ‘স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা’ করে পরম সত্য উপলব্ধি করেন। অতঃপর ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৮২ সালের ১৪ আগস্ট তাঁর ইহজীবন নির্বাপিত হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৪ বছর বিদর্শন ভাবনা শিক্ষাদান করে অসংখ্য নরনারীকে মুক্তিপথের সন্ধান দেন। তাঁর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ভাবনায় উপকৃত শিক্ষার্থীদের অনুরোধক্রমে তিনি সাত অধ্যায়ে ৮৫৪ পৃষ্ঠার দুই খণ্ডের বিদর্শন ভাবনা পুস্তক রচনা করেন। বর্মী ভাষায় রচিত সেই বৃহদাকার গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ করেন তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য আচার্য ভদন্ত জ্ঞানপোনিক মহাথের এবং তা Progress of Insight Meditation নামে মুদ্রিত করা হয়। এখানে

উল্লেখ্য যে মহাসী সেয়াদর অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য পূজ্যপাদ আচার্য অনাগরিক মুনীন্দ্রজী ও তদীয় আমেরিকান শিষ্যা কুমারী মেরী ম্যাককোলম উক্ত ইংরেজী অনুবাদের কিছু কিছু সংশোধন করেন এবং তা মহাসী সেয়াদ অনুমোদন করেন। এই ইংরেজী পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ভাবনাচার্য ও স্মৃতি বৃদ্ধি প্রণালীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্তমান বাংলা অনুবাদে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে মৎকর্তৃক অনূদিত বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের ১ম ও ২য় খণ্ডে উক্ত দুই বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। কেবলমাত্র ক্রম স্তর ভেদে ভাবনায় উন্নীত হওয়ার পদ্ধতি বর্তমান পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে পালি শব্দ বা শাস্ত্রীয় সংজ্ঞার সমার্থক বাংলা শব্দ বা পরিভাষা খুঁজে না পেলেও অনুবাদের ভাষা সহজবোধ্য করতে যথাসাধ্য যত্নবান হয়েছি। এ ব্যাপারে আমার চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে তার বিচার করবেন পাঠকবর্গ। ভাবনাকারীরা এই পুস্তক পাঠে কিছুমাত্র উপকৃত বোধ করলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আচার্য অনাগরিক মুনীন্দ্রজীর অনুপ্রেরণায় পরমপূজ্য মহাসী সেয়াদর ভাবনা বিষয়ক পুস্তকগুলি অনুবাদের কাজে হাত দিই। তিনি সব কয়টি পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনমত সংশোধন করে দেন এবং পুস্তকগুলি শীঘ্র ছাপাবার পরামর্শ দেন। এই পুস্তকের জন্য তিনি একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে পুস্তকের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। নানা ব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ভূমিকা লেখার আয়াস স্বীকার করে আমায় কৃতার্থ করেছেন।

প্রসিদ্ধ বড়ুয়া বেকারীর অন্যতম সত্বাধিকারী আমার পরম সুহৃদ, সমাজহিতৈষী ও সদ্ধর্মপ্রাণ শ্রী প্রিয়দর্শী বড়ুয়া ও তাঁর স্ত্রী সাধিকা শ্রমতী সুদীপ্তি বড়ুয়া তাঁদের প্রয়াত পুত্র প্রদীপের পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করে এই সাধনা পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করে আমার এবং বিদর্শন ভাবনাকারীদের অশেষ উপকার করলেন আমি প্রার্থনা করি তাঁদের এই মহৎ ও সাধু কর্মের প্রভাবে প্রয়াত কল্যাণীয় প্রদীপের পরজন্ম পরম সুখময় ও শান্তিময় হোক।

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠক মহলের সমাদর লাভ করেছে দেখে উৎসাহিত হয়ে প্রায় ছয় মাস পূর্বে এই পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। দুর্ভাগ্যবশত: সে প্রেসটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্য একটি উপযুক্ত প্রেসের সন্ধান পেতে আরও কিছুদিন দেরী হয়। এসব কারণে এই ৩য় খণ্ড প্রকাশ করতে অত্যধিক বিলম্ব ঘটে। ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড দুটিও প্রেসে দেওয়ার অপেক্ষায় আছি। এ বিষয়ে সদ্ধর্মানুরাগী ও সদাশয় ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে এই পুস্তিক দুটি শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

ইতি

আশ্বিনী পূর্ণিমা

২৫২৯ বুধাব্দ

শ্রীসুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া

৩২, গ্রীনপার্ক, কলিকাতা

উৎসর্গ

ছাত্রাবস্থায় যাঁর স্নেহসান্নিধ্যে বৌদ্ধ সাধনতত্ত্ব বিষয় অবগত হয়েছি এবং বৌদ্ধ সাধনার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছি সেই যোগীপ্রবর পরমপূজ্য ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরকে আমার এই বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন (৩য় খণ্ড) পুস্তকটি শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে অর্পণ করলাম ।

ইতি
সুভূতি

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন

(৩য় খণ্ড)

ভাবনা প্রগতি

অধ্যবসায় সহকারে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনে (বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন পুস্তকের ১ম ও ২য় খণ্ডে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে) যখন যোগীর মনসংযোগ এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি পায় তখন তিনি এক বিষয়ের বা ঘটনার একই মুহূর্ত দুই কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে এবং তা জ্ঞাত হতে সমর্থ হন। শ্বাস উঠছে এবং তার অবগতি (জানা), প্রশ্বাস নামছে এবং তার অবগতি (জানা), বসেছি এবং তার অবগতি, শরীর নোয়াচ্ছি এবং তার অবগতি, হাত বা পা বাড়াচ্ছি বা তুলছি এবং তার অবগতি, হাত বা পা রাখছি এবং তার অবগতি ইত্যাদি স্মৃতি সহকারে (চিন্তা বা মনের একাগ্রতা সংযোগ) প্রত্যেক মানসিক এবং কায়িক কার্যপ্রক্রিয়া কিভাবে পৃথক পৃথকভাবে সম্পন্ন হয় তা যোগী জ্ঞাত হন। উঠার গতি এক কার্য প্রক্রিয়া, তা জানা অন্য এক কার্যপ্রক্রিয়া। নামার গতি এক কার্য প্রক্রিয়া তা জানা অন্য এক কার্যপ্রক্রিয়া। এইভাবে যোগী উপলব্ধি করতে পারেন — জানার কার্যপ্রক্রিয়ার প্রকৃতি (স্বভাব) হল কোন বিষয়ের প্রতি (মন) ধাবিত হওয়া। এরূপ উপলব্ধি মনের প্রকৃতিগত কর্ম কোনো বিষয়ের প্রতি অবনমনকে (নমিত হওয়াকে নির্দেশ করে বা বিষয় জ্ঞাত হওয়াকে প্রকাশ করে। আমাদের জানা দরকার যে কোন জড় পদার্থ যত সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় তা তত স্পষ্টরূপে মানসিক কার্যপ্রক্রিয়ায় জানা যায়। এ বিষয়ে বিশুদ্ধিমার্গে এরূপ বর্ণিত হয়েছে :

‘জড়ত্বের অনুপাতক্রম তাঁর নিকট স্পষ্ট, বাধাহীন এবং নিশ্চিতরূপে পরিষ্কার হয়, সুতরাং অজড়ের (মনের) মধ্যে যে জড় বিষয় স্থিত (উৎপন্ন) হয়েছে তা নিজেই স্বভাবত: প্রকাশিত (সুস্পষ্ট) হয়।’ [ভদন্ত জ্ঞানমূলি কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদের ৬৮৪ পৃষ্ঠা]

সরলমনা যোগী কায়িক এবং মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এইরূপে বিচার করেন : উদরের উত্থান অবস্থা এবং তাকে জানা; উদরের পতন অবস্থা এবং তাকে জানা... ইত্যাদি...। উত্থান এবং পতন ব্যতীত আর কিছু নেই।

‘পুরুষ’ বা ‘নারী’ শব্দ যে সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হয় তা এই একই প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। তাতে ব্যক্তি সত্ত্বা বা আত্মা বলে কিছু নেই। ভাবনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জড়বস্তুর কার্যপ্রক্রিয়া এবং মানসিক কার্যপ্রক্রিয়ার পার্থক্য সম্বন্ধে এরূপ বিচার করেন : দেহ ও মন যে আছে ইহা বাস্তব সত্য। তার বাইরে পুরুষ বা নারী রূপে কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব নেই। ভাবনাকালে যোগী জড়ের কার্যপ্রক্রিয়াকে জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ারূপে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেই দেহ-মনের যুগপৎ দুই কার্যপ্রক্রিয়াকে প্রচলিত রীতি অনুসারে জীব, ব্যক্তিসত্ত্বা বা আত্মা, পুরুষ, নারীরূপে নির্দেশ করে বলে জ্ঞাত হন। কিন্তু দেহ-মনের যুগপৎ দুই কার্যপ্রক্রিয়ার বাইরে ব্যক্তিসত্ত্বা বা জীব, আমি বা অন্য কোন পুরুষ বা নারী সংজ্ঞাবাচক পৃথক কিছু নেই। যখন যোগী এরূপ বিচার করেন তখন — ‘বিচার করছি, বিচার করছি, রূপে ধারণা করবেন।’

অতঃপর উদরের উঠানামা পর্যবেক্ষণ করে — ‘উঠছে, নামছে’ ধারণায় ভাবনা রত হবেন।’

ভাবনায় অগ্রগতি হলে কায়িক (দৈহিক) পরিবর্তন ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সচেতন চিন্তে কোন অভিপ্রায় বা ইচ্ছা প্রকটিত হয়। যদিও ভাবনা অনুশীলনের প্রাথমিক অবস্থায় যোগী ‘ইচ্ছা করছি, ইচ্ছা করছি’ ধারণা করেন (যেমন হাত নোয়াবার সময়) তথাপি তিনি তখন সেই সচেতন চিন্তকে (ইচ্ছাকে) পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হননা। ভাবনায় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করার ইচ্ছা বা সচেতন চিন্তকে পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করেন বা জানেন। সুতরাং তিনি দেহ নড়াচড়া (পরিবর্তন) করার সময় চিন্তে প্রথমে ‘ইচ্ছা হয়েছে’ এরূপ চেতনা (অনুভূতি) পর্যবেক্ষণ করেন; তারপর সেই নির্দিষ্ট কায়িক পরিবর্তন জ্ঞাত হন। ভাবনা প্রারম্ভকালে এরূপ কোন ইচ্ছাকে জানতে ভুল করলে তা জ্ঞাত হওয়ার চেয়ে কায়িক পরিবর্তন দ্রুততর মনে করতেন। ভাবনার উন্নত স্তরে পৌঁছে যোগী জানতে পারেন মনই পূর্বগামী। যোগী এখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নোয়াবার বা প্রসার করার ইচ্ছা, বসার ইচ্ছা, দাঁড়াবার ইচ্ছা, যাওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদিকে সঠিকভাবে জানেন এবং ওই সব কার্যপ্রক্রিয়া সঠিক বা পরিষ্কারভাবে জানেন। সুতরাং যোগী অনুভব করেন : মন যে দৈহিক (কায়িক) কার্যপ্রক্রিয়া জ্ঞাত হয় তা দৈহিক কার্যপ্রক্রিয়া থেকে দ্রুততর। তাঁর এরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় : দৈহিক কার্যপ্রক্রিয়া আরম্ভ হয় — ‘ইচ্ছা হয়েছে’ — এ চেতনার

১. নাম-রূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান (এই অনুচ্ছেদের ভাবনা জ্ঞান)। নাম এবং রূপকে পৃথকভাবে জানা।

পর। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইহাও জ্ঞাত হন : উষ্ণতা ও শীতলতার তীব্রতা বৃদ্ধি হয় যখন তিনি 'গরম, গরম বা ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা' রূপে মনে মনে ধারণ করে পর্যবেক্ষণ করেন। স্বাভাবিক দৈহিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া যথা উদরের উঠা-নামা ভাবনা করার সময় একটির পর অন্যটি অবিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি মনশ্চক্ষে বুদ্ধ এবং অহৃতের প্রতিবিম্ব দর্শন করেন; দেহের কোন বেদনা (চুলকানি, ব্যাথা, গরম ইত্যাদি) দেহের কোন বিশেষ অংশে উৎপন্ন হলে সে বিশেষ অংশে মনোনিবেশ করলে তিনি তা জানেন। কোন এক বেদনার কদাচিৎ উপশম হয়েছে (যা চলে গেছে) তখন অন্য একটি বেদনার উৎপন্ন হয়েছে — এরূপ অবস্থারও তিনি ক্রমাগত সকল বেদনা পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিটি বিষয় অর্থাৎ যখন যা ঘটে বা উৎপন্ন হয় তখন তিনি তা অবহিত হন। জানা বা জ্ঞাত হওয়ার মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া কোন এক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন সময় উদরের উঠা-নামা এত অস্পষ্ট বা ক্ষীণ হয় যে তখন তা পর্যবেক্ষণ করার কিছুই থাকে না। তখন তাঁর মনে হয় কোন 'বিষয়' ব্যতীত কিছুই জানা যায় না। যখন উদরের উঠা-নামা জানা সম্ভব নয় তখন যোগী — 'বসেছি, শরীর আসন স্পর্শ করেছে' অথবা শায়িত থাকলে — 'শুয়েছি, শরীর শয্যা স্পর্শ করেছে' ধারণা করবেন। স্পর্শকে পর পর জানতে হবে। উদাহরণ : আসীন অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ বা অনুধাবন করে ডান পায়ের স্পর্শকে (অর্থাৎ ডান পায়ের আসন বা মেঝের স্পর্শকে) পর্যবেক্ষণ করুন। তারপর আসীন অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করে (বা অবহিত হয়ে) বাম পায়ের স্পর্শকে পর্যবেক্ষণ করুন। একইভাবে দেহের বিভিন্ন অংশের স্পর্শ পর্যবেক্ষণ করুন। আবার তাকান, দেখা, শুনা প্রভৃতি বিষয় যোগী এরূপ জ্ঞাত হন : দর্শন (বা দেখার) কার্য উৎপন্ন হয় চোখের সঙ্গে দৃশ্যমান পদার্থের সংস্পর্শে, শ্রবণকার্য উৎপন্ন হয় কান এবং শব্দের সংস্পর্শে ইত্যাদি।

যোগী আরও বিচার করেন : কায়ের (জড়ের) কার্যপ্রক্রিয়া যথা শরীর নোয়ানো, হাত বা পা বিস্তার ইত্যাদি মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া যথা- 'ইচ্ছা হয়েছে, বাড়াচ্ছি ইত্যাদি চিন্তা-ক্রিয়াকে অনুসরণ করে। তিনি বিচার করেন: 'কোন ব্যক্তির শরীর তেজ ধাতুর কারণে গরম বা ঠাণ্ডা হয়। খাদ্য দ্বারা দেহের স্থিতি এবং পুষ্টি সাধন হয়। বিষয়ের উপস্থিতিতে চিন্তা উৎপন্ন হয়। দর্শন (দেখা) চিন্তা উৎপন্ন হয় দর্শনীয় বিষয় বা বস্তু উপস্থিত হলে, শ্রবণ চিন্তা উৎপন্ন হয় শব্দ শুনলে এবং চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি স্পর্শেন্দ্রিয়ও কারণ স্বরূপ যুক্ত থাকে। ইচ্ছা এবং পর্যবেক্ষণ (বিষয়ের প্রতি অনুধাবন) অতীত অভিজ্ঞতার ফল; সকল প্রকার স্পর্শানুভূতি (ইন্দ্রিয়ানুভূতি) পূর্ব কর্মের ফল। কায়িক (জড়) কার্যপ্রক্রিয়া এবং মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া পূর্বজন্মের ফল স্বরূপ জন্মাবধি চলে আসছে বা সম্পন্ন হচ্ছে। এই দেহ-মনের সৃষ্টি কর্তা

কেহ নেই। যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ কার্য-কারণ নির্ভর।' যোগীর মনে যখন যে বিষয় উপস্থিত হয় তখন সেই বিষয় পর্যবেক্ষণ হেতু তাঁর নিকট উক্ত বিচার উপস্থিত হয়। একরূপ বিচার মনে আসার জন্য তিনি ভাবনা বন্ধ করেন না। যখন বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করেন তখন এরকম বিচার তাঁর নিকট স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতি দ্রুত উদয় হয়। যোগী তখন নিশ্চিতরূপে পর্যবেক্ষণ করবেন — 'বিচার করছি, বিচার করছি; জানছি, জানছি।' এভাবে কায়িক কার্যপ্রক্রিয়া এবং মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণকালে একই প্রকৃতির কার্যপ্রক্রিয়া পূর্ব কার্যপ্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল রূপে অবগত হন। তিনি আরও বিচার করেন : এই দেহ-মন অতীতে জীবন প্রবাহ (চলা) কালে, তারও অতীত জীবন প্রবাহের কারণ বই আর কিছু নয়; এবং ভবিষ্যৎ জীবন প্রবাহ কালে দেহ-মন অনুরূপ পূর্ব-কার্যপ্রক্রিয়া বা কর্মের ফল হয়ে সঞ্চারিত হবে। এই দেহ-মনের দ্বৈত কার্যপ্রক্রিয়া ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন জীব বা ব্যক্তি নেই। শুধুমাত্র কার্য — কারণ — ফল প্রকাশিত এবং প্রবাহিত হচ্ছে। একরূপ বিচার মনে উদয় হলে নিশ্চিতরূপে তা পর্যবেক্ষণ বা ধারণা করবেন। তারপর যথারীতি (উদরের উঠানামা রূপ) ভাবনায় মনোনিবেশ করবেন। গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট একরূপ অনেক প্রকার বিচার উপস্থিত হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যখন যে বিচার মনে উপস্থিত হবে তখন আগ্রহ সহকারে তা পর্যবেক্ষণ করতেই হবে। একরূপ বিচার-চিন্তা পর্যবেক্ষণ দ্বারা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকবে এবং বিচার আতিশয্যে অপ্রতিহত গতিতে প্রজ্জ্বলাভের দিকে অগ্রসর হবেন। যখন নিরবচ্ছিন্নভাবে (দিনরাত) ভাবনা অনুশীলন করা হয় তখন যোগী অসহনীয় অনুভূতি যথা চুলকানি, ব্যথা, গরম, অবসাদ, কাঠিন্য ইত্যাদি অনুভব করেন। এসব বেদনায় স্মৃতি স্থাপন করা হলে ধীরে ধীরে এগুলি চলে যায়। যখন পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করা হয় তখন সেগুলির পুনরুৎপত্তি হয়। দেহের সংবেদনশীল স্বভাবের ফলে একরূপ অনুভূতি উৎপন্ন হয়। ইহা কোন রোগের লক্ষণ নয়। নিবিড় একাগ্রতায় পর্যবেক্ষণ করলে তা ক্রমে দূরীভূত হয়। আবার যোগী কোন কোন সময় স্বচক্ষে দেখার ন্যায় নানা প্রতিবিম্ব বা প্রতিমূর্তি দেখতে পান — যেমন বুদ্ধ যেন তাঁর অমিত দেহজ্যোতি নিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত, আকাশ মার্গে ভিক্ষুসঙ্ঘের শোভাযাত্রা, স্বর্গের দেবতা, প্যাগোডা (মন্দির), বুদ্ধমূর্তি, প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অরণ্য, পাহাড়-পর্বত, বাগান, সুরম্য অট্টালিকা ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। আবার ভগ্নদশা বাড়ি-ঘর গলিত পুতিগন্ধময় মৃতদেহ, কঙ্কাল, ঘর্মাক্ত দেহ, রক্তাক্ত দেহ, খণ্ড-বিখণ্ড দেহ, মানুষের নাড়িভুঁড়ি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কৃমিকীট এবং নরকের

১. এই অনুচ্ছেদের বর্ণিত — প্রত্যয় পরিগ্রহ জ্ঞান।

দুর্গত মূর্তি ইত্যাদি বীভৎস দৃশ্যও চোখের সামনে ভেসে উঠে। এগুলি নিবিষ্ট মনের সতেজ কল্পনা বই আর কিছু নয়। স্বপ্নে দেখা দৃশ্য সদৃশ এসব দৃশ্য যোগী উপভোগও করবেন না, ইহাতে ভয়ও পাবেন না। ভাবনার সময় মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত এই বিষয়গুলি বাস্তব নয়, তা নেহাৎ কল্পনা মাত্র। কিন্তু যে মন সেগুলি দেখে সেটাই বাস্তব। ষড়্-ইন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া বিষয় পরিষ্কার এবং বিশেষভাবে সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। সুতরাং পঞ্চ-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় বা সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ জনিত যে সকল চিন্তা-ক্রিয়ার উদয় হয়, সেগুলির প্রতি সম্যক মনঃসংযোগ করা প্রয়োজন। মনে যে কোন বিষয়ের উদয় হোক না কেন তা সবই দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত যোগীকে ‘দেখছি, দেখছি’ রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ভাবনার প্রাথমিক অবস্থায় অন্ততঃ পাঁচ থেকে দশ-বার বার বার পর্যবেক্ষণ করলে ধীরে ধীরে সেসব দৃশ্য বিলীন হয়ে যায়। প্রজ্ঞাস্কুরণের সঙ্গে সঙ্গে এসব দৃশ্য কয়েকবার মাত্র পর্যবেক্ষণেই মিলিয়ে যাবে। যদি যোগী এ সকল দৃশ্য মনোযোগ সহকারে দেখেন বা ভীত হয়ে জোর করে মন থেকে তাড়াতে চান তবে এগুলি মিলিয়ে যেতে বিলম্ব হবে। আবার যদি কেহ ইচ্ছা করে একরূপ দৃশ্য মনে উৎপন্ন করেন তবে তা উপভোগ্য করে তোলার জন্য তার স্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভাবনাকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে যোগী এসকল বাহ্যিক বিষয়ের প্রবর্তন এবং চিন্তা থেকে বিরত থাকবেন। একরূপ চিন্তার উদয় হলে তৎক্ষণাৎ তা পর্যবেক্ষণ করে মন থেকে দূরীভূত করতে হবে। নিয়মিত ভাবনাকালে কোন কোন যোগীর নিকট একরূপ বিস্ময়কর দৃশ্যের উপস্থিতি বা অনুভূতি হয় না। তাই তাঁরা স্বভাবতঃ আলস্য অনুভব করতে পারেন। সেই আলস্য দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আলস্যকে এইভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন — ‘আলস্য, আলস্য।’ এই স্তরে আশ্চর্য দৃশ্য দর্শন বা অনুভূত হোক বা না হোক তাঁরা এসকল বিষয়ের আদি-মধ্য-অন্ত অবস্থা প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানতে পারেন। ভাবনা অনুশীলনের প্রাথমিক অবস্থায় যখন যোগী একটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন তখন অপর উৎপন্ন বিষয়েও পর্যবেক্ষণ করতে হয়, কিন্তু তখন তিনি পূর্ব পর্যবেক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ধান (বিলয়) সহজে জানতে পারেন না। ভাবনার উন্নত অবস্থায় বিষয়ের অন্তর্ধানের পর অপর নূতন বিষয়ের উৎপত্তি জানতে পারেন। এভাবে যোগীদের পর্যবেক্ষণশীল বিষয়ের আদি-মধ্য-অন্ত্য অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। এই অবস্থায় যোগী যখন অনুশীলনে দক্ষতা ও উন্নতি লাভ করেন তখন তিনি উপলব্ধি করেন: প্রত্যেক পর্যবেক্ষণ কার্য সম্পাদন কালে এক একটি বিষয় হঠাৎ উৎপন্ন হয় ও পরক্ষণেই বিলীন হয়। তখন তাঁর নির্মল উপলব্ধির দ্বারা বিচার

এরূপ করতে পারেন : সকল বিষয়েরই অন্তর্ধান হয়, লয় ঘটে। কিছুই নিত্য নয়, সবই নশ্বর। তাঁর এই বিচার ত্রিপিটকের অর্থ কথায় বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ : ‘সব কিছুই অনিত্য, কারণ সব কিছুই উৎপত্তির পর ধ্বংস হয়, অন্তর্ধান ঘটে।’ তিনি আরও বিচার করেন : ‘অবিদ্যার (অজ্ঞতার) বিদ্যমানতায় আমরা জীবন উপভোগ করি। বাস্তবিক পক্ষে উপভোগ করার কিছুই নেই। উৎপত্তি এবং বিলয় একই ধারায় চলছে, সে কারণে আমরা ক্রমাগত দুঃখ ভোগ করছি। যে কোন মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর কবলে পরতে পারি। সকল বস্তু নিশ্চিতরূপে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। এই সার্বিক অনিত্যতা সত্যই ভীতিপ্রদ এবং ভয়ঙ্কর। ত্রিপিটকের অর্থ কথায় এরূপ বর্ণিত হয়েছে-‘যা অনিত্য তা দুঃখপ্রদ, দুঃখপ্রদ বলেই ভয়ঙ্কর, উৎপত্তি-বিলয়শীল বলেই দুঃখপ্রদ।’ আবার তীব্র দুঃখানুভূতিকে এভাবে তিনি বিচার করেন : ‘সব কিছুই দুঃখজনক, সবকিছুই মন্দ।’ এই বিচারও অর্থ কথায় বর্ণিত উক্তির সমর্থন করেন : ‘তিনি দুঃখকে বড়শির হকের ন্যায় দেখেন, গণ্ডের (ফোঁড়া) ন্যায় ভাবেন এবং তীক্ষ্ণ বর্শা ফলকের ন্যায় মনে করেন।’ তিনি আরও বিচার করেন : ‘ইহা (দেহ-মন) দুঃখপুঞ্জ, এই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। উৎপত্তি-বিলয় অর্থহীন। কেহ এ নিরন্তর ধারা রোধ করতে পারেন না, তা মনুষ্য শক্তির সাধ্যাতীত। ইহা প্রাকৃতিক নিয়মেই চলে। এই বিচারও অর্থ কথার নিম্ন উক্তির সঙ্গে মিল দেখা যায় : ‘যাহা দুঃখজনক তা অনাত্মা। সারহীন বলে অনাত্মা বলা যায়। তাছাড়া এর উপর কোন মনুষ্য শক্তি প্রয়োগ করা চলে না।’ যোগী এ সকল বিচার সময়ে সতত পর্যবেক্ষণ করবেন এবং নিয়মিত (উদরের উঠানামায়) ভাবনা করে যাবেন।

এই তিন (প্রকৃতি নির্দেশক) বিশেষ লক্ষণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে দর্শন করে যোগী প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের অনুমতির দ্বারা ধারণা করেন : ‘সর্ববস্তুই (অপ্রত্যক্ষীভূত বস্তুসকলও) অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম।’

যে সকল বিষয়ের এখনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়নি, সে সম্বন্ধে তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করেন : ‘যে সকল বিষয় বা বস্তু একইভাবে উৎপন্ন হয় তা সবই অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।’ তাঁর বর্তমান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি এরূপ অনুমান করেন। যে ব্যক্তি গভীর চিন্তাশীল নন বা যাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ তিনি মনঃসংযোগে (বিষয়) বিচার করেন না, শুধুমাত্র চিন্তাপথে আগত বিষয়গুলি প্রত্যবেক্ষণ করে যান। তাঁর ধারণা পূর্ব বর্ণিত ধারণার ন্যায় স্পষ্ট হয় না। এরূপ ধারণার উদ্ভব হয় সেই যোগীর যিনি চিন্তাপথে উদিত বিষয় বিচার করেন। এমনও হয় প্রতি পর্যবেক্ষণ কার্যেই তাঁর এরূপ (ত্রিলক্ষণ যুক্ত) বিচার উৎপন্ন হয়। এরূপ বিচার প্রজ্ঞা লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই স্তরে যদিও কোন বিচার উপস্থিত হয় না, তৎসত্ত্বেও

সাধানার উন্নততর স্তরে এরূপ ত্রিলক্ষণ জ্ঞান অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। সুতরাং বিচারের উপর মনঃসংযোগ না করাই উচিত। কেবল বিষয় প্রত্যবেক্ষণে মনঃসংযোগ কালে যোগীর নিকট বিচার উৎপন্ন হলে সে বিচারমূলক চিন্তাকে পর্যবেক্ষণ করতেই হবে (পর্যবেক্ষণ দ্বারা ছাড়াতে হবে।)। তিনি যেন বিচারের মধ্যে অবস্থান না করেন' (আবদ্ধ হয়ে না পরেন)।

তারপর যোগী ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম) আর বিচার করেন না, তখন তিনি কায়িক ও মানসিক বিষয়গুলি যা প্রতিনিয়ত উৎপন্ন হয় তা অনুধাবন করে থাকেন। সেই মুহূর্তে যখন যোগীর মানসিক পঞ্চবল যথা শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাদের সমতা সাধন হয় তখন পর্যবেক্ষণরূপ মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। শ্বাস গ্রহণের মুহূর্তে উদরের উত্থান যেন দ্রুত ক্রম পর্যায়ে প্রতিভাত হচ্ছে এবং পতনও অনুরূপ দ্রুত অনুভূত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এদিক ওদিক নড়াচড়া করার সময়ও যেন তা ক্রম পর্যায়ে দ্রুততর হয়। সামান্য পরিবর্তনও সর্বদেহে বিস্তার হয়েছে বলে অনুমিত হয়। বহুক্ষেত্রে হুলফুটান অনুভূতি এবং চুলকানি ইত্যাদি অস্বস্তিকর অনুভূতিও ক্ষণেকের জন্য ক্রম পর্যায়ে দ্রুত উৎপন্ন হয়। মোটের উপর এ সকল অনুভূতি অসহ্য মনে হয়। সেই দ্রুত উৎপন্ন বহু অনুভূতির পর্যায়ক্রম রক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করা যোগীর পক্ষে সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় (বিষয়ে) মনঃসংযোগে সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এই স্তরে পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা না করে সাধারণভাবে করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে যোগীর প্রত্যেক অনুভূতিকে বিশেষ 'নামে' জানতে ইচ্ছা না করে সমষ্টিগত নামে (অর্থে) ধারণা করাই সমীচীন। যদি কেহ বিস্তারিতভাবে (অনুভূতিগুলি) অনুসরণ করার চেষ্টা করেন তবে তিনি শীঘ্র ক্লান্ত হয়ে পরবেন। এখানে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হল : যা পর্যবেক্ষণ করবেন তা পরিষ্কারভাবে করুন এবং যা উৎপন্ন হচ্ছে তা পরিষ্কারভাবে জানুন। এই স্তরে নিয়মিত ভাবনা কালে কোন নির্বাচিত বিষয় (বা নিমিত্তের) উপর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রীভূত না করে ষড়্-ইন্দ্রিয় দ্বারে উপস্থিত বিষয়ে মনঃসংযোগ করে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। যখন যোগী এরূপ পর্যবেক্ষণে উৎসাহী নন তখন তিনি নিয়মিত উদরের উঠা-নামা ভাবনায় মনোনিবেশ করবেন।

কায়িক এবং মানসিক কার্য প্রক্রিয়ার গতি চোখের পলক বা বিদ্যুৎ গতির চেয়েও দ্রুততর। তৎসত্ত্বেও যদি যোগী সহজভাবে এসকল কার্যপ্রক্রিয়া অনুধাবন করতে

১. এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় হল — সংমর্শন জ্ঞান। ভাবনা দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত ত্রিলক্ষণ জ্ঞান।

চান তবে তিনি পরিপূর্ণভাবে কায়িক-মানসিক ঘটনাবলী যখন যা ঘটে তা ধারণা করতে সক্ষম হন। এ সময় স্মৃতিস্থাপন (স্মৃতি-উৎপাদন, নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ) অতি প্রবল হয়। ফলে স্মৃতিস্থাপন (কায়িক-মানসিক কার্য প্রক্রিয়া বা ঘটনাবলীর উৎপত্তির উপর) যেন নিরন্তর গতি প্রাপ্ত হয় বলে মনে হয়। এমনও মনে হয় বিষয় যেন স্মৃতির উপর নেমে আসে। যোগী তখন প্রত্যেকটি বিষয় পরিষ্কার এবং একক রূপে অনুধাবন করেন। যোগী তখন উপলব্ধি করতে পারেন : কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়ার গতি বাস্তবিকই অতি দ্রুত, তথাপি সে সকল কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ বা অনুধাবন করা যায়। সম্ভবত: আর অজ্ঞাত কিছু নেই। যা কিছু জ্ঞাতব্য তা জানা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন 'ইতিপূর্বে যা স্বপ্নেও ভাবেননি তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হলেন।'

আবার বিদর্শন ভাবনা চর্যার ফলে যোগীর নিকট এক উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত হয়। রোমাঞ্চ, অশ্রুপাত, শরীরে শিহরণসহ যোগীর মনে প্রশান্তি উৎপন্ন হয়, ইহা তাঁর দেহে এক প্রকার পুলক বা প্রফুল্লতা সঞ্চাচার করে। তিনি অনুভব করেন যেন তাঁর দেহ দুলছে। তিনি আশ্চর্যাব্বিত হয়ে ভাবেন — 'আমি কি কোন মানসিক অস্থিরতায় ভুগছি?' তারপর তাঁর চিত্ত প্রশান্ত হয়, তৎসঙ্গে মানসিক ক্ষিপ্ততা ইত্যাদিও। যোগী তখন আসীন, শায়িত, দাঁড়ান এবং গমনকালে চিত্ত-প্রশুদ্ধি বা প্রকৃত চিত্ত-প্রশান্তি অনুভব করে থাকেন। দেহ-মন তখন দ্রুত কর্মতৎপর (চিত্ত-কর্মণ্যতা লাভ) হয়; যে কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ সমর্থ হয় (চিত্ত মৃদুতা লাভ হয়); তখন ইচ্ছা করলে যে কোন বিষয়ে দীর্ঘসময় মনঃসংযোগ করতে পারেন। যোগী তখন শরীরের আড়ষ্টতা, উষ্ণতা (গরম বোধ) এবং বেদনামুক্ত হন। বিদর্শন জ্ঞান পর্যবেক্ষণীয় বিষয়ে সহজেই প্রবেশ করে (চিত্ত লঘুতা লাভ হয়)। মন বলিষ্ঠ এবং নিপুণ হয় (চিত্ত-প্রগুণতা লাভ হয়)। তিনি তখন সকলপ্রকার অকুশল বর্জনে সচেষ্ট হন (চিত্ত-ঋজুতা লাভ হয়)। গভীর শ্রদ্ধা বশত: মন প্রভাস্বর হয়। কোন সময়ে যদি যোগীর মন দীর্ঘসময় প্রশান্ত থাকে, তাঁর মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয় : 'সত্য সত্যই বুদ্ধ সর্বজ্ঞ।' প্রকৃতপক্ষে দেহ-মন কার্যপ্রক্রিয়া অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম। যখন ভাবনারত হয়ে যোগী বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন তখন তিনি এই ত্রিলক্ষণ নির্মলভাবে প্রত্যক্ষ করেন। বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করার জন্য অন্যকে উপদেশ দেওয়ার তাঁর অদম্য স্পৃহা হয়। তন্দ্রা ও আলস্য বর্জিত হয়ে তাঁর বীর্য (ভাবনায় নিরবচ্ছিন্ন চিন্তরক্ষণ শক্তি) শিথিল বা তীব্র হয় না। তাঁর নিকট জ্ঞানসম্প্রযুক্ত সমতা (উপেক্ষা) উৎপন্ন হয়। তাঁর সুখানুভূতি পূর্বাপেক্ষা বিপুলতর হয়। সুতরাং তাঁর এই সুখানুভূতির কথা অন্যের নিকট জ্ঞাত করতে প্রবল ইচ্ছা হয়। তিনি সূক্ষ্ম প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হন এবং বিদর্শন সম্প্রযুক্ত উজ্জ্বল আলোকে একাগ্রতা

এবং প্রশান্তি অনুভব করেন। তিনি তখন মনে করেন : ‘ইহা বুঝি আমার ভাবনা প্রসূত প্রশান্তি।’

ভাবনারত যোগীর উপরোক্ত বিষয় নিয়ে বিচার করার কোন প্রয়োজন নেই। যখন যে বিষয় উৎপন্ন হয় তখন সে বিষয় পর্যবেক্ষণ করে যাওয়াই তাঁর কাজ। অর্থাৎ উজ্জ্বল আলো, শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রশান্তি, শান্তি, সুখানুভূতি ইত্যাদি’ পর্যবেক্ষণ করা। যখন আলোক-উজ্জ্বলতা দর্শন হয় তখন — ‘উজ্জ্বল-উজ্জ্বল’, ‘আলো, আলো’ এবং তৎপর ‘রোমাঞ্চ-রোমাঞ্চ’, ‘প্রশান্তি-প্রশান্তি’, ‘শান্তি-শান্তি’, ‘সুখ-সুখ’ (যখন যা উদয় হয় তখন তা ধারণা করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে) যতক্ষণ না তা অন্তর্হিত হয় বা মিলিয়ে যায়। যখন উজ্জ্বল আলোক উপস্থিত হয়, প্রথমে দিকে যোগী আলোক দেখার আনন্দে নিমগ্ন হয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতে ভুলে যান। যদিও যোগী স্মৃতিস্থাপন পূর্বক আলোক পর্যবেক্ষণ করতে সচেষ্ট হন তবুও প্রশান্তি এবং সুখানুভূতির মিশ্রণ তা (আলোক) দীর্ঘসময় থেকে যায়। তৎসত্ত্বেও পরবর্তীকালে যোগী (আলোক উৎপত্তি রূপ) আশ্চর্য ঘটনার পর্যবেক্ষণ কার্য চালাতে সক্ষম হন এবং যতক্ষণ তা মিলিয়ে না যায় (বা দৃষ্টি বহির্ভূত না হয়) ততক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। কোন কোন সময় এই আলোক এত উজ্জ্বলতর হয় যে যোগী একমাত্র পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োগে তা বিলীন করতে সমর্থ হন না। তখন যোগীর কর্তব্য হবে আলোর প্রতি মনোনিবেশ না করা এবং বীর্য সহকারে দেহে অন্যান্য উৎপন্ন বিষয়ের প্রতি পর্যবেক্ষণ নীতি প্রয়োগ করা। আলোক এখনও বিদ্যমান আছে কিনা তা নিয়ে যোগী কখনও চিন্তা করবেন না। এরূপ চিন্তা করলে তিনি পুনরায় আলোকই দেখবেন। এরূপ চিন্তা করলে তিনি পুনরায় আলোকই দেখবেন। এরূপ চিন্তার উদয় হলে তিনি তা ত্যাগ করবেন এবং দৃঢ়তা সহকারে সেই চিন্তার মধ্যেই ‘চিন্তা-চিন্তা’ ধারণা করে মনোনিবেশ স্থাপন করবেন। ভাবনায় গভীর একাগ্রতা আসলে উজ্জ্বল আলোক ছাড়া অন্য আরও বহু আশ্চর্য বিষয় উৎপন্ন হয় এবং তা বহুক্ষণের জন্য স্থিত থাকে যদি যোগী সেই আকর্ষণের একটি বা প্রত্যেকটিতে তাঁর মনোযোগ স্থাপনের ইচ্ছা করেন। যদি এরূপ ইচ্ছা হয় তবে যোগী সেই ইচ্ছাকে পর্যবেক্ষণে করবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন একটি বিষয়ের বা অন্য বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত না হলেও অস্পষ্ট নিমিত্ত (বিষয়) একটির পর একটি ট্রেনের কামরার (বগির) ন্যায়

১. নবীন [দুর্বল] উদয়-ব্যয় জ্ঞান লাভে এ সকল অন্তরায়কর ধর্ম উৎপন্ন হয়। তখন যোগী মনে করেন তিনি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছেন, — এটা তাঁর ভ্রম।

সারিবদ্ধভাবে উদয় হয়। তখন এ সকল দৃষ্ট দৃশ্য একরূপে যথায়থভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন : ‘দেখছি, দেখছি’। একরূপ পর্যবেক্ষণ তা বিলীন হয়ে যাবে। যখন যোগীর ভাবনা দুর্বল হয় তখন এ সকল বিষয় অত্যন্ত প্রকট হয়। এসব দৃশ্যাবলীর প্রত্যেকটি বিলীন না হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

যোগীকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে উজ্জ্বল আলোক ইত্যাদির প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা এবং সেগুলির মধ্যে আবদ্ধ থাকা উভয়ই ভাবনার মিথ্যামার্গ। সেগুলির সংশোধনীয় প্রতিপক্ষ যা প্রজ্ঞা দর্শনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন তা হল : বিষয়গুলি বিলীন না হওয়া পর্যন্ত নিরপেক্ষভাবে মনঃসংযোগে তা পর্যবেক্ষণ করা।^১ যোগী যখন দেহ-মন বিষয়ে স্মৃতি স্থাপনে নিরত থাকেন তখন তাঁর প্রজ্ঞা নির্মল হয়। তিনি তখন কায়িক-মানসিক কার্য প্রক্রিয়ার উত্থান এবং বিলয় পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করেন। তিনি জানতে পারেন : যে বিষয় যে স্থানে উৎপন্ন হয় ঠিক সেই স্থানেই তার অন্তর্ধান হয়। তিনি সম্যকভাবে জ্ঞাত হন : পূর্ববর্তী ঘটনা এক বিষয় এবং পরবর্তী ঘটনা অন্য বিষয়। সুতরাং প্রত্যেক পর্যবেক্ষণ ক্ষণে তিনি বিষয়ের ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম) হৃদয়ঙ্গম করেন। একরূপ ভাবনানুশীলনে দীর্ঘদিন থাকার ফলে তাঁর একরূপ বিশ্বাস জন্মে : ‘ইহা সর্বাপেক্ষা উত্তম যে ইহাতে অধিরোহণ করা যায়। ইহার চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।’ তিনি ভাবনা অগ্রসরতায় এত তৃপ্ত হন যে তখন তাঁর বিশ্রাম ও বিরতির ইচ্ছা জাগে। এ অবস্থায় ভাবনানুশীলন থেকে বিরত হওয়া অনুচিত। উপরন্তু এ সময়ে কায়িক-মানসিক কার্য প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে যোগীর আরও অধিক সময় (যত দিন বা ঘণ্টা দরকার) অবিরত ভাবনানুশীলন চর্যা করে যেতে হবে।^২

ভাবনা অনুশীলনে উন্মত্তির সঙ্গে সঙ্গে যখন জ্ঞান আরও পরিপক্ব হয় তখন বিষয়ের উত্থান (উৎপত্তি) তাঁর নিকট আর তেমন স্পষ্ট নয় বরঞ্চ বিলুপ্তিই পরিষ্কার রূপে প্রতিভাত হয়। বিষয়গুলি অতি ক্ষিপ্র গতিতে বিলুপ্ত হয়। উদাহরণ : যখন উদরের উত্থানগতি পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন সেই উত্থানগতিও অন্তর্হিত হয়। অনুরূপভাবে মানসিক কার্য প্রক্রিয়া অর্থাৎ সেই উত্থান গতির পর্যবেক্ষণ জ্ঞানও অন্তর্হিত হয়। যোগীর নিকট ইহা পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে উত্থানগতি এবং উত্থানগতির পর্যবেক্ষণ জ্ঞানও তখন পর পর অন্তর্হিত হয়। উদরের পতনগতি, আসন পরিবর্তন, হাত-পা প্রসারণ ও সঙ্কোচন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনুরূপ (অর্থাৎ গতি এবং গতি পর্যবেক্ষণ-জ্ঞানের) অন্তর্ধান হৃদয়ঙ্গম

১. ইহা মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি।

২. পূর্ণ উদয়-ব্যয় জ্ঞান এ অনুচ্ছেদ প্রকাশ করে।

হয়। কোন বিষয় পর্যবেক্ষণ এবং বিষয়ের অন্তর্ধান অনুবোধ-ক্রম দ্রুত পর্যায়ে সংঘটিত হয়। কোন কোন যোগী তিন পর্যায়ে পরিষ্কারভাবে তা অনুরোধ (উপলব্ধি) করেন : যথা বিষয় পর্যবেক্ষণ, ইহার অন্তর্ধান ও বিলুপ্তি পর্যবেক্ষণ জ্ঞানের অন্তর্ধান ক্রম দ্রুত পর্যায়ে অনুবোধ করেন। মোটের উপর বিষয়ের অন্তর্ধান (বিলুপ্তি) এবং বিষয়ের পর্যবেক্ষণ জ্ঞানের বিলুপ্তি অর্থাৎ এই যুগ্ম বিলুপ্তি জ্ঞাত হওয়াই যোগীর পক্ষে যথেষ্ট।

যখন যোগী অনায়াসে যুগ্ম বিলুপ্তি দর্শন সমর্থ হন তখন বিশেষ অবয়ব যথা দেহ, মাথা, হাত, পা প্রভৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠে না, যেন প্রত্যেক বিষয় বা বস্তু ক্ষয় পাচ্ছে এবং বিলুপ্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় যোগীর মনে হয় তাঁর ভাবনায় আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না।

প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক নয়। মন সাধারণতঃ কোন বিশেষ অবয়বের দৃশ্যে বিচরণ করে আনন্দ পেতে চায়। মনে সেরূপ কিছুই অনুপস্থিতিতে মন সন্তুষ্টি-শূন্যতা অনুভব করে। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই প্রজ্ঞা-ভাবনা প্রগতির অভিব্যক্তি। প্রথমতঃ অবয়বই পরিষ্কার রূপে পর্যবেক্ষণ হত, ভাবনায় অগ্রগতির ফলে এখন তাদের (অবয়ব) বিলুপ্তি (ক্ষয়) পর্যবেক্ষণ প্রকট হচ্ছে। শুধুমাত্র ভাবনায় অবয়বগুলি পুনরুৎপন্ন হয় এবং যদি তা পর্যবেক্ষণ করা না হয় তবে বিলুপ্তির পর তার পুনরাবির্ভাব হয় এবং থেকে যায়। সুতরাং যোগী জ্ঞানীদের উচ্চারিত সত্য জ্ঞাত হন : ‘যখন কোন নাম বা উপাধি উৎপন্ন হয় তখন প্রকৃত সত্য আবৃত থাকে এবং যখন সত্যের প্রকাশ হয় তখন নাম বা উপাধি বিলুপ্ত হয়।’

যখন যোগী বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তখন তাঁর মনে হতে পারে যেন তাঁর পর্যবেক্ষণ সুসংগত হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরিজ্ঞান এত দ্রুত এবং নির্মল যে তিনি তখন দুই বিষয় উৎপত্তি অবগতির মাঝখানে ক্ষণিক যে তিনি তখন দুই বিষয় উৎপত্তি অবগতির মাঝখানে ক্ষণিক অবচেতনতাকেও জ্ঞাত হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় — যোগীর হাত নামাবার বা বাড়াবার ইচ্ছা হয়েছে, তিনি যখন সেই ইচ্ছা পর্যবেক্ষণ করেন তা তখনই মিলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, ফলে তিনি কিছুক্ষণ হাত নামাতে পারেন না বা বাড়াতে পারেন না। এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাঁর মনঃসংযোগ শরীরের কোন এক ইন্দ্রিয় দ্বারের ঘটনার দিকে পরিবর্তন করে ভাবনা করতে হবে।

যদি যোগী ভাবনা সর্বশরীরে ব্যাপ্ত করেন এবং যথাবিধি উদরের উঠানামা পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন তবে তিনি শীঘ্রই (ভাবনায়) ভরবেগ (গতিবেগ) লাভ করবেন এবং

তখন তিনি ‘তাকাচ্ছি — স্পর্শ হচ্ছে — জানছি’, অথবা ‘দেখছি — জানছি’ অথবা ‘জানছি অথবা শুনছি — জানছি’ ইত্যাদি যখন যা ঘটে তা নিয়ে ভাবনা বর্ধন করবেন। এরূপ অনুশীলনকালে যদি যোগী অনুভব করেন যে তিনি অশান্ত বা ক্লান্ত হয়েছেন তখন তিনি উদরের উঠানামায় মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে করতে ভাবনা করবেন। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি ভাবনায় ভরবেগ লাভ করবেন তখন সর্বদেহে যখন যে বিষয় উৎপন্ন হয় তখন তাই পর্যবেক্ষণ করবেন।

যখন তিনি সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত বিষয়ে ভাবনা করতে অভ্যস্ত হন, সে সময় যদিও তিনি দৃঢ়ভাবে বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন না, তবুও তিনি জানেন তিনি যা শোনে তা মিলিয়ে যায়, যা দেখেন তা অদৃশ্য হয়ে যায় (ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়), উভয়ের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা থাকে না। এরূপ দর্শনই যথাভূত দর্শন। কোন কোন যোগী কি ঘটছে তা পরিষ্কারভাবে দেখেন না। কারণ অন্তর্ধান (বিলুপ্তি) তড়িৎ গতির ন্যায় এত দ্রুত হয় যে তখন তাঁরা মনে করেন তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতর হচ্ছে অথবা তাঁরা অস্থিরতায় ভুগছেন। কিন্তু তা সত্য নয়। তাঁদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রখর নয় বলে পূর্বাপর কি ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হন না; ফলে তাঁরা বিষয়ের অবয়ব, আকার (রূপ) দর্শন করেন না। এ সময় তাঁদের পর্যবেক্ষণ এবং ভাবনায় বিরতি দরকার। কিন্তু যে কায়িক এবং মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া তাঁদের নিকট উৎপন্ন হয় চিন্তা স্বভাবতই সেই প্রক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। যোগী ঘুমিয়ে পরবেন স্থির করেন কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েন না, তৎসত্ত্বেও তিনি ভাবনাক্ষম ও সতর্ক থাকেন। তিনি কিন্তু ঘুম-বিরতির জন্য মনক্ষুণ্ণ হবেন না কারণ তিনি তাতে অসুস্থতা বোধ করবেন না বা অবসন্ন হবেন না। তখন তাঁর বীর্য সহকারে বিষয় পর্যবেক্ষণ ক্রিয়ায় রত থাকা উচিত এবং তিনি তখন বুঝতে পারেন তাঁর মন বিষয়গুলিকে পরিপূর্ণ এবং পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ বা অনুধাবন করতে সক্ষম।

বিষয়ের ভঙ্গুরতা এবং সে সঙ্গে সেই চিন্তার বিলীনতা, এই উভয়কে নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ কাজে নিমগ্ন থাকাকালীন যোগী বিচার করেন : ‘সকল বিষয়ই ক্ষণস্থায়ী, এমন কি চোখের পলক পরা বা এক ঝলক বিদ্যুৎ গতির সময় পর্যন্তও কোন কিছু স্থায়ী হয় না। যোগী পূর্বে এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করেননি। ইহা যেমন পূর্বে অন্তর্হিত হয়েছে, বিলুপ্ত হয়েছে (ধ্বংস বা ভেঙ্গে গেছে) সেরূপ ভবিষ্যতেও হবে।’ এ

বিচারকেও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ছাড়াও ভাবনায় নিমগ্ন থাকাকালে যোগীর মনে ভয় হয়েছে বলে অবগত হবেন। তখন তিনি বিচার করেন : ‘সত্য কি, তা না জেনে মানুষ জীবন উপভোগ করে। এখন প্রকৃত সত্য অবিচ্ছিন্ন ভঙ্গুরতা জ্ঞাত হলাম। ইহা সত্যই ভীতিজনক। ভঙ্গুরতার প্রতি মুহূর্তে মানুষ মৃত্যুবরণ করতে পারে। এই জীবনের আদিও ভয়সঙ্কুল। জীবনের বার বার উৎপত্তিও (পুনর্জন্ম) ভীতিব্যঞ্জক। ইহা চিন্তা করতেও ভয়ের সঞ্চার হয় যে বাস্তবহীন অবয়ব এবং আকারের (রূপ বা জড়ের) উৎপত্তিকে সত্য মনে হয়। পরম সুখ এবং চির শান্তি লাভের নিমিত্ত নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক বিষয়গুলিকে স্তব্ধ (রোধ) করা প্রয়োজন। পুনর্জন্মই ভীতিপ্রদায়ক, কারণ পুনর্জন্মের অর্থ হল : ষড়-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়গুলি যা নিয়ত উৎপন্ন হচ্ছে আর বিলয় হচ্ছে (নিয়ত পরিবর্তনশীল) সেই উদয়-বিলয় স্বভাবধর্মী বিষয়গুলিকে পুনরাবর্তনের (পুনরুৎপত্তির) প্রশ্রয় দেওয়া। বার্ষিক্য, মৃত্যু দুঃখভোগ, বিলাপ, দুঃখ বেদনা, শোক, হতাশা (নৈরাশ্য) সবই ত শঙ্কাজনক’। এ সকল বিচার তৎক্ষণাৎ পর্যবেক্ষণ করে ত্যাগ করতে হবে।

তখন যোগী অনুভব করেন কোনো কিছুই নির্ভরশীল নয়। তাই তিনি দেহ-মনে দুর্বলতা অনুভব করেন ও ভগ্নোৎসাহে ম্রিয়মান হন। তিনি তখন উৎফুল্ল এবং প্রাণবন্ত থাকেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁর হতাশ হওয়ার কারণ নেই। কেননা তাঁর এই অবস্থা বিদর্শন ভাবনায় প্রজ্ঞা লাভের পক্ষে অগ্রসরতা (বা পদক্ষেপ)। ইহা ভীতি জ্ঞাপক অনুভূতিতে অসুখী হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি তাঁর এই বিচার-‘অসুখী, অসুখী’ রূপে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যে বিষয় যখন তাঁর নিকট উৎপন্ন হয় তখন তা পর্যবেক্ষণ করে ভাবনা করবেন। এতে তাঁর অসুখী ভাব কেটে যাবে। যদি তিনি কিছু সময়ের জন্য ভাবনা পরানুখ হন তবে তাঁর মনে অনুশোচনা আসবে এবং ভয় তাঁকে পরাভূত করবে। প্রজ্ঞার সঙ্গে এ প্রকার ভয়ের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং যোগী বীর্য প্রয়োগে ভাবনার মাধ্যমে এরূপ ভয়কে জয় করবেন।^২

আবার বিষয় পর্যবেক্ষণের মধ্যে যোগী এ প্রকার দোষ দেখবেন — ‘এই কায়িক এবং মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া অনিত্য তাই নিরানন্দময়। জন্মগ্রহণ করে ভাল হয়নি, জীবনাবর্তন (জন্মাবর্তন) প্রচলিত রাখা উচিত নয়। বিষয়ের (বস্তু ও জীবের)

১. ইহা ভয়জ্ঞান

২. ইহা আদীনব (দোষ) জ্ঞান।

অবয়ব এবং আকারের তথাকথিত আবির্ভাব আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃত মনে হলেও ইহা হতাশাব্যঞ্জক এবং বাস্তব সম্মত নয়। এর মধ্যে সুখ-শান্তির অন্বেষণ বৃথা। জন্মগ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়। বার্ষক্য, মৃত্যু, বিলাপ, দুঃখ, শোক এবং হতাশা প্রভৃতি হৃদয় বিদারক ও ভীতিজনক^১। এ সকল বিচারককেও পূর্বরূপে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

তখন যোগী দেহ-মন রূপ বিষয়কে এবং বিষয় পর্যবেক্ষণকারী চিত্তকে স্থূল, নীচ এবং অর্থহীন মনে করেন। এসবের উত্থান এবং পতন দেখে তাদের প্রতি বিরক্ত হন। তিনি তাঁর দেহকেও ভঙ্গুর এবং পচনশীল দেখেন এবং তিনি ইহাকে (দেহকে) ক্ষণ ভঙ্গুর মনে করেন।

এই স্তরে যোগী যখন দেহ-মনের কার্যপ্রক্রিয়ার (বিষয়ের) উৎপত্তি পর্যবেক্ষণ করেন তখন তিনি তাঁর প্রতি অনাসক্ত হন। যদিও তিনি সুন্দরভাবে বিষয়ের বিলুপ্তি ক্রম-পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ রত তবুও তিনি যেন আর তেমন সতর্ক ও সজীব নন। তাঁর ভাবনা যেন নৈরাশ্য মিশ্রিত। সুতরাং তিনি ভাবনা কার্যে আলস্য পরায়ণ হন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তিনি ভাবনা চর্চায় মনোনিবেশ না করে ক্ষান্ত পারেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় :- কোন ব্যক্তি কদমাক্ত ও নোংরা পথ অতিক্রমকালে তিক্ত বিরক্ত হয়ে যেমন মাঝপথে তাঁর গমন বিরতি করতে পারেন না; পথ অতিক্রম করার জন্য চলাতে থাকেন। উক্ত যোগীর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অবস্থা হয়। তাঁর ভাবনা ব্যতীত অন্য কিছু করার উপায় থাকে না। এই সময়ে তিনি দেখেন : — এই মনুষ্যভূমি (পৃথিবী) বিলয়শীল ক্রিয়াযুক্ত, তাই তাঁর মানুষ অথবা নারী বা পুরুষ, রাজা বা ধনী হয়ে জন্মগ্রহণেও অনীহা জন্মে। দেব-ব্রহ্মভূমির প্রতিও তাঁর অনুরূপ মানসিকতা প্রকাশ পায়।^১

এরূপ জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি তখন প্রত্যেক প্রত্যক্ষীভূত সর্ব সংস্কারের (নাম-রূপ-বা মন ও দেহের) প্রতি হতাশামণ্ডিত হন এবং তাঁর নিকট সর্ব সংস্কার পরিত্যাগ করা এবং তার (বন্ধন) থেকে মুক্তির (বা উদ্ধার) প্রত্যাশা^২ জন্মে। দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শ-বিচার-দাঁড়ান-উপবেশন-শয়ন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ কর্ম থেকেও মুক্তি কামনা করেন। যোগীকে এরূপ ইচ্ছা বা কামনাও পর্যবেক্ষণ কর্ম থেকেও মুক্তি কামনা করেন। যোগীকে এরূপ ইচ্ছা বা কামনাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

তিনি এখন কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া থেকেও বিমুক্তি কামনা করেন। তখন তিনি এরূপ বিচার করেন : ‘আমি যতবার ইহা পর্যবেক্ষণ করি প্রত্যেকবার তার পুনরাবর্তন দেখি। ইহা অত্যন্ত গর্হিত (অবাঞ্ছনীয়) বিষয়। আমার এসব পর্যবেক্ষণ বন্ধ করা উচিত।’ যোগীর এসব বিচারকেও পর্যবেক্ষণ করা উচিত। যদি কোন যোগী উক্তরূপ বিচার করে সংস্কারের (নাম-রূপের কার্য প্রক্রিয়ার) পর্যবেক্ষণ বন্ধ করেন, তবুও সংস্কার উৎপত্তি বন্ধ হয় না। যথা উঠা-নামা-নমিত হওয়া-বাড়ান-ইচ্ছা করা ইত্যাদি বরাবর চলতেই থাকে। নির্দিষ্ট বিশেষ সংস্কার পর্যবেক্ষণও চলতে থাকে। সুতরাং এরূপ বিচার করে তিনি তৃপ্ত হন : ‘যদিও আমি কায়িক-মানসিক কার্য প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ বন্ধ করেছি তবুও সংস্কারগুলি যথানিয়মে উৎপন্ন হচ্ছে। সেগুলি যে উৎপন্ন হচ্ছে সে জ্ঞানও অনায়াসে অনুভব হচ্ছে। সুতরাং শুধুমাত্র এগুলির পর্যবেক্ষণ বন্ধ করে তাদের থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। এভাবে এগুলিকে পরিত্যাগ করা যাবে না; সেগুলিকে (সংস্কার সমূহকে) যথারীতি পর্যবেক্ষণ করলে তবে জীবনের ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম) প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম হবে। তাই সংস্কারের প্রতি মনঃসংযোগ না করে (আমি) সংস্কারোপেক্ষা (সংস্কারের প্রতি উপেক্ষা, সংস্কার সমতা) জ্ঞান লাভ করব। এই সংস্কারের বিলয়ে (বিনাশে) নির্বাণ দর্শন হবে; পরম সুখ এবং শান্তির উদ্ভব হবে।’ তারপর সানন্দে যোগী উক্তরূপ বিচার করে সংস্কারের যথারীতি পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন। এই ক্ষেত্রে যে সকল যোগী অনুরূপ বিচার করতে অপারগ তাঁরা বিদর্শনাচার্যের উপদেশ শুনে পরিতুষ্ট হন।

এরপর পুনরায় ভাবনা আরম্ভ করলে তাঁর ভাবনা ভরবেগ (গতিবেগ) প্রাপ্ত হয় এবং সে সময়ে (কোন কোন ক্ষেত্রে) বহু দুঃখজনক অনুভূতির সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। ইহা সহজাত দৈহিক দুঃখপুঞ্জের বৈশিষ্ট্যের বহির্প্রকাশ মাত্র। অর্থ কথায় বলা হয়েছে : যোগী পঞ্চস্কন্ধকে দুঃখদ, রোগাতুর, ব্রণসদৃশ, অশুচিপুঞ্জ, ভীষণ দুর্দৈব, ক্লেশদায়ক রূপে দেখেন।’ যদি এরূপ দুঃখানুভূতির পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে তবে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মার চল্লিশ

১. ইহা নির্বেদ জ্ঞান (নির্বেদ)

২. ইহা মুক্তিকাম্যতা বা মুমুক্ষা জ্ঞান।

প্রকার বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটি^১ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক পর্যবেক্ষণে প্রকটিত হবে। যদিও যোগী সুন্দর রূপে পর্যবেক্ষণ করছেন তবুও মনে হবে পর্যবেক্ষণ সঠিক হচ্ছে না। বিষয় পর্যবেক্ষণ জ্ঞান (বা অনুবোধ) যেন সংযুক্ত নয়। ইহার কারণ হল (এ সমস্ত) তিনি খুব ব্যগ্রভাবে ত্রিলক্ষণ স্বভাব (বৈশিষ্ট্য) হৃদয়ঙ্গম করতে আগ্রহী। ভাবনায় সম্ভ্রষ্ট না হয়ে যোগী বার বার আসন পরিবর্তন করতে চাইবেন। আসীন অবস্থায় ভাবনা করবার সময় মনে হবে যেন চংক্রমণ ভাবনাই ভাল হবে। চংক্রমণ ভাবনাকালে উপবেশন করে ভাবনা করতে ইচ্ছা হবে। উপবেশন কালে বার বার হাত-পায়ের অবস্থান বদলাবেন। তিনি অন্যত্র যেতে চাইবেন বা শয্যা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করবেন। বার বার অবস্থানের পরিবর্তন সত্ত্বেও কোন এক বিশেষ অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। ফলে একটা অস্থিরতা দেখা যায়। এতেও হতাশ হবার কারণ নেই। এরূপ অবস্থার কারণ তিনি সংস্কারের সঠিক প্রকৃতি (স্বভাব) জ্ঞাত হয়েছেন এবং এখনও সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান লাভ করেননি। তাঁর ভাবনাচর্যা যথাযথরূপে হচ্ছে, তবুও তিনি অন্যথা মনে করেন। এ সময় তিনি এক প্রকার অবস্থায় — আসীন হোক বা শায়িত হোক, — থাকতে সচেষ্ট হবেন, কিছুক্ষণ পর তিনি সেই অবস্থায় আরাম বোধ করবেন। বীর্য সহকারে সংস্কারগুলি পর্যবেক্ষণ করলে ক্রমান্বয়ে তাঁর মন প্রশান্ত ও প্রফুল্ল হয়। অবশেষে তাঁর সকল অস্থিরতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত^২ হয়।

যখন সর্বসংস্কারের প্রতি সংস্কারোপেক্ষা^৩ জ্ঞান পরিপক্ক (পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত) হবে তখন তাঁর মন নির্মল হবে এবং তিনি সকল প্রকার সংস্কার স্পষ্টরূপে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হবেন। পর্যবেক্ষণ তখন যেন অনায়াসে চলতে থাকে। সূক্ষ্ম সংস্কারের পর্যবেক্ষণও বিনা অনায়াসে চলতে থাকে। অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মের প্রকৃত স্বভাবও বিনা বিচারে প্রকটিত হতে থাকে। দেহের যে কোন প্রকার অনুভূতি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি মনঃসংযোগ করতে পারেন। সেই স্পর্শানুভূতি যেন কার্পাস তুলার স্পর্শের ন্যায় অত্যন্ত কোমল। কোন কোন সময় সর্বশরীরে পর্যবেক্ষণীয় বিষয় এত অধিক পরিমাণে উপস্থিত হয় যে, পর্যবেক্ষণ কার্যকেও যেন দ্রুততর করতে হয় মনে হয় দেহ ও মন যেন উর্ধ্ব দিকে টানছে। পর্যবেক্ষণীয়

১. ১০ প্রকার অনিত্য, ২৫ প্রকার দুঃখ এবং ৫ প্রকার অনাত্ম বৈশিষ্ট্যের একটি।

২. প্রতিসংখ্যা বা পুনঃপর্যবেক্ষণ জ্ঞান।

বিষয় যখন কম থাকে তখন যোগী তা সহজ ও শান্তমনে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। কোন কোন সময় কায়িক সংস্কার (বিষয়) সম্পূর্ণরূপে অনুৎপন্ন থাকে। শুধুমাত্র মানসিক সংস্কারই থাকে। তখন যোগী চিন্তে এক অপার আনন্দ বা প্রশান্তি অনুভব করেন। তিনি এ সময় অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করতে পারে না। তাঁর এতে আনন্দাশঙ্ক্যও নেই। একরূপ আনন্দানুভূতিরও পর্যবেক্ষণ করা উচিত। উল্লাস, প্রশান্তি, উজ্জ্বল আলোক ইত্যাদিও পর্যবেক্ষণ করে বিদূরিত করতে হবে। পর্যবেক্ষণ যদি তা বিলীন না হয় তবে যোগী সেগুলিকে অগ্রাহ্য করবেন এবং অন্য উৎপত্তিশীল পর্যবেক্ষণ করবেন।

এই স্তরে যোগী এই জ্ঞান লাভে পরিতুষ্ট, যথা : ‘আমি, আমার, সে, তাহার বলতে কিছু নেই; শুধুমাত্র সংস্কার উৎপন্ন হয় — সংস্কার মাত্র, প্রত্যক্ষ করণীয় সংস্কার। তিনি উৎপন্ন বিষয় আনন্দের সঙ্গে একটার পর একটা প্রত্যক্ষ করে যান। অধিক সময়, পর্যবেক্ষণ করলেও ক্লান্তি বোধ করেন না। এখন তিনি দুঃখজনক অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং যে কোন অবস্থায় (বসে বা শুয়ে) ভাবনা করুন না কেন তিনি দীর্ঘ সময় ভাবনায় নিরত থাকতে পারেন। তিনি বসে বা শুয়ে দুই বা তিন ঘণ্টা পর্যন্ত কোন প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করে ক্লান্তি হীন অবস্থায় ভাবনায় রত থাকতে পারেন। অল্পক্ষণের জন্য ভাবনা করতে বসে দুই বা তিন ঘণ্টা ভাবনায় কাটিয়ে দেন এবং একই আসনে (আসীন বা শায়িত অবস্থা) পূর্বের ন্যায় স্থির থাকেন।

কোন কোন সময় সংস্কার অতি দ্রুত উৎপন্ন হয় এবং যোগী তা সম্যকরূপে পর্যবেক্ষণ করার সময় হয়তো তিনি এই ভেবে উদ্বিগ্ন হন — আমার কি ঘটবে! তাঁর এই উদ্বিগ্নতাকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। যদি তিনি মনে করেন তিনি ভালরূপে ভাবনা করছেন, তাও তাঁর পর্যবেক্ষণ করা উচিত। তিনি ভাবনার অগ্রগতির উপর লক্ষ্য রাখবেন। তাঁর এই প্রত্যাশা বা লক্ষ্যও পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। যাই ঘটুক না কেন সবই স্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। তিনি যেন পর্যবেক্ষণে কোন প্রচেষ্টা না করেন এবং শিথিলতাও প্রকাশ না করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যোগীর উদ্বিগ্ন, আনন্দ, প্রত্যাশা এবং অত্যাঙ্গুর কারণে পর্যবেক্ষণ শিথিল হয়, ফলে ভাবনায় পশ্চাৎপদ হন। যাঁরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার সময় নিকট হয়েছে মনে করে

আমার কি ঘটবে! তাঁর এই উদ্দিগ্নতাকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। যদি তিনি মনে করেন তিনি ভালরূপে ভাবনা করছেন, তাও তাঁর পর্যবেক্ষণ করা উচিত। তিনি ভাবনার অগ্রগতির উপর লক্ষ্য রাখবেন। তাঁর এই প্রত্যাশা বা লক্ষ্যও পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। যাই ঘটুক না কেন সবই স্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। তিনি যেন পর্যবেক্ষণে কোন প্রচেষ্টা না করেন এবং শিথিলতাও প্রকাশ না করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যোগীর উদ্বেগ, আনন্দ, প্রত্যাশা এবং অত্যাশঙ্কির কারণে পর্যবেক্ষণ শিথিল হয়, ফলে ভাবনায় পশ্চাৎপদ হন। যাঁরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার সময় নিকট হয়েছে মনে করে অত্যাশঙ্কি ভাবনা করেন তাঁদের পর্যবেক্ষণ শিথিল হয় এবং তাঁরা পশ্চাৎপদ হন। অস্থির মন সংস্কারে যথোপযুক্তভাবে মনঃসংযোগ করতে পারে না। সুতরাং পর্যবেক্ষণ কার্য যখন করা হয় তখন যোগীকে ধীর স্থিরভাবেই তা করতে হবে। অর্থাৎ যোগী তখন শিথিলও হবেন না, বিশেষ কোন প্রকার চেষ্টাও করবেন না। যদি যোগী-ধীর-স্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করে যান (অর্থাৎ শিথিল না হয়ে বিশেষ প্রচেষ্টা না করে এবং আনন্দ অত্যাশঙ্কি প্রত্যাশা বর্জন করে) তবে সর্বসংস্কার সমূহত (মুক্ত) প্রজ্ঞা দর্শন করবেন এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করবেন। কোন কোন যোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই স্তরে তাঁরা কয়েকবার জ্ঞান স্তরের উপরে উঠেন এবং আবার নিচে নেমে যান। এতে তাঁদের হতাশ হয়ে শিথিল হওয়া উচিত নয় বরঞ্চ তৎপরিবর্তে দৃঢ়বীর্য প্রকাশে (ধীর স্থির হয়ে) ভাবনা করা উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে ষড়্ ইন্দ্রিয়দ্বারে যখন যা উৎপন্ন হয় তখন তা পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া। মোটের উপর যখন পর্যবেক্ষণ সমভাবে এবং শান্ত ভাবে চলে তখন বিভিন্নভাবে ভাবনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই প্রকারে পর্যবেক্ষণ করে যেতে হবে যাতে ভাবনায় ভ্রবেগ উৎপন্ন হয় এবং যতক্ষণ না ভাবনা সমতা লাভ করে এবং শান্ত হয়।

ভাবনায় উন্নত যোগী যদি উদরের উঠানামা অথবা কায়িক বা মানসিক বিষয়ের প্রক্রিয়ার কোন একটি নিয়ে ভাবনা আরম্ভ করেন তিনি অনুভব করবেন ভাবনায় ভ্রবেগ (গতিবেগ) উৎপন্ন হয়েছে। তারপর পর্যবেক্ষণ যথারীতি অনায়াসে তার নিজ গতিতে সমতালে এবং শান্তভাবে হচ্ছে; তাঁর মনে হবে তিনি সংস্কারের উত্থান এবং পতন নিয়মিত স্পষ্টরূপে পর্যবেক্ষণ করছেন। এই অবস্থায় তাঁর মন সর্বতোভাবে সকল প্রকার ক্লেশ বা আবিলতা মুক্ত। যতই আনন্দ দায়ক এবং আকর্ষণীয় বিষয় হোক না কেন তাতে তাঁর কোন আনন্দ ও আকর্ষণ থাকে না। আবার বিষয় যতই বিকৃত বা বিসদৃশ হোক না কেন তাতেও তাঁর কোন কাতরতা বা উদ্বেগ বা বিদ্বেষ নেই তিনি স্বভাবত: শুধুমাত্র দেখেন, শোনেন, ঘ্রাণ নেন, স্বাদ গ্রহণ করেন, অনুভব করেন স্পর্শ করেন এবং জানেন বা ধারণা করেন।

ত্রিপিটকে বর্ণিত ছয় প্রকার উপেক্ষা দ্বারা তিনি সকল সংস্কার পর্যবেক্ষণ করেন, ভাবনা করতে বসে কত সময় অতীত হল তাও তিনি অবহিত থাকেন না। তিনি কোনরূপ বিচারও করেন না। এ অবস্থায়ও যদি তিনি ভাবনায় অগ্রসরতা লাভ না করেন এবং প্রজ্ঞা যথা ‘মার্গ ও ফলজ্ঞান’ দুই বা তিন ঘণ্টার মধ্যে দর্শন না করেন তবে তাঁর একাগ্রতা শিথিল হয় এবং তখন (মনে) বিচার আসে। অধিকন্তু তিনি যদি ভাবনায় অগ্রগতি লাভ করেন তবে তিনি আরও অগ্রগতি প্রত্যাশা করেন। তিনি তখন এত প্রফুল্ল হবেন যে তাতে তিনি প্রফুল্লতার ফলস্বরূপ ভাবনায় ‘পশ্চাৎগমনের বা পতনের’ সম্মুখীন হবেন। তখন তাঁকে ‘প্রত্যাশা বা বিচারকে’ প্রত্যাখ্যান করে এ দুটির প্রতি অনায়াসে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ধীর-স্থিরভাবে ভাবনা পুনরায় আরম্ভ করলে ভাবনায় অগ্রগতি লাভ হবে। যদি বিদর্শন ভাবনায় যথোপযুক্ত শক্তি লাভ না হয় তবে ভাবনা শিথিল হয়। এভাবে কোন কোন যোগী ভাবনায় একবার অগ্রসর হন এবং একবার পশ্চাৎপদ হন। যে সকল যোগী ‘ক্রমস্বর ভেদে প্রজ্ঞালাভ’ বিষয় কোন পুস্তকে অধ্যয়ন করেছেন বা লোকমুখে শুনেছেন তাঁরাই এরূপ উত্থান পতনের সম্মুখীন হন। সুতরাং ভাবনা শিক্ষার্থী যোগী যদি কোন বিদর্শনাচার্যের তত্ত্বাবধানে বিদর্শন ভাবনায় রত থাকেন তবে ভাবনারম্ভের পূর্বে এ সকল স্তর বিষয়ে অবহিত হওয়া অনুচিত। অভিজ্ঞ বিদর্শনাচার্য ব্যতীত যিনি বিদর্শন ভাবনা চর্চা করতে চান তাঁদের মঙ্গল ও সুবিধার্থে প্রজ্ঞা লাভের বিভিন্ন স্তরগুলি এখানে নির্দেশ করা হল।

ভাবনায় অগ্রগতি সত্ত্বেও এরূপ উত্থান-পতনের সম্মুখীন হলেও যোগী কখনও নিজেকে নিরাশ এবং হতাশার শিকারে পর্যবসিত করবেন না। তিনি এখন মার্গ ও ফল দর্শনের (লাভের) দ্বারা পথে অর্থাৎ তিনি এখন নির্বাণ স্রোতের প্রথম স্তর স্রোতাপন্ন স্তরে উন্নীত হবার দ্বার পথে। যত শীঘ্র তাঁর পঞ্চবল যথা শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি (একাগ্রতা) এবং প্রজ্ঞার উৎকর্ষতা সাধন হবে, তত শীঘ্র তিনি মার্গ ও ফল জ্ঞানে উন্নীত হবেন এবং নির্বাণ উপলব্ধি (দর্শন বা সাক্ষাৎ) করবেন।

নির্বাণ দর্শন

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিদর্শন জ্ঞানের উত্থান এবং পতন সংঘটনকে সমুদ্রগামী জাহাজ থেকে একটি পাখী ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রাচীনকালে সমুদ্রগামী জাহাজের কাণ্ডান জাহাজ তীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা সন্দেহ উপস্থিত হলে সঙ্গে নেওয়া পাখী ছেড়ে দিতেন। পাখী তীরের খোঁজে চতুর্দিকে উড়ে বেড়াতে। পাখীটি কোন দিকে তীরের চিহ্ন দেখতে না পেলে আবার জাহাজে ফিরে আসত। যতক্ষণ পর্যন্ত যোগীর জ্ঞান মার্গ এবং ফল জ্ঞানে পরিণত হওয়ার

মত পরিপূর্ণতা লাভ করে নি এবং নির্বাণ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়নি, ততক্ষণ পাখীর জাহাজে ফিরে আসার ন্যায় বিদর্শন জ্ঞান শিথিল ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। পাখীর যখন তীরের সন্ধান মেলে তখন সে আর জাহাজে প্রত্যাবর্তন করে না। অনুরূপভাবে যোগীর বিদর্শন জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করলে অর্থাৎ তীক্ষ্ণ, শক্তিশালী এবং নির্মল হলে, চিত্ত ষড় ইন্দ্রিয়ের যে কোন এক দ্বারে, যে কোন একটি সংস্কারকে অনিত্য বা দুঃখ বা অনাত্মরূপে জানে ত্রিলক্ষণের যে কোন একটির পর্যবেক্ষণ কার্য যখন সম্যক প্রজ্ঞা প্রভাবে উন্নততর উজ্জ্বলতা লাভ করে এবং শক্তিশালী হয় তখন (পর্যবেক্ষণ) দ্রুততর হয়। তারপর তিন বা চার বার দ্রুত অগ্রসর হয়ে নিজেই প্রভাবিত করে। অত্যধিক দ্রুত পর্যবেক্ষণ মালার শেষ (পর্যবেক্ষণ) চিত্তের পরক্ষণে যখন পর্যবেক্ষণ স্তব্ধ হয় তখন সর্বসংস্কার নিরোধ নির্বাণ উপলব্ধির সাথে সাথে মার্গ জ্ঞান ও ফল জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

নির্বাণ উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করার অব্যবহিত পূর্বে পর্যবেক্ষণ কার্য পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ থেকেও উজ্জ্বলতর হয়। শেষ পর্যবেক্ষণের পরক্ষণে সংসংস্কার নিরোধ নির্বাণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে প্রতিভাত হয়। সে কারণে যারা নির্বাণ উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ, দর্শন) করেছেন তাঁরা এরূপ বর্ণনা করেছেন : ‘যে বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা হয় তা এবং সেই পর্যবেক্ষণ চিত্তও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, অথবা বিষয়গুলি এবং পর্যবেক্ষণ কার্য ছুরিকা দ্বারা লতা কর্তনের ন্যায় খণ্ডিত হয়, অথবা বিষয়গুলি এবং পর্যবেক্ষণ কার্যের যেমন কোন ব্যক্তি মস্তকের ভারী বোঝা নিক্ষেপ করে ভারমুক্ত হয়, অথবা বিষয়গুলি এবং পর্যবেক্ষণ কার্যের ভগ্নতা প্রকাশ পায়, যেমন হস্তধৃত কোন ভঙ্গুর বস্তুর পতনে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, অথবা বিষয়গুলি এবং পর্যবেক্ষণ কার্য কয়েদীর আকস্মিকভাবে কারাবাস মুক্তির ন্যায় মুক্ত হয়, অথবা বিষয়গুলি এবং পর্যবেক্ষণ কার্য দীপ নিবে যাওয়ার মত নির্বাপিত হয়, অথবা অন্ধকার হঠাৎ আলোয় পর্যবসিত হওয়ার ন্যায় তাহা অন্তর্হিত হয়, অথবা তাহা যেন কঠিন বন্ধন মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হল বা যেন শীতল জলে অবগাহন করে ক্রোধ ও ক্লান্তিমুক্ত হল, কিম্বা যেন কোন ধাবমান ব্যক্তির গতি প্রবল প্রতিরোধ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হল, অথবা তাদের (পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ চিত্তের) সম্পূর্ণ অবসান হল।’

সংস্কার নিরোধ উপলব্ধির স্থিতিকাল দীর্ঘ নয়। এর স্থায়িত্ব এক পর্যবেক্ষণকাল সময় মাত্র। তারপর কি ঘটল যোগী তা পুনর্বিচার বা স্মরণ করেন এবং তিনি তখন এরূপ জ্ঞাত হন : ‘কায়িক কার্য প্রক্রিয়াগুলি এবং যে মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া দ্বারা সেগুলি পর্যবেক্ষণ করা হত তাদের নিরোধ সাধন হয়েছে — ইহাই মার্গফল নির্বাণ উপলব্ধি। যারা এ বিষয়ে বিজ্ঞ তাঁরা জানেন : ‘সর্ব সংস্কার নিরোধই নির্বাণ

এবং সেই নিরোধ এবং সুখানুভূতিই মার্গ এবং ফল।' তাঁরা অন্তরের অন্তস্থলে (মনের গভীরে) এরূপ বিবেচনা করেন : 'আমি এখন নির্বাণ উপলব্ধি করেছি এবং স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করেছি।' যাঁরা এ বিষয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং ধর্মদেশনা শ্রবণ করেছেন তাঁদের নিকটই উক্তরূপ নির্মল জ্ঞান প্রকট হয়। কোন কোন যোগী (এ সময়) ক্লেশ (আবিলতার) পুনঃ পর্যবেক্ষণ করেন অর্থাৎ কি কি ক্লেশ (আবিলতা) পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কি কি এখনও বর্তমান রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করেন। এরূপ পুনঃপর্যবেক্ষণ করার পরও তাঁরা কায়িক ও মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখতে পান যে তাঁদের পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া সুস্থ নয়। কায়িক ও মানসিক উভয় কার্যপ্রক্রিয়ার উত্থান এবং পতন যোগীর নিকট পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট থাকে। তৎসত্ত্বেও যোগীর মনে হয় তাঁর পর্যবেক্ষণ কার্য শিথিল হয়েছে এবং পিছিয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি এখন উদয়-ব্যয় জ্ঞান স্তরে ফিরে এসেছেন, ইহা সত্য যে তাঁর পর্যবেক্ষণ কার্য এখন শিথিল এবং পশ্চাৎপদ হয়েছে। তিনি এ স্তরে ফিরে এসেছেন বলে আবার উজ্জ্বল আলোক বা মানসিক প্রতিবিম্ব, আকার ইত্যাদি দর্শন করবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবনায় অসমতা বশতঃ এরূপ পশ্চাৎগমন ঘটে এবং কায়িক ও মানসিক কার্যপ্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে চলে না। কোন কোন যোগী সামান্য ব্যথা বা বেদনা কিছু সময়ের জন্য অনুভব করেন। তৎসত্ত্বেও যোগীগণ তাঁদের মানসিক কার্যপ্রক্রিয়ার কাজ পরিষ্কার এবং উজ্জ্বলভাবে হচ্ছে বলে মনে করেন। এই স্তরে যোগী তাঁর মন যে কোন বাধা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে দর্শন করেন এবং বাধাহীন সুখ অনুভব করেন। মনের এরূপ অবস্থায় তিনি মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া দর্শনে অপারগ হন এবং যদিও তিনি কিছু দর্শনে সমর্থ হন, কিন্তু তা তত সুস্পষ্ট নয়। এসময় তিনি অন্য কোন বিষয়ও চিন্তা করতে পারেন না, কেবল মাত্র মানসিক স্বচ্ছতা এবং সুখ অনুভব করেন। যখন এই অনুভূতির শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে তখন তিনি কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং তাদের উত্থান-পতন নির্মলভাবে প্রকাশ পায়। কিছু সময় পর যোগী যে স্তরে সংস্কার সমূহকে সমভাবে এবং শান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সে স্তরে পৌঁছান। তখন যদি বিদর্শন জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে তিনি আবার 'সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান' লাভ করেন যদি একাগ্রতা শক্তি প্রবল ও দৃঢ় হয় তবে এই জ্ঞান পুনঃ পুনঃ স্বতঃই উৎপন্ন হয়। এই সময়ে যোগীর লক্ষ্য বা

উদ্দেশ্য হল প্রথমে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করা এবং ভাবনার পরিপক্বতা হেতু তিনি অতি দ্রুত বার বার স্রোতাপত্তি ফল উপভোগ করেন। এ পর্যন্ত ভাবনা পদ্ধতি বিদর্শন জ্ঞান লাভের ক্রমোন্নত স্তর এবং স্রোতাপত্তি মার্গ ফলজ্ঞান উপলব্ধি বিষয় বর্ণিত হল।

যিনি মার্গ ও ফলজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি তাঁর মনোবৃত্তির এবং মানসিক ব্যবহারের অপূর্ব পরিবর্তন অনুভব করেন এবং জীবন যাত্রা প্রণালীর পরিবর্তনও উপলব্ধি করেন। ত্রিরত্নের (বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের) প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অটুট ও দৃঢ় হয়। পরম শ্রদ্ধাতিশয়্য বশত: তিনি চিন্তে প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতা বোধ করেন। তাঁর নিকট স্বত:স্ফূর্ত সুখ-স্কুরণ হয়। এ সকল ভাবনাগত অনুভূতির জন্য তিনি বিষয়গুলিকে নির্মলভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না, যদিও মার্গফল লাভের পরও তিনি সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণে সর্বদা সচেতন থাকেন। মোটের উপর কিছু সময় বা কয়েকদিন পর তাঁর এই অনুভূতি কমে যায় এবং তিনি তারপর পরিষ্কারভাবে সংস্কার পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়: ‘যোগীগণ মার্গ ও ফলজ্ঞান লাভ করে চিন্তে অনুভব করেন — ভারমুক্ত অবস্থা, স্বাধীনতা সুখ এবং চির প্রশান্তি। তার পর তাঁরা আর ভাবনা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন না; কেননা তাঁদের লক্ষ্যস্থল মার্গ ও ফল অধিগত হয়েছে এবং তাঁদের হৃদয় প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে।

ফল সমাপত্তি (ফলজ্ঞান)

যিনি মার্গ ও ফল অধিগত হয়েছেন এবং আবার ফলজ্ঞান অধিগত করতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি তাঁর মনকে সেই উদ্দেশ্যের দিকে নমিত করবেন এবং পুন: কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়ায় মনঃসংযোগ করে পর্যবেক্ষণ কার্যে মনোযোগী হবেন। বিদর্শন ভাবনা চর্চাকালে পুথুজ্ঞানের (বা সাধারণ মানুষের) প্রথমত: নাম-রূপ জ্ঞানের উদয় হয়, আর যাঁরা আর্য (অন্তত: স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করেছেন) তাঁদের নিকট উদয়-ব্যয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং স্রোতাপন্ন (নির্বাণ স্রোতে পতিত) যোগীর নিকট এ অবস্থায় কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া চিন্তের পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে অচিরেই উদয়-ব্যয় জ্ঞান উৎপন্ন হবে এবং ক্রমে আরও উন্নত স্তরের বিদর্শন জ্ঞানসহ সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান স্তরে উন্নীত হবেন। যখন এ জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করবে তখন সর্বসংস্কার নিরোধ নির্বাণ ফলজ্ঞানসহ প্রতিভাত হবে। ‘এ জ্ঞান কতক্ষণের জন্য স্থিত থাকবে? তা যদি পূর্বে যোগী অধিষ্ঠান (বা সংকল্প) না করেন তবে তা মাত্র এক চিন্তক্ষণ বা তার কিছু বেশি থাকতে পারে। কিন্তু যিনি

পূর্বেই এ জ্ঞান স্থিতির সময় নির্ধারণ করে থাকেন তবে তাঁর ফলজ্ঞান দীর্ঘসময় স্থায়ী হয়; একদিন বা এক রাত অথবা যতক্ষণের জন্য অধিষ্ঠান করেন ততক্ষণ স্থিত থাকবে'; — অর্থকথায় এরূপ বলা হয়েছে। অনুরূপ জ্ঞান বর্তমান কালে যাঁরা সমাধি এবং বিদর্শন প্রজ্ঞায় নিরত তাঁদের ফলজ্ঞান এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা... স্থিত হয়। ফলজ্ঞানের তখনই সমাপ্তি হবে যখন যোগী তার সমাপ্তি ইচ্ছা করবেন। তথাপি ফলজ্ঞান এক, দুই, তিন ঘণ্টা স্থিতি কালে কখনও কখনও কারো কারো চিত্ত অন্য আরম্ভন গ্রহণ করে ক্ষণিকের জন্য বহির্মুখী হয়ে আবার নিরোধে বা ফলে পতিত হয়। (তা চার পাঁচ বার প্রত্যবেক্ষণ করলে চলে যায় এবং পুনঃ ফলজ্ঞান প্রবর্তন করে।) কোন কোন ক্ষেত্রে ফলজ্ঞান বিনা বাধায় কয়েক ঘণ্টার জন্য স্থায়ী হয়। যখন ফলজ্ঞান স্থিত থাকে তখন চিত্ত সর্বতোভাবে সর্বসংস্কার নিরোধ নির্বাণে প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাণ একটি 'ধর্ম' যা কায়িক মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া এবং জাগতিক সকল প্রকার ধারণা বিমুক্ত। সুতরাং ফলজ্ঞান অনুভূতি কালে কায়িক মানসিক কোন কার্যপ্রক্রিয়া এবং এ জগতের বা অন্য পার্থিব জগতের (ভূমির) কোন বিষয় মনের জাগ্রত স্তরে উৎপন্ন হয় না। যোগী সর্ব জাগতিক স্তরের সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত থাকেন। যোগী জাগতিক জ্ঞান এবং অনুরাগ থেকে সর্বতোভাবে বিমুক্ত। তাঁর চতুর্দিকে দর্শনের, শ্রবণের, আশ্রমের অথবা স্পর্শের সকল বিষয় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিছুই তিনি জানতে পারেন না। আসীন অবস্থায় যখন তাঁর নিকট ফলজ্ঞানের সুখানুভূতি আসে তখন তাঁর উপবেশন অবস্থা পূর্বের ন্যায় দৃঢ় থাকে এবং অবসন্ন হন না। মোটের উপর যোগীর ফলজ্ঞান ক্রিয়া তিরোহিত হওয়ার পরমুহূর্তে তাঁর নিকট সংস্কার নিরোধ বিষয়ক বিচার অথবা বিষয় (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে) দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবনা, প্লবনশীল অনুভূতি বা বিচার-এর পুনঃ প্রবর্তন হয়। প্রথমতঃ সংস্কার তাঁর নিকট অস্পষ্ট হয় এবং পর্যবেক্ষণ কার্যও যথাশক্তি লাভ করে না। কিন্তু যাঁরা প্রজ্ঞাসম্পন্ন যোগী তাঁদের ভাবনা যথা নিয়মে সহজভাবে চলে।

এ ক্ষেত্রে যোগীদের সতর্কতার প্রয়োজন আছে। যোগী দ্রুত ফলজ্ঞানে প্রবেশ করার পূর্বে 'কতক্ষণ ফলজ্ঞানে স্থিত থাকবেন' তা পূর্বেই অধিষ্ঠান বা সংকল্প করে নেবেন। তিনি যখন কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করবেন তখন অধিষ্ঠান বা সংকল্পের প্রতি মনঃসংযোগ করবেন না। বিদর্শন জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভের পূর্বে তিনি যখন সুন্দরভাবে সংস্কার পর্যবেক্ষণরত তখন রোমাঞ্চ, হাই তোলা, কম্পন, অশ্রুবর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা ভাবনায় ভরবেগ বা গতিবেগ বাধা প্রাপ্ত হতে পারে। যখন ভাবনায় পর্যবেক্ষণ গতিবেগ-বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ

করবে তিনি তাঁর লক্ষ্যস্থলের (ফল সমাপত্তি) দিকে নজর দিতে ইচ্ছা হতে পারে। তাতে তিনি ভাবনায় প্রগাঢ়তা হারাবেন। তিনি তখন ভাবনা বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করবেন না: যদি তিনি অজ্ঞাতসারে তাই করেন তখন তাঁর কর্তব্য হবে সেই 'অন্য চিন্তাকে' পর্যবেক্ষণ করা। কেহ কেহ তাঁদের ভাবনায় পর্যবেক্ষণ গতিবেগ কয়েকবার হারিয়ে তবে ফলজ্ঞানে উন্নীত হন। যদি যোগীর একাগ্রতা ক্ষীণ বা দুর্বল হয় তবে তাঁর ফলজ্ঞান লাভও দেৱীতে হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। ইহাই ফলজ্ঞান লাভ পদ্ধতি বর্ণনা।

পর্যবেক্ষণ (বা পুনঃপর্যবেক্ষণ)

কোন কোন যোগী ভয়জ্ঞান, ভঙ্গজ্ঞান, নির্বিদাজ্ঞান, মুক্তিকাম্যতাজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের মাধ্যমে অগ্রসর হন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকে না। যদি যোগী সেগুলি পর্যবেক্ষণ করতে চান তবে তাদের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করবেন। উদাহরণ: যোগী উদয়-ব্যয় জ্ঞান উৎপত্তি মানসে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা শুধুমাত্র বিষয়ের উত্থান এবং পতনের প্রতি মনঃসংযোগ করে পর্যবেক্ষণ করে যাবেন। সেই সময় উদয়-ব্যয় জ্ঞান পূর্ণ স্থিত থাকে এবং বিদর্শন জ্ঞানের আর কোন অগ্রগতি হয় না। যা হোক, যখন সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন ভঙ্গজ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হয় যদি ভঙ্গজ্ঞান উৎপন্ন না হয় তখন যোগী ভঙ্গের (বিষয় বিলয়ের) প্রতি মনোনিবেশ করবেন এবং সংকল্প করবেন ভঙ্গজ্ঞান যেন কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। সেই সময় যা সংকল্প করা হয় তাই ঘটে থাকে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে তৎপরবর্তী জ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হয়। যদি উৎপন্ন না হয় যোগী ভীতিব্যঞ্জক বিষয়ে মন স্থাপন করবেন (ভয় উৎপন্ন করবেন) এবং ভয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তারপর যোগী দোষজনক বা দুঃখজনক বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করবেন তাতে আদিনব জ্ঞান (সংস্কারের দোষ জ্ঞান) যথাশীঘ্র উৎপন্ন হবে। যদি মন ঘৃণাজনক বিষয়ে স্থাপন করা হয় তখন নির্বিদাজ্ঞান (সর্বসংস্কারের প্রতি বিরক্তি জ্ঞান) উৎপত্তি হয়। প্রতিটি পর্যবেক্ষণে বিরক্তিবোধ করলে নির্বিদাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তারপর পরবর্তী স্তরের বিষয় চিন্তা করতেই হবে, তবে মুক্তিকাম্যতা (মুমুক্ষা) জ্ঞান উৎপন্ন হবে। সর্বসংস্কার (দেহ-মন কার্যপ্রক্রিয়া) থেকে গভীর আগ্রহে মুক্তি প্রত্যাশা করে সেই প্রাসঙ্গিক জ্ঞান উৎপত্তির সংকল্প করবেন, তখন বীর্ষসহকারে ভাবনা করলে শীঘ্র সেই জ্ঞান (মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান) উৎপন্ন হবে। যখন যোগী পরবর্তী জ্ঞান লাভের জন্য চিন্তা নমিত করবেন তখন তিনি বেদনা অনুভব করবেন এবং ধ্যানাসন বদলাতে ইচ্ছা করবেন, অসম্ভষ্টিরূপ

অনুভূতি দ্বারা উপদ্রুত হবেন, কিন্তু তিনি তখন প্রতिसংখ্যাজ্ঞানে (পুনঃপর্যবেক্ষণ জ্ঞান) উন্নীত হবেন। তারপর যোগী তাঁর চিন্তকে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের প্রতি চালিত করবেন। ভাবনায় ভরবেগ চলতে থাকবে যতক্ষণ না শান্তভাবে প্রতिसংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন না হয়। এভাবে যোগী দেখবেন যে নির্দিষ্ট সময়ে যেই জ্ঞান লাভের নিমিত্ত তিনি পর্যবেক্ষণ কার্য সম্পন্ন করছেন সেই জ্ঞানই লাভ হচ্ছে, এভাবে একটির পর একটি পরবর্তী উচ্চতর জ্ঞান বায়ু পরিমাপ যন্ত্রের উর্ধ্বচাপ বৃদ্ধির ন্যায় দ্রুত লাভ হয়ে যাচ্ছে। পুনঃপর্যবেক্ষণে যদি পূর্বজ্ঞানগুলির উৎপত্তি সশেষজনক হয়নি মনে হয় তবে সেগুলির ফল সন্তোষজনক না হওয়া পর্যন্ত পুনর্বীর (বা বার বার) পূর্ব নিয়মে ভাবনা করে যেতে হবে। উৎসাহী যোগীর ভাবনায় অগ্রসরতা অতি তাড়াতাড়ি হয় এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানে উন্নীত হন, এমন কি ফলজ্ঞানও অতিশীঘ্র লাভ করেন। যার ভাবনা অনুশীলনে বহুলীকৃত (সদা পরিপূর্ণ) তিনি গমনকালে বা আহ্বারের সময়ও এই জ্ঞান বা ফলসমাপত্তি অধিগত হন।

উন্নততর মার্গ লাভ উপায়

যখন যোগী অনুশীলন দ্বারা প্রথম মার্গের ফলজ্ঞান লাভ বিষয়ে পূর্ণ তৃপ্ত হন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাতে অবস্থান করতে পারেন তখন তাঁর আরও উন্নত মার্গের ভাবনা করা উচিত। তারপর তিনি সাগ্রহ প্রত্যাশায় এভাবে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে সংকল্প করবেন : 'এই নির্দিষ্ট সময়ে আমি প্রথম ফলজ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছা করি না। সেই ফলজ্ঞানের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। যে মার্গ আমি এখনও লাভ করিনি সেই মার্গে যেন আমি উন্নীত হই। সেই লক্ষ্যস্থলে আমি যেন পৌছাই।' এরূপ অদম্য ইচ্ছা পোষণ করে তিনি কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়াসমূহ যথানিয়মে পর্যবেক্ষণ করে যাবেন। নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে সংকল্প করার সুবিধা হল এই যে — তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাঁর পূর্বলব্ধ ফলজ্ঞান তিনি পুনরায় অনায়াসে লাভ করতে পারেন। যদি যোগী নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ সংকল্প গ্রহণ করে পরবর্তী উচ্চমার্গ লাভের জন্য প্রচেষ্টা করেন তবে তাঁর নিকট পূর্বলব্ধ নিম্ন (অর্থাৎ প্রথম) মার্গের ফলজ্ঞান পুনরায় উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। সে কারণে যোগী যদি দেখেন তিনি এখনও পরবর্তী উচ্চ (অর্থাৎ দ্বিতীয়) মার্গ লাভ করতে পারছেন না অথবা প্রথম মার্গের ফলজ্ঞানে ফিরে যাচ্ছেন তখন তিনি অসন্তুষ্টি এবং হতাশা বেদনায় উপদ্রুত হবেন। যে ফলজ্ঞানে ইতিপূর্বে (অর্থাৎ প্রথম মার্গের ফলজ্ঞান) লাভ করেছেন তার পুনরাবির্ভাব নির্দিষ্ট সময়ে (উৎপন্ন) না হওয়ার জন্য সংকল্প

গ্রহণের সুফল হচ্ছে : সে ফলজ্ঞান সেই নির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন হবে না এবং যদি বিদর্শন ভাবনায় পরিপূর্ণতা আসে তবে তিনি পরবর্তী উচ্চমার্গ লাভ করেন। যদি পূর্ববর্তী (প্রথম মার্গের) ফলজ্ঞান লাভের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হয় তাহলে সে (পূর্ববর্তী প্রথম মার্গের) ফলজ্ঞান পুনঃ উৎপন্ন হতে পারে। সুতরাং সে কারণেই পূর্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উন্নত (দ্বিতীয়) মার্গ লাভের উদ্দেশ্যে যখন যোগী ভাবনা আরম্ভ করবেন তখন তাঁর অগ্রসরমান বিদর্শনজ্ঞান লাভ হবে উদয়-ব্যয় জ্ঞান থেকে শুরু করে। বিদর্শন জ্ঞানে অগ্রসরতা এবং ফলজ্ঞান পুনর্বীর লাভ প্রচেষ্টা এক নয়। বর্তমান প্রচেষ্টা দ্বিতীয় মার্গজ্ঞান লাভের জন্য প্রথম মার্গ জ্ঞান লাভ প্রচেষ্টার ন্যায় একই প্রকারে অগ্রসর হতে হবে। উজ্জ্বল আলোক, প্রতিমূর্তি ইত্যাদি নতুন উদয়-ব্যয় জ্ঞান লাভে যেমন উৎপন্ন হয় এখানেও সেরূপ উৎপন্ন হয়। দুঃখ বেদনাও অনুভূত হয়। কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া নির্মল হয়। পুনঃফলজ্ঞান লাভ নিমিত্ত ভাবনার সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান লাভ করতে বেশি সময় লাগেনা, কিন্তু এখনও যদি (দ্বিতীয় মার্গ জ্ঞানের জন্য) ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করা না হয়ে থাকে তবে যোগীকে নিম্নতর জ্ঞানে যথা ভঙ্গ-ভয়-আদিনব-নির্বৈদ-মুক্তিকাম্যতা বা প্রতিসংখ্যা জ্ঞানে অনেক সময় কাটাতে হয়। তবে প্রথম মার্গ লাভের জন্য যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে দ্বিতীয় মার্গ লাভ কারণে তত কষ্ট পেতে হবে না। একদিনের মধ্যেই পর পর এক একটি জ্ঞান স্তর লাভ অতিক্রম করে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত লাভ করা সম্ভব। জ্ঞান লাভের মানসিক প্রক্রিয়া পূর্বোপেক্ষা (অর্থাৎ প্রথম মার্গের জ্ঞানস্তর অপেক্ষা) আরও অধিকতর উজ্জ্বল, নির্মল এবং বিস্তৃত হবে। তাঁর ভয়-আদিনব-নির্বৈদ-মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান পার্থিব জগতের দুঃখমুক্তির জন্য আরও প্রখর হবে। পূর্বে যোগীর এক ঘণ্টার মধ্যে চার পাঁচ বার (প্রথম) ফলজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হলেও এখন যদি তাঁর বিদর্শন জ্ঞান উচ্চ (দ্বিতীয়) মার্গের নিমিত্ত পরিপূর্ণ না হয় তবে তাঁর সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান চলতে থাকে (অর্থাৎ তিনি তার মধ্যে থেকে যান)। সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান একদিন থেকে এক মাস, এমনকি বৎসরের পর বৎসরও থেকে যেতে পারে। বিদর্শন জ্ঞান পরিপক্বতা লাভ করলে, সংস্কার সমূহের পরিপূর্ণ নির্মল পর্যবেক্ষণ হলে উচ্চ (দ্বিতীয়) মার্গফলসহ সর্বসংস্কার-নিরোধ উপলব্ধি হবে। তখন তাঁর নিকট (দ্বিতীয় মার্গের) পুনঃপর্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হবে। অতীব নির্মল মানসিক কার্য-প্রক্রিয়াসহ তিনি আবার (দ্বিতীয় মার্গের) উদয়-ব্যয় জ্ঞানে ফিরে আসবেন। ইহা সকৃদাগামী মার্গের (দ্বিতীয় মার্গের) অর্থাৎ একবার মাত্র এই পৃথিবীতে

উৎপত্তির (জন্মের) বিদর্শন জ্ঞানে অগ্রসরতা বর্ণনা।

আবার যিনি তৃতীয় অর্থাৎ অনাগামী মার্গে উন্নীত হতে চান তবে তাঁকে তাঁর পূর্ববর্তী (দ্বিতীয়) মার্গের ফলজ্ঞান অনুৎপত্তির জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে (পূর্বের ন্যায়) সংকল্প গ্রহণ (অধিষ্ঠান) করতে হবে। তিনি একরূপে সংকল্প গ্রহণ করবেন : ‘আমার নিকট শুধুমাত্র উন্নত (তৃতীয় মার্গের) বিদর্শন জ্ঞানের অগ্রসরতা প্রতিফলিত হোক। আমি যেন এই উন্নত মার্গ ও ফলজ্ঞানে উন্নীত হই।’ তিনি তখন দেহ-মনের ভাবনা যথারীতি আরম্ভ করে উদয়-ব্যয় জ্ঞান নিয়েই ভাবনা করবেন। শীঘ্রই তিনি ক্রমোন্নত জ্ঞান একটির পর একটি লাভ করে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানে উন্নীত হবেন। এখনও যদি বিদর্শন জ্ঞান পরিপক্ব না হয় তবে এ জ্ঞানই চলতে থাকবে। যখন বিদর্শন জ্ঞান পরিপক্বতা বা পূর্ণতা লাভ করবে তখন তৃতীয় মার্গ ও ফলজ্ঞানসহ সর্বসংস্কার নিরোধ উপলব্ধি হবে। ইহা অনাগামী বা তৃতীয় মার্গ ও ফল লাভ বিষয়ক বর্ণনা। অনাগামী এ পৃথিবীতে (কামলোকে) আর জন্মগ্রহণ করেন না।

যিনি চতুর্থ বা সর্বশেষ মার্গ এবং ফল অর্থাৎ অর্হত্ব (অর্হত্ব মার্গফল) লাভ করতে ইচ্ছা করেন তাঁকে (তৃতীয় মার্গের) ফলজ্ঞান উৎপত্তি আকাজক্ষা সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে। তারপর কায়িক ও মানসিক কার্যপ্রক্রিয়াসমূহ যথারীতি ভাবনা করবেন। স্মৃতিপ্রস্থান (সতিপট্ঠান) সূত্রে ইহাই একমাত্র মার্গরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। উদয়-ব্যয় জ্ঞান থেকে ভাবনা আরম্ভ করে তিনি শীঘ্রই সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান লাভ করবেন। বিদর্শন জ্ঞান অপরিপক্ব থাকলে মার্গ লাভও মস্তুর হবে। যদি বিদর্শন জ্ঞান পরিপক্ব হয় তবে যোগী অর্হত্ব মার্গসহ সর্বসংস্কার নিরোধ উপলব্ধি করবেন।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে যে অগ্রসরমান বিদর্শন জ্ঞানের পরিসমাপ্তি রূপ মার্গ ও ফলজ্ঞান উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে তা যাঁরা পারমিতা পরিপূর্ণ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। যাঁদের পারমিতা অপরিপূর্ণ তাঁরা সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছে স্থিত থাকবেন (আর অগ্রসর হতে পারবেন না)। একটি প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে যদিও কোন যোগী প্রথম মার্গ লাভ করেছেন, তুলনামূলকভাবে তিনি কম আয়াসে দ্বিতীয় মার্গ লাভ করবেন কিন্তু তৃতীয় মার্গ লাভ করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। এর কারণ হচ্ছে প্রথম এবং দ্বিতীয় মার্গলাভী যোগীরা শীল পরিপূর্ণকারী, অন্য অর্থে তাঁরা শীল বা চরিত্রনীতি উৎকর্ষতার আদর্শ। তৃতীয় মার্গলাভী সমাধি পরিপূরক অর্থাৎ সমাধি পরিপূর্ণতার আদর্শ। সুতরাং তিনি তৃতীয় মার্গ সহজে লাভ করতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে তাঁকে

সমাধির পরিপূর্ণতা সাধন করতে হবে। যদিও মার্গফল এ নীতিতে বা উপায়ে লাভ হয় তবুও সম্যক প্রচেষ্টার পারমিতা বা শক্তিবৃদ্ধি ব্যতীত কেহ জানতে পারেন না যে তিনি এই বা সেই মার্গলাভ করতে সমর্থ হবেন কিনা। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মার্গলাভ অনেক দেরিতে হয়। যদি তাঁকে দীর্ঘসময় প্রচেষ্টা করে যেতে হয় তবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে তাঁর পারমিতা তখনও পরিপূর্ণ হয়নি। আবার বর্তমান প্রচেষ্টাও পারমিতা পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে যা পরিপূর্ণতার সমীপবর্তী। সুতরাং পারমিতা পরিপূর্ণতা আছে কি নেই এ বিষয় মনে মনে বিবেচনা করে সময় নষ্ট করা অনুচিত।

নিম্নোক্ত অবাঞ্ছনীয় বিষয়গুলি মনে রেখে তাঁকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবার জন্য যথাসাধ্য সম্যক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে :

সম্যক প্রচেষ্টা ব্যতীত পারমিতা পূরণও সম্ভব হয় না। ধরে নিন : এক ব্যক্তি পারমিতা পরিপূর্ণ করেছেন তবুও সম্যক প্রচেষ্টা ব্যতীত তাঁর দ্বারা কোন মার্গ লাভ সম্ভব হবে না। এরূপ ব্যক্তি সম্যক প্রচেষ্টা দ্বারা সহজে যথাশীঘ্র মার্গলাভ করতে পারেন। তিনি যদি পারমিতা বোধগম্য পর্যায়ে বিকাশ করে থাকেন তবে তাঁর প্রচেষ্টা পরিপক্বতা লাভ করবে এবং ফলস্বরূপ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যে কোন মার্গলাভের অধিকারী হবেন। অন্ততঃ পক্ষে ইহাও হতে পারে যে তিনি পরবর্তী জীবনে ফসল সংগ্রহ রূপ মার্গলাভ বীজ বপন করলেন।

উপদেশ

বুদ্ধশাসন বর্তমানেও বিদ্যমান। তাই যাঁরা সত্য সত্যই আগ্রহী এবং কর্মেচ্ছু তাঁদের জাগতিক সর্বদুঃখ অপনোদনের জন্য বিদর্শন ভাবনার চরম লক্ষ্য মার্গফল ও নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্য এই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা যেন পূর্ব বর্ণিত উপায়ে দেহ-বেদনা-চিন্তা ধর্ম অবলম্বন করে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই যোগীদের নিকট প্রযোজ্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

এ পুস্তকে ভাবনা পদ্ধতি বিষয়ে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। এরূপ ব্যক্তি তা অধ্যয়ন করতঃ দৃঢ় বিশ্বাস, অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং সমুচিত অধ্যবসায় নিয়ে ভাবনা-প্রণালী সুসংগতভাবে অনুশীলন করলে তাঁদের ভাবনায় অগ্রগতি সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত থাকবেন। এখানে উল্লেখ্য যে যোগীগণ যে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা এবং ক্রমোন্নত বিদর্শন জ্ঞান স্তরের মাধ্যমে অগ্রসর হন তা এই স্বল্প পরিসরে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। অপরপক্ষে যে

অভিজ্ঞতার বিষয় এই পুস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে তা সকল যোগীর পক্ষে সমপ্রযোজ্য নয়। প্রত্যেক যোগীর পারমিতা পূর্ণতা এবং সামর্থ্য অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন, আবার প্রত্যেকের শ্রদ্ধা, আকাঙ্ক্ষা এবং অধ্যবসায় সকল সময় একইরূপ থাকেনা। তদুপরি যে যোগীর কোন বিদর্শনাচার্য নেই, যিনি এই পুস্তকের উপর একমাত্র নির্ভরশীল তিনি সকল সময় সাবধানে এবং সন্তর্পণে পথ পরিত্রমা করবেন, কারণ এ বিশেষ পথে তিনি পূর্বে কখনও পদচারণা করেননি। এ কারণে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, এরূপ ক্ষেত্রে যোগীর পক্ষে দক্ষ বিদর্শনাচার্যের উপদেশ বাণী ব্যতীত মার্গফল নির্বাণ লাভ তত সহজ হয় না। এমতাবস্থায় যিনি সত্যই ভাবনাচার্য্য উৎসুক, তিনি মার্গফল নির্বাণ লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত কোন এক স্ব-অর্জিত বিদর্শন জ্ঞানে উন্নত, সুযোগ্য এবং বিদর্শন জ্ঞানের নিম্নস্তর থেকে সর্বোন্নত স্তর মার্গফল পর্যবেক্ষণ শিক্ষাদানে সমর্থ আচার্যের সন্ধান করে নেন। এই উপদেশ সংযুক্ত নিকায়ের উদানবর্গের উক্তির সঙ্গে তুলনীয় : ‘বিলয় এবং মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য আচার্য অনুসন্ধান করা উচিত।’ যদি কেহ এরূপ আত্মগরিমায় গর্বিত : ‘আমি একজন অসাধারণ ব্যক্তি, আমি কেন অন্যের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করব?’ পোখিল মহাথের যেমন এরূপ গর্ব পরিহার করেছিলেন তাঁকেও সেরূপ গর্ব পরিত্যাগের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।

ভাবনাচার্য্য কালে বুদ্ধের নিম্ন উদ্ধৃত উপদেশ স্মরণ রেখে যোগী যেন লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সর্বপ্রকারে সচেতন হন : ‘শিথিল কর্মী এবং ভাবনায় স্বল্প উদ্যমশীল ব্যক্তি সর্বদুঃখের নির্বাণ লাভে অসমর্থ। এই তরুণ অনুপম ভিক্ষু অতিম ভারবাহী, মারজয়ী।’ (নিদান বগ্গ সংযুক্ত নিকায়, পৃ. ৪৬৬)

জ্ঞান দর্শন

১। স্রোতাপন্ন, সন্সাদাগামী, অনাগামী প্রভৃতি আর্য়গণের নির্বাণ উপলব্ধির স্তর : তিনি নির্বাণ দর্শন করেন অর্থে নির্বাণ (অমৃত) উপলব্ধি করেন (পরিশেষ অবস্থা) — বিশুদ্ধি মার্গ। প্রথম মার্গ লাভ মুহূর্তে নির্বাণ দর্শনই নির্বাণ উপলব্ধি। পরবর্তী উচ্চতর মার্গসমূহ লাভ মুহূর্তে নির্বাণ উপলব্ধিই ভাবনায় অগ্রসরতা — পটিসম্বিদা মার্গ।

২। অর্থসালিনী — ‘মনে করা যাক্ একজন চক্ষুন্মান ব্যক্তি মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিকালে পথ অতিক্রম করছেন। পথ তমসাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতালোক অন্ধকার দূর করে। অন্ধকারের অনুপস্থিতিতে পথ পরিষ্কার দেখা যায়, দ্বিতীয় যাত্রায়ও এরূপ পরিস্থিতি এবং তৃতীয় যাত্রায়ও তাই হয়। এখানে সেই ব্যক্তির পথ যাত্রাকে

(আর্য শ্রাবকের) স্রোতাপত্তি মার্গ লাভের জন্য বিদর্শন প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনীয় পথ তমসামৃত থাকা এখানে অজানাস্থকারে সত্য আবৃত থাকা। বিদ্যুতালোকে পতের অন্ধকার বিদূরীত হওয়া এখানে স্রোতাপত্তি মার্গের উৎপত্তিতে অজানাস্থকার বিদূরীত হয়ে সত্যের আলোক উৎপন্ন হওয়া, অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার পর পথ দর্শন হল — স্রোতাপত্তি মার্গে চার আর্য সত্যের প্রকাশ এবং মার্গে যা প্রকাশিত হয় তা সেই মার্গারূঢ় ব্যক্তি সে মার্গ লাভ করেছেন বলে জানেন। দ্বিতীয় যাত্রায় যোগী স্কৃদাগামী মার্গ লাভের জন্য (দ্বিতীয় বার) বিদর্শন প্রচেষ্টা (বা ভাবনা) করেন। তৃতীয় যাত্রায় যোগী অনাগামী মার্গ লাভের জন্য (তৃতীয় বার) বিদর্শন প্রচেষ্টা করেন...”

পরিশিষ্ট

পালি সাহিত্য, অর্থকথা এবং অণু অর্থকথা থেকে উদ্ধৃত করে ধ্যান বিষয়ে আরও জ্ঞান লাভের জন্য এখানে কিছু উপদেশ পরিবেশন করা হল : ১। পুনঃ হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু যখন গমন করেন তখন ‘গমন করছি’ রূপে জানেন। যখন দাঁড়ান, উপবেশন করেন শয়ন করেন তখন ‘দাঁড়িয়েছি’, ‘বসেছি’, ‘শয়ন’ করেছি রূপে জানেন। যেমন যেমন ভাবে দেহ অবস্থিত থাকে তখন তেমন তেমন অবস্থাকে জানেন (বা সেরূপে অবহিত হন) (দীর্ঘ নিকায় ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ২৩২)।

২। পুনঃ হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সম্মুখে গমনের সময় বা ফিরে আসার সময়, সম্মুখের দিকে দেখার সময় বা চোখ ফিরাবার সময় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসারিত বা সংকোচন করার সময়, সংঘাটি (পরিধেয় চীবর বা বস্ত্র) পরিধান করার সময় বা পাত্র গ্রহণের সময়, আহারের সময়, পানীয় পান করার সময়, খাদ্য চিবানোর সময়, স্বাদ গ্রহণের সময়, মলমূত্র ত্যাগের সময় তিনি যে যে কার্যসম্পাদন করেন তা জানেন বা সে কার্যে অবহিত থাকেন। গমন দাঁড়ান, উপবেশন, শয়ন, দর্শন, নিদ্রাকালে, কথা বলার সময়, নীরব থাকাকালে তিনি যে কর্ম সম্পাদন করেন তা অবহিত থাকেন। (ঐ, পৃ. ২৩৩)।

৩। পুনঃ হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এই কায় (দেহ) যেভাবে স্থিত আছে বা যা দ্বারা প্রভাবিত সেই চার ধাতু (পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু) বিষয়ে পর্যবেক্ষণ (ভাবনা) করেন। (ঐ, পৃ. ২৩৫)।

৪। এখানে হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সুখ-বেদনা বেদন (অনুভব) কালে সুখ-বেদনা অনুভব করছি' রূপে জানেন। দুঃখ-বেদনা বেদন কালে 'দুঃখ-বেদনা অনুভব করছি' রূপে জানেন। (এ, পৃ. ২৩৬)।

৫। এখানে হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর সরাগ (লোভ) চিত্ত উৎপন্ন হলে 'সরাগ চিত্ত উৎপন্ন হয়েছে' রূপে জানেন। সেরূপ বীতরাগ চিত্ত হলে বীতরাগ চিত্ত বলে জানান। (এ, পৃ. ২৩৭)।

৬। এখানে হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর অন্তরে কামচ্ছন্দ (কাম বাসনা) উৎপন্ন হলে 'কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয়েছে' রূপে এবং কামচ্ছন্দ উৎপন্ন না হলে 'কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয়নি' রূপে জানেন....। (এ, পৃ. ২৮৮)।

বুদ্ধের এই উপদেশ সাধারণত: সহজভাবে নিম্নোক্তরূপে পর্যবেক্ষণ করা হয়: উদরের উত্থান কালে 'উঠছে', পতন কালে 'নামছে', অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নমিত করা কালে 'নমিত করা হচ্ছে', বিস্তার করা কালে 'বিস্তার করা হচ্ছে'; মন যখন এদিক ওদিক বিচরণ করে 'ঘুরছে বা বিচরণ করা হচ্ছে'; যখন চিন্তা করা হয় এবং জানা হয় তখন 'চিন্তা করছি' এবং 'জানছি' রূপে পর্যবেক্ষণ বা ধারণা করতে হয়। গমনকালে 'গমন করছি' দাঁড়ান কালে 'দাঁড়িয়েছি', উপবেশন কালে 'বসেছি' শয়ন অবস্থায় 'শুয়েছি' রূপে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এখানে বিশেষ করে প্রণিধানের বিষয় এই যে গমন উপবেশন ইত্যাদিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার সময় বায়ু ধাতুর ক্রিয়ার প্রকাশ জ্ঞাত না হয়ে তৎপরিবর্তে সাধারণ শব্দ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উদরের উত্থান এবং পতন

উদরের উত্থান-পতন পর্যবেক্ষণ করে ভাবনা করা বুদ্ধবাণী সম্মত। এরূপ উত্থান-পতন রূপের ক্রিয়া বায়ুধাতু দ্বারা সংঘটিত হয়। বায়ুধাতু পঞ্চস্কন্ধের (নাম-রূপের) মধ্যে রূপ স্কন্ধের অন্তর্গত। ইহা দ্বাদশ আয়তনের স্পর্শায়তন, অষ্টাদশ ধাতুর স্পর্শানুভূতি, চার মহাভূতের মধ্যে বায়ু মহাভূত, চতুরার্য সত্যের মধ্যে দুঃখ সত্য। রূপস্কন্ধ, স্পর্শায়তন, স্পর্শানুভূতি এবং দুঃখসত্য নিশ্চিতরূপে বিদর্শন ভাবনার আলম্বন বা বিষয়। সুতরাং উদরের উঠা-নামা (উত্থান-পতন) বিদর্শন ভাবনার প্রকৃষ্ট আলম্বন। যখন যোগী উদরের উঠা-নামায় মন নিবিষ্ট করে ভাবনা করেন তখন তিনি ইহা যে বায়ু ধাতুর চলনক্রিয়া তা তিনি অবহিত থাকেন এবং ইহা যে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাবের এবং বুদ্ধবাণীর স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু

এবং সত্য বিষয়ক উপদেশাবলীর সঙ্গে যে সম্পূর্ণরূপে মিল রয়েছে তা নিম্নে উদ্ধৃত বুদ্ধবাণী থেকে প্রমাণিত হয়।

৭। ঋকবর্গ সংযুক্ত এরূপ বিবরণ আছে : — হে ভিক্ষুগণ! তোমরা রূপে মনোনিবেশ স্থাপন কর এবং রূপ যে অনিত্য তা অনুধাবন কর। (সংযুক্ত নিকায়, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৪২)

৮। হে ভিক্ষুগণ! যখন ভিক্ষু অনিত্য রূপকে অনিত্যরূপে দর্শন করেন, ইহা তাঁর সম্যক দৃষ্টি। (ঐ পৃ. ৪২)।

৯। ইহা রূপ, ইহা রূপের সমুদয় (উৎপত্তি) এবং ইহা রূপের অন্তর্ধান (দীর্ঘনিকায়, ২য় ভাগ, পৃ. ২৩৯)।

১০। হে ভিক্ষুগণ! স্পৃশ্য বিষয়ে মনোনিবেশ স্থাপন কর এবং তাকে অনিত্যরূপে দেখ। (সংযুক্ত নিকায়, ২য় ভাগ, পৃ. ৩৫৫)।

১১। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু অনিত্য স্পৃশ্যকে অনিত্যরূপে দর্শন করেন, ইহা তাঁর সম্যকদৃষ্টি। (ঐ পৃ. ৩৩৫)।

১২। স্পৃশ্যকে বিশেষরূপে জেনে, পরিপূর্ণরূপে জেনে, তার থেকে বিরত (অনাসক্ত) হয়ে, স্পৃশ্য বিষয়কে সম্পূর্ণ বর্জন করে দুঃখ ক্ষয় করা যায়। (ঐ পৃ. ২৫০)।

১৩। স্পৃশ্যকে অনিত্যরূপে জানলে অবিদ্যা দূরীভূত হয় এবং বিদ্যা উৎপন্ন হয়। (ঐ পৃ. ২৫৯)।

১৪। এখানে হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়কে (দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) এবং স্পৃশ্য বিষয়কে যথাযথরূপে জানেন। (দীর্ঘ নিকায় ২য় ভাগ, পৃ. ২৩৯)।

১৫। যা আধ্যাত্মিক (দেহস্থ) বায়ুধাতু এবং যা বাহ্যিক বায়ু ধাতু তা সবই বায়ুধাতু মাত্র। তা আমার নয়, আমি তা নই, ইহা আমার আত্মা নহে — ইহা সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত হতে হবে। (মধ্যম নিকায় ২য় ভাগ, পৃ. ৮৫; ৩য় ভাগ, পৃ. ২৮৪-২৮৫)।

১৬। হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ আর্যসত্য কি? পঞ্চ উপাদানস্কন্ধই দুঃখ। (সংযুক্ত নিকায়, ৩য় ভাগ, পৃ. ৩৭৩)।

১৭। হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ যে আর্যসত্য তা পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। (ঐ পৃ. ৩৮২)

রূপ নিয়ে ভাবনা

চিন্তা বা মন নিয়ে ভাবনা আরম্ভ করার চেয়ে রূপ নিয়ে ভাবনা আরম্ভ করা সহজতর । ১৮ । যিনি শুদ্ধ বিদর্শন-যান অবলম্বন করে ভাবনা করেন তিনি চতুর্ধাতু (পৃথিবী ধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু) নিয়েই ভাবনা করবেন । (বিশুদ্ধিমার্গ, ২য় ভাগ, পৃ. ২২২) ।

১৯ । যা সংমর্শনযোগ্য (ভাবনাযোগ্য) এবং যোগীর নিকট যা সহজে প্রকাশিত হয় এবং সুখে পরিগ্রহ করা যায় তা নিয়েই সংমর্শন (ভাবনা) আরম্ভ করা উচিত । (বিশুদ্ধিমার্গ, ২য় ভাগ, পৃ. ২৪৪)

২০ । প্রথমে প্রকাশিত বিষয়েই বিদর্শন ভাবনা আরম্ভ করা উচিত । তারপর যা সহজে প্রকাশিত হয় না তা প্রকাশিত করে সংমর্শন (ভাবনা) করা কর্তব্য । (বিশুদ্ধিমার্গ মহাটীকা, ২য় ভাগ, পৃ. ৩৯১) ।

অর্থকথা এবং অণু অর্থকথার নির্দেশের উপর নির্ভর করে যোগীদের সুবিধার জন্য এই উপদেশ দেওয়া হয় যে তাঁরা যেন উদরের উঠানামা পর্যবেক্ষণ করে ভাবনা আরম্ভ করেন । যখন সমাধি বর্ধিত হবে তখন ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারে যখন যা উৎপন্ন বিষয়ে যে সকল উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেরূপেও যোগীগণ ভাবনা করে যাবেন ।

ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারে উৎপন্ন বিষয়ে ভাবনা করা

ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারে যে বিষয় উৎপন্ন হয় সে বিষয়েই ভাবনা করতে হবে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোন চিন্তা সংযুক্ত না হয় । ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারের যে কোন দ্বারে যখন যখন যা উৎপন্ন হয় তার উপর নিছক মনঃসংযোগ করে তা উৎপন্ন হচ্ছে রূপে জানতে হবে ।

২১-২৬ । তিনি যেন রূপের প্রতি আবেগ প্রকাশ না করেন । রূপ দর্শন করে তিনি যেন নিরপেক্ষ থাকেন, বিরাগচিন্তে (অনভিরমিত চিন্তে) তা বেদন বা দর্শন করেন এবং রূপের প্রতি যেন অনাসক্ত থাকেন (সংযুক্ত নিকায়, ২য় ভাগ, পৃ. ২২৭) ।

সেরূপ তিনি যেন শব্দের, গন্ধের, রসের, স্পৃশ্য বিষয়ের এবং ধর্মের প্রতি (চিন্তনীয় বিষয়ের প্রতি) আবেগ প্রকাশ না করেন । এ সবার প্রতি নিরপেক্ষ

থাকেন, অভিরমিত চিন্তে তা বেদন না করেন এবং অনাসক্ত থাকেন। (ঐ পৃ. ২৯৪)।

উদরের উঠা নামার উপর ভাবনা করার অর্থ হল বায়ুর গতি এবং বায়ুর চাপকে জানা — ইহা রূপের প্রতি আবেগ প্রকাশ নয়, কেবল মাত্র মনোনিবেশ সহকারে দেখা (অনুভব) মাত্র।

২৭। হে ভিক্ষুগণ! সকলকে (সর্ব বিষয়) পরিপূর্ণরূপে জানতে হবে। সকল (সর্ব বিষয়) কি যা পরিপূর্ণরূপে জানতে হবে? চক্ষুকে পরিপূর্ণরূপে জানতে হবে, চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়কে পরিপূর্ণরূপে জানতে হবে, চক্ষু বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে জানতে হবে, চক্ষু সংস্পর্শকে পরিপূর্ণরূপে জানতে হবে, চক্ষু সংস্পর্শের কারণে যে সুখ-দুঃখ এবং যা সুখও নয় দুঃখও নয় (অদুঃখ-অসুখ বেদনা) বেদনা বেদয়িত হয় (অনুভূত হয়) তাও সম্পূর্ণরূপে জানতে হবে। অনুরূপভাবে শ্রোত্র (কর্ণ) এবং শব্দ...গ্রাণ (নাসিকা) এবং গন্ধ... জিহ্বা এবং রস...কায় এবং স্পৃশ্য...চিহ্ন এবং ধর্ম (চিন্তনীয় বিষয়) ইত্যাদি পরিপূর্ণরূপে জানতে হবে। (সংযুক্ত নিকায়, ২য় ভাগ, পৃ. ২৫৮)।

২৮। হে ভিক্ষুগণ! চক্ষুকে পর্যবেক্ষণ বা ভাবনা করতে হবে। সেরূপ রূপকে.... কায়কে...স্পৃশ্য বিষয়কে মন বা চিহ্নকে.... ধর্মকে (চিন্তনীয় বিষয়) পর্যবেক্ষণ বা ভাবনা করতে হবে। (সংযুক্ত নিকায়)।

সমাধি উৎপত্তি ব্যতীত বিদর্শন ভাবনা করা

পূর্বে (প্রথমে) পূর্ণ সমাধি (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ধ্যান ইত্যাদি) উৎপন্ন না করেও সরাসরি বিদর্শন ভাবনা আরম্ভ করা যায়।

২৯। কোন কোন ব্যক্তি পূর্বে শমথ ধ্যানের উপচার^১ এবং অর্পণা সমাধি উৎপন্ন না করে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে অনিত্য ভাবনা করেন। ইহা (শুদ্ধ) বিদর্শন ভাবনা, (মধ্যম নিকায় অর্থকথা, ১ম ভাগ পৃ. ১১৩)।

অর্থকথার বিবরণ অনুসারে দেখা যায় উপচার সমাধি বা পূর্ণ সমাধি (অর্পণা) লাভ প্রচেষ্টা না করেও বিদর্শন ভাবনা করা যায়।

ইহাও বর্ণিত আছে যে যিনি বিদর্শন যান অনুসরণ করেন তিনি চতুর্ধাতু বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। তদুপরি মহাসতিপট্ঠান সূত্রের ২১ অঙ্গের

মধ্যে আনাপান পদ্ধতি, কায়ের অশুচিতা বিষয়ক এবং শ্মশানে মৃতদেহের নব অশুভ^১ অবস্থা বিষয়ক ভাবনা ব্যতীত অন্য সকল বিষয় (অঙ্গ) আলম্বন করে নিশ্চিত রূপে বিদর্শন ভাবনা সম্ভব। তৎসত্ত্বেও অর্থকথা নির্দেশ করে যে চারি ইর্যাপথ, চার ধাতু ব্যবস্থান ইত্যাদি অঙ্গের ভাবনা দ্বারা উপচার সমাধি লাভ করা যায় এবং তাতে পঞ্চনীবরণ অপসারিত হয়ে চিত্তবিশুদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং ঐ সকল অঙ্গ বিষয়ে ‘বিশুদ্ধিমার্গ’ আলোচনা করতে গিয়ে স্বতন্ত্র এক ‘ধাতু ব্যবস্থান’ অধ্যায়ে ধাতু বিষয়ে বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে — যখন চতুর্ধাতু বিষয়ে ভাবনা করা হয় তখন পঞ্চনীবরণ অন্তর্মিত হয়ে উপচার সমাধি লাভ হয়। অর্থকথায় এই বিবরণের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে এক ধাতু, দুই ধাতু, তিন ধাতু বা ধাতু বিষয়ে ভাবনা করলে উপচার ভাবনা উৎপন্ন করা সম্ভব এবং তাতে পঞ্চনীবরণ অতিক্রম করে চিত্তবিশুদ্ধি লাভ করা যায়।

উপচার সমাধি মাধ্যমে চিত্তবিশুদ্ধি লাভ

৩০। উপচার সমাধি এবং অর্পণা সমাধিকে চিত্তবিশুদ্ধি বলা হয়। (অভিধমার্থ সংগ্রহ)।

৩১। উপচারসহ অষ্ট সমাপত্তিই চিত্তবিশুদ্ধি (বিশুদ্ধিমার্গ, ২য় ভাগ, পৃ. ২২২)।

৩২। উপচার সমাধি পূর্ণ সমাধির (অর্পণা সমাধি) ন্যায় বিদর্শন ভাবনা এবং চিত্তবিশুদ্ধির ভিত্তি। (বিশুদ্ধিমার্গ অর্থকথা, ২য় ভাগ, পৃ. ৩৫০)।

বিশুদ্ধিমার্গ এবং মহাটীকা (অর্থকথা) অনুসারে সুস্পষ্টরূপে জানা হল যে উপচার সমাধিও চিত্তবিশুদ্ধি।

৩৩। যখন পৃথগ্জন^১ এবং শেখ^২ ‘অষ্ট সমাপত্তির যে কোন এক ধ্যান থেকে উঠে সমাহিত চিন্তে বিদর্শন ভাবনা করব’ এই ভেবে চিন্তা সমাহিত করেন তবে তাঁর সেই সমাহিত চিন্তা বিদর্শন ভাবনার ক্ষেত্রে প্রধান সহায় হয়, যেমন উপচার সমাধি চিন্তের বাধা (জটিলতা) অতিক্রম করে (বিদর্শন ভাবনার) উন্মুক্ত অবস্থায় গমনের সুযোগ করে দেয় (পৌছে দেয়)। (বিশুদ্ধিমার্গ, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৬৮)।

৩৪। মহাটীকা উক্ত বিষয়ের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করে :

উন্মুক্ত অবস্থায় গমন (বা পৌছে দেয়) অর্থে নবম সুযোগ প্রাপ্তি অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনকালে মার্গ, ফল, নির্বাণ লাভে সুযোগ বুঝায়। ইহাকে আরও একটু ব্যাখ্যা করলে এরূপ দাঁড়ায় — বুদ্ধের ধর্ম-প্রবর্তন কাল দর্শন অতি দুর্লভ। সংসার ভীত ব্যক্তি সংসার দুঃখ থেকে বিমুক্তির জন্য চিন্তের পূর্ণ সমাধি লাভের প্রতীক্ষা না করে উপচার সমাধি উৎপন্ন করে বিদর্শন ভাবনা আরম্ভ করেন। (বিশুদ্ধিমার্গ টীকা বা অর্থকথা, ১ম ভাগ, পৃ. ৪৫৯)।

৩৫। হে কোট্ঠিত! শীলবান ভিক্ষু পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ^৩ অনিত্য, দুঃখ রূপ, প্রবঞ্চক, শৈল্য, বেদনাময়, পীড়া এবং আগন্তুক আরোপ করে অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মার মনঃসংযোগ করে ভাবনা করেন।

হে কোট্ঠিত! স্রোতাপন্ন, সচ্ছাদাগামী, অনাগামীরাও এই পদ্ধতিতে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের ভাবনা করেন।

হে কোট্ঠিত! যে শীলবান ভিক্ষু পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম আরোপ করে চিন্তা সংযোগ ভাবনা করেন তিনি স্রোতাপত্তি ফল, সচ্ছাদাগামী ফল, অনাগামী ফল এবং অর্হত্ব ফল লাভ করবেন। (সংযুক্ত নিকায়, ২য় ভাগ, পৃ. ১৩৬)।

সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, যে শীলবান ভিক্ষু পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম আরোপ করে ভাবনা করেন এবং তার ফলস্বরূপ

১. পৃথগ্জন অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ ও মোহগ্রস্ত সাধারণ মানুষ।

২. এখনও যাঁদের শিক্ষণীয় আছে অর্থাৎ স্রোতাপন্ন, সচ্ছাদাগামী ও অনাগামী।

৩. রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান উপাদানস্কন্ধ।

তিনি ক্রমস্তরে স্রোতাপত্তি ফল, স্কৃদাগামী ফল, অনাগামী ফল লাভ করেন। উদরের উত্থান-পতন নিয়ে ভাবনা রূপস্কন্ধের বায়ুধাতুর ভাবনার অন্তর্গত। সুতরাং উদরের উত্থান-পতন গতির উপর চিন্তা সংযোগ করে ভাবনা করা এবং ষড়ইন্দ্রিয় দ্বারে উৎপন্ন পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের ভাবনা করা প্রকৃত এবং যথার্থ বিদর্শন পদ্ধতি যা দ্বারা অর্হত্ব ফল উপলব্ধি করা সম্ভব।

পরিশেষে একটি বিশেষ বিষয়ে যোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে তা হল — দেহের যে কোন অংশের রূপ নিয়ে ভাবনা করা এবং দেহের যে কোন অংশের বায়ুধাতু নিয়ে ভাবনা করা উভয়ই উত্তম ও সঠিক পথ।

১০ই অক্টোবর ১৯৭০ ইং

মহাসী সেয়াদ
(ভদন্ত শোভন অগ্গমহাপণ্ডিত)

সমাণ্ড

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন (চতুর্থ খণ্ড)

পরম পূজ্য বিদর্শনাচার্য মহাসী সেয়াদ প্রণীত
The Progress of Insight
পুস্তকের অনুবাদ

অনুবাদক
শ্রী সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া

VIDARASHAN BHAVANA ANUSHILAN

(Part IV)

SUBHUTIRANJAN BARUA

প্রথম প্রকাশ : মাঘী পূর্ণিমা, ২৫৩০ বুদ্ধাব্দ, ১৩৯৩ সন

অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রীতিরঞ্জন বড়ুয়া

১৯, ইডেন হাসপাতাল রোড, কলিকাতা-৭৩

দ্বিতীয় প্রকাশ : বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২০১০

প্রকাশনায় : বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ

প্রাপ্তিস্থান

- ১। ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
৭/১৭, পোদ্দার নগর, পোঃ যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৭০০০৬
- ২। শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার
১ বুডিডষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলি-৭০০০০১২
- ৩। ন্যাশনাল বুক সপ
২১ কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭০০০৭৩
- ৪। মহাবোধি বুক এজেন্সি
৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭০০০৭৩
- ৫। শ্রীমতী পারমিতা বড়ুয়া
৩২, গ্রীণপার্ক, কলিকাতা-৭০০০৫৫

উৎসর্গ

পরম কল্যাণমিত্র প্রবর বিশ্বখ্যাত বিদর্শনাচার্য
অনাগারিক মুণীন্দ্রজীর করকমলে শ্রদ্ধার্ঘ্য ।

ইতি
শ্রী সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া

ভূমিকা

ভগবান বুদ্ধ দুঃখবিমুক্ত হয়ে জগতে মুক্তি মার্গ উপহার দিয়ে গেছেন। বুদ্ধের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে পরিব্রাজক সুভদ্র এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘ভারতের ছয় ধর্ম-প্রবক্তার নিকট আমি গমন করেছি। তাঁরা বলেছেন তাঁরা সকলেই বিমুক্ত। সত্যই কি তাঁরা বিমুক্ত, না কেহ কেহ বিমুক্ত, কেহ কেহ বিমুক্ত নন?’ এর উত্তরে ভগবান সংক্ষেপে এরূপ বলেছেন, ‘সুভদ্র যে ধর্মে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নেই, সে ধর্মে দুঃখবিমুক্তিও নেই’। অতঃপর সুভদ্র আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনে বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ব লাভ করেন। এই ‘সুভদ্রই’ ভগবানের অন্তিম অর্হত শিষ্য। তাঁর জীবিতকালে অসংখ্য মানুষ এ-মার্গ অবলম্বনে বিমুক্তি লাভ করেছেন। তখন থেকে প্রবাহিত সে ধারা আজও বর্তমান রয়েছে।

ভগবান একবার ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে বলেন, ‘ভিক্ষুগণ! আমি এবং তোমরা অসংখ্য কল্প ভবদুঃখ ভোগ করেছি। এখন আমি এবং তোমরা। সর্বদুঃখ মুক্ত।’ ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনের প্রত্যক্ষ ফল। বিদর্শন ভাবনা করাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনে জীবন নির্বাহ।

বিদর্শন বা প্রজ্ঞা ভাবনায় যোগী সপ্ত বিশুদ্ধি এবং ষোড়শ জ্ঞানস্তর উপলব্ধির মাধ্যমে বিমুক্তি লাভ করেন। বিমুক্তি সোপানারূঢ় শ্রোতাপন্ন, সঙ্কদাগামী, অনাগামীগণ তাঁদের সোপানারূঢ় অবস্থা পরিজ্ঞাত হন। ফলসমাপত্তি ধ্যান দ্বারা তাঁরা নিজের অবস্থা পরখ করতে পারেন। অর্হতগণ আস্রবক্ষয় জ্ঞান দ্বারা তাঁদের অর্হত প্রাপ্তি বিষয়ে নিশ্চিত হন। তাঁরা আরও জ্ঞাত হন — ‘আমি বিমুক্ত হয়েছি, আমার করণীয় কর্মের অবসান হয়েছে, আর করণীয় কিছু নেই, আমার পুনর্ভবও পরিশেষ হয়েছে।’ ইহা ক্ষীণবীজ অর্হতের অবস্থা। ইহা সাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তির অগম্য, অবোধ্য, জ্ঞানাভীত, ধারণাভীত সংসার সংগ্রাম বিজয়।

ভগবান বুদ্ধের ধর্ম ক্রমোন্নততর। ইহা আদি কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময় এবং অন্তিম কল্যাণময়। ইহা যথাক্রমে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞাকে নির্দেশ করে।

শীল

ভিক্ষু-বিনয় (শীল) ভিক্ষুদের পালনীয়। দশশীল শ্রামণদের পালনীয়। পঞ্চ, অষ্ট ও দশ সুচরিত্র শীল গৃহীদের পালনীয়। শীল ব্যক্তিকে কল্যাণময় পথে চালিত করে। ইহা আদি কল্যাণ।

বুদ্ধ দেশনার কল্যাণকর বা কুশল কর্ম হল — দান, শীল, ভাবনা, অপচায়ন (গুণী এবং বয়োজেষ্ঠ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন), বৈয়াবৃত্ত (সেবা, পরিচর্যা, দেশ ও দেশের হিত সাধন), পুণ্যদান, পুণ্যানুমোদন, ধর্মশ্রবণ, ধর্মোপদেশ দান এবং দৃষ্টি ঋজু কর্ম (কর্ম ও তার ফলের প্রতি বিশ্বাস)। অরূপ কুশলকর্ম সম্পাদনরূপ শান্ত সুন্দর জীবন যাপনে ব্যক্তি ভয়ত্রাসহীন হয়, জনগণের প্রিয়পাত্র, বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র হয়।

সমাধি

সমাধি ভাবনাই মধ্য কল্যাণ। কর্মস্থানরূপ ধ্যেয় বিষয়ে চিন্তা স্থির, একাগ্র, সমাহিত হলে সমাধি লাভ হয়। যোগী ধ্যানগভীরতায় ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যান লাভ করেন। পঞ্চমধ্যান লাভী যোগী চিন্তকে ঋদ্ধি উৎপত্তি প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করলে পঞ্চঋদ্ধি লাভ হয়। তা যথা : ১. পূর্বনিবাস জ্ঞান (পূর্ব অসংখ্য জন্ম বিষয় স্মরণ) ২. দিব্যচক্ষু (স্বর্গ, নরক, অন্যান্য দূর দর্শন) ৩. দিব্যকর্ণ (দেব, ব্রহ্মশব্দ, অন্যান্য দূরশ্রবণ) ৪. পরচিন্তা জ্ঞান (অন্যের চিন্তা বিষয় জানা) ৫. চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান (কুশল-অকুশল কর্ম প্রভাবে জীবের জন্ম এবং উৎপত্তি নিরূপণ)। আবরণহীন চিন্তের এ জ্ঞানলাভ সম্ভব। ধ্যানীগণ এ পাঁচ ধ্যানের প্রথম, মধ্যম, উত্তম ক্রম অনুসারে ষোল প্রকার রূপ (আকার) ব্রহ্মলোকের সেই সেই স্তরে মৃত্যুর পর উৎপন্ন হন এবং সুদীর্ঘকাল ধ্যানসুখগত হয়ে ব্রহ্ম-জীবন যাপন করেন।

অরূপ (নিরাকার) সমাধি লাভও মধ্য কল্যাণ। রূপসমাধি (ধ্যান) লাভীর চার ক্রমোন্নত অরূপ সমাধি লাভের অধিকার হয়। রূপে বীতস্পৃহ ব্যক্তিই অরূপ ভাবনা করেন। এ চার অরূপ ব্রহ্মলোকে তাঁরা অতি দীর্ঘকাল উপেক্ষা চেতনায় অবস্থান করেন। রূপব্রহ্মলোক থেকে চ্যুতির পর তাঁদের আবার

কর্মানুযায়ী সংসারাবর্তন আরম্ভ হয়। দেহহীন চিত্তস্থিতিতেই তাঁদের অবস্থান। মুক্তিকামীর ইহাও কাম্য নয়।

কামলোকই (চার অপায়, এক মনুষ্যলোক, ছয় দেবলোক) কামভব। ষোল রূপব্রহ্মলোকই রূপভব। চার অরূপব্রহ্মলোকই অরূপভব। ভব অর্থে উৎপত্তিকে বুঝায়। উৎপত্তি হলেই চ্যুতি বা ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তিকামী ভবদুঃখরূপ আবর্তন-বিবর্তন পরিহার করেন।

প্রজ্ঞা

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, ‘শীল পালনে সমাধি লাভ হয়, সমাধি লাভ হলে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়।’ প্রজ্ঞালোকই অন্তিম কল্যাণ। এক একটি কল্যাণ পরবর্তী কল্যাণের পরিপূরক। যোগী শীল ও সমাধি পূর্ণ করে অন্তিম কল্যাণ প্রজ্ঞাভাবনা বা বিদর্শন ভাবনা করতে পারেন। আবার শীল পরিপূর্ণ করেও প্রজ্ঞা বা বিদর্শন ভাবনা করতে পারেন। উভয় প্রকারেই নির্বাণ লক্ষ্যে পৌছান যায়।

‘বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন’ পুস্তকের ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ডে অনুশীলন পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ পুস্তকে (৪র্থ খণ্ডে) সপ্ত বিশুদ্ধির কোন বিশুদ্ধিতে কোন কোন জ্ঞানস্তর পরিস্ফুট হয় তা বর্ণিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক যোগী এ সকল বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানস্তর লাভ করে দুঃখ নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন ব্যতীত বিমুক্তিমার্গের আর কোন পথ নেই। তাই ভগবান বুদ্ধ ইহাকে একায়ন মার্গরূপে আখ্যা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন — একান্ত নিরবচ্ছিন্ন, সজাগ, সতর্ক, সজ্ঞান, আকাঙ্ক্ষাহীন ভাবনা অনুশীলন।

বিদর্শন ভাবনার মূল কথা হল — প্রতি মুহূর্তে আমাদের কায়-বাক্য-মনোকর্মকে তথা দর্শন, শ্রবণ, আত্মাণন, আত্মদান, স্পর্শন এবং মননকে লোভ-দ্বेष-মোহমুক্ত করা। স্মৃতিময় জীবন যাপনেই ইহা সম্ভব নয়। স্মৃতিহীন জীবন যাপনের দরুন (বা মোহ বা অজ্ঞানতা বশতঃ) আমরা প্রতিনিয়ত লোভ ও দ্বেষ উৎপন্ন করি এবং তৃষ্ণার বশীভূত হই। তাই জগতকে আমরা নিত্য, সুখময়, আত্মময় মনে করি। এভাবেই আমরা ভব-আবর্তে আবদ্ধ হই-অন্য কোন শক্তি আমাদের এরূপ দুঃখবন্ধনে আবদ্ধ করে না। পুরুষকার দ্বারা ভাবনা মাধ্যমে আমরা সকল বন্ধন মুক্ত হতে পারি। আমাদের অশুভ, কলুষ নিরসনের অন্য কেহ নেই। যে মুহূর্তে সাধারণত চিন্তে জগতের প্রতি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হবে সে মুহূর্তেই অচ্যুত, অমৃতপদ নির্বাণ প্রত্যক্ষ হবে। ইহাই যোগীর নির্বাণ প্রাপ্তিরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান, নির্বাণ দর্শন, দুঃখবন্ধন পরিসমাপ্তি। এ অবস্থায় যোগীর চিত্ত কিছুতেই

আবদ্ধ থাকে না। ইহা বুদ্ধের বোধিলাভ সঞ্জাত প্রজ্ঞা। তাঁর অসংখ্য শিষ্য এই পথে নির্বাণ অধিগম করে জীবনমুক্ত হয়েছেন।

সদ্ধর্মপ্রাণ সাধিকা শ্রীমতী শান্তি দেবী (কলিকাতা) তাঁর প্রয়াত স্বামী বীরেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়ার পারলৌকিক সুখ ও শান্তি কামনার এ পুস্তক প্রকাশনের নিমিত্ত ৮০০ টাকা মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করেছেন। স্নেহভাজন শ্রীবনবিহারী বড়ুয়া (গুরাচাঁদ, ত্রিপুরা) এবং শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া (টালিগঞ্জ, কলিকাতা) যথাক্রমে ১২৫ টাকা এবং ১০০ টাকা এ পুস্তক মুদ্রণের জন্য শ্রদ্ধাদান করেছেন। তাঁদের এ কল্যাণমূলক কর্মে সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতাবদ্ধ। আমি তাঁদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। সর্বজীব সুখী হোক, নির্বাণের দিকে অগ্রসর হোক।

মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৯৩ বাং

১৩.২.৮৭ ইং

২৫৩০ বুদ্ধাব্দ

শ্রী সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া

৩২ গ্রীনপার্ক, কলিকাতা-৫৫

বিশুদ্ধি-জ্ঞান-কথা

অবতারণা

ধর্মরশ্মি জাল বিস্তারকারী সেই সর্বজ্ঞ মহাঋষিকে জানাই বন্দনা। তাঁর প্রকাশিত সত্যধর্ম এবং ধর্মরশ্মি চিরকাল জগতে অমিত জ্যোতি বিকিরণ করে মানব জাতির মঙ্গল সাধন করুক।

এ পুস্তকে বিদর্শন জ্ঞানের অগ্রগতি এবং অনুরূপ চিন্তা বিশুদ্ধির স্তরগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। যে সকল যোগী ভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে বিশেষ ফল (জ্ঞান) লাভ করেছেন, তাঁদের কল্যাণার্থে সংক্ষেপে বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে, যাতে তাঁরা ভাবনা লব্ধ অভিজ্ঞতা সহজে অনুধাবন করতে পারেন। বিদর্শন ভাবনানুশীলনে যাঁরা দেহের ‘বায়ুস্পর্শ গতি’ যেমন উদরের উঠা-নামা (উত্থান-পতন) রূপ সুস্পষ্ট পরিবর্তনকে অথবা যাঁরা তিন মৌলিক ধাতু^১ নির্ভর কায়িক (দৈহিক) কার্যপ্রক্রিয়ারূপ স্পর্শ, যেমন প্রত্যক্ষ স্পর্শানুভূতিকে মূল ভাবনা বিষয়রূপে অবলম্বন করে ভাবনা করেছেন তাঁদের কথা মনে রেখে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। যাঁরা এ অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং ষড়্‌ইন্দ্রিয়দ্বারে সংঘটিত সকল কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া^২ পর্যবেক্ষণ (প্রত্যবেক্ষণ বা অনুধাবন) করে বিদর্শন ভাবনায় অগ্রগতি লাভ করেছেন এবং পরিণামে ধর্ম (নির্বাণ) দর্শন (সাক্ষাৎ) করেছেন, ধর্মে অধিষ্ঠিত (ধর্মপ্রাপ্ত) হয়েছেন, ধর্ম জ্ঞাত (বিদিত) হয়েছেন, ধর্মে প্রবেশ করেছেন (অবগাহন করেছেন), সন্দেহমুক্ত হয়েছেন, অনিশ্চয়তা মুক্ত হয়েছেন, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং শাস্তা-শাসনে অপর-প্রত্যয় লাভ করেছেন (স্বয়ং ধর্ম প্রত্যক্ষ করে স্রোতাপন্ন হয়েছেন) তাঁদের উদ্দেশ্যে এ পুস্তক রচিত হয়েছে।

১. পৃথিবী ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু

২. নাম-রূপ

প্রথম-শীল-বিশুদ্ধি (Purification of Conduct)

এখানে শীল-বিশুদ্ধি বলতে বুঝাচ্ছে : ধর্মপ্রাণ নরনারীর (উপাসক-উপাসিকার) শীল গ্রহণ (পঞ্চশীল^৩ অষ্টশীল^৪ বা দশশীল^৫) এবং তা সম্যক প্রতিপালন এবং সংরক্ষণ ।

ভিক্ষুসংঘের শীল বিশুদ্ধি বলতে বোঝায় চতুর্বিধ প্রাতিমোক্ষ সংবর (সংযম) শীল সুপরিশুদ্ধভাবে প্রতিপালন এবং সংরক্ষণ । তার মধ্যে^৬ প্রাতিমোক্ষ সংবর শীলই প্রধান । কেবলমাত্র যখন সেই সংবর শীল পরিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হয় তখনই ভিক্ষু ভাবনা চর্যায় অগ্রগতি লাভে সমর্থ হন ।

সংক্ষিপ্ত বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন পদ্ধতি

ভাবনা পদ্ধতি দুই প্রকার, যথা: শমথ ভাবনা (সমাধি) এবং বিদর্শন ভাবনা । যিনি এ দুই ভাবনার প্রথমটা অর্থাৎ শমথ ভাবনা অনুশীলন করে উপচার এবং অর্পণা সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারপর পঞ্চস্কন্ধকে ভাবনার অবলম্বন (ধ্যয় বিষয়) করে ভাবনা করেন তাঁকে শমথ যানিক সাধক বলা হয় । অর্থাৎ তিনি শমথ ভাবনাকে মূখ্য ভাবনা অবলম্বন বা যান রূপে গ্রহণ করেছেন ।

সাধকের বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে মধ্যম নিকায়স্থিত ধর্মদায়াদ সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পপঞ্চসূদনীতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে : ‘এখানে কোন ব্যক্তি প্রথমত: উপচার’ বা অর্পণা^২ সমাধি উৎপন্ন করেন — ইহা শমথ ভাবনা (ইহা একাগ্রতা প্রসূত চিন্তা শান্তিকর সমাধি) । তিনি যখন সেই শমথ সমাধিতে এবং তৎসংযুক্ত চৈতসিক ধর্মে বিদর্শন আরোপ করেন (অর্থাৎ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে) ভাবনা করেন — ইহা বিদর্শন ভাবনা ।’ এ সম্বন্ধে বিশুদ্ধিমার্গে এরূপ উক্ত হয়েছে : ‘যাঁর যান

৩. প্রাণীহত্যা, চুরি, অবৈধ কামচর্চা, মিথ্যা ভাষণ এবং নেশাদ্রব্য পান থেকে বিরত থাকা ।

৪. প্রাণীহত্যা না করা, চুরি না করা, কামচর্চা সম্পূর্ণ বর্জন করা, মিথ্যা কথা না বলা, নেশাদ্রব্য পান না করা, নৃত্য-গীত-বাদ্য-উৎসব ও অভিনয়ানুষ্ঠান দর্শন ও যোগদান না করা, অলঙ্কার ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহার না করা, উচ্চ এবং বিলাসশয্যা ব্যবহার না করা ।

৫. অষ্টশীলগুলি পালন এবং স্বর্ণ-রৌপ্য এবং টাকা পয়সা স্পর্শ ও গ্রহণ না করা ।

৬. অপর তিনটি হল: ইন্দ্রিয় সংযম, আহার বিশুদ্ধতা এবং ব্যবহার্য দ্রব্য বিশুদ্ধতা ।

শমথ ভাবনা (যিনি শমথ ভাবনার মাধ্যমে বিদর্শন ভাবনা করেন) তিনি প্রথমতঃ নসংজ্ঞা-নঅসংজ্ঞা ধ্যান ব্যতীত রূপ° বা অরূপ° ধ্যান থেকে ওঠেন এবং তারপর ধ্যানাঙ্গগুলি যথা : বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা প্রভৃতিতে এবং তৎসংযুক্ত চৈতসিক ধর্মে লক্ষণ-রসবশে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মরূপে ভাবনা করেন।'

যিনি উপচার অথবা অর্পণা সমাধি উৎপন্ন করেন না (বা করেননি) অথচ ভাবনা শুরু থেকেই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পঞ্চক্ষণের উপর বিদর্শন আরোপ করে (বা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দেখে) ভাবনা করেন তাঁকে শুদ্ধ বিদর্শন যানিক (ধ্যানী বা সূক্ষ্ম বিদর্শন ধ্যানী) বলা হয় — অর্থাৎ তিনি শুদ্ধ বিদর্শন মার্গই অবলম্বন করেছেন। শুদ্ধ বিদর্শন ভাবনা পদ্ধতি বিষয়ে ধর্মদায়াদ সূত্রের অর্থকথায় বলা হয়েছে : 'আর একপ্রকার ব্যক্তি আছেন যিনি শমথ সমাধি উৎপন্ন না করে পঞ্চক্ষণে বিদর্শন আরোপ করে অনিত্য দুঃখ, অনাত্ম ইত্যাদি দর্শন করে ভাবনা করেন।'

বিশুদ্ধিমার্গেও এরূপ বলা হয়েছে : 'শুদ্ধ বিদর্শন যাঁর যান (বা পথ) তিনি চার ধাতু (পৃথিবী-ধাতু, অপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু) বিষয়ে ভাবনা করেন।'

নিদানবর্গ সংযুক্তের সুষীম পরিব্রাজক সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন : 'হে সুষীম! প্রথমতঃ ধর্ম-স্থিতি-জ্ঞান এবং পরে নির্বাণ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।'

যখন যোগীর শীল-বিশুদ্ধি পরিপূর্ণ হয় তখন তিনি শুদ্ধ বিদর্শন যান অবলম্বন করে 'নাম-রূপ' বিষয়ে ভাবনা আরম্ভ করেন। এরূপ ভাবনানুশীলনকালে তিনি

১. উপচার সমাধি : সমাধির এমন অবস্থা যা এখনও পূর্ণ সমাধিতে পরিণত হয়নি বা প্রথম ধ্যান রূপান্তরিত হয়নি, এখনও কামাবচর চিত্তে রয়ে গেছে।

২. অর্পণা সমাধি : প্রথম ধ্যানে বা রূপাবচর ধ্যানে পরিণত হয়েছে।

৩. রূপাবচর বা রূপধ্যান : শমথ ধ্যানের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্যান বা পূর্ণ সমাধি। ধ্যানাঙ্গ যথা : বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা প্রথম ধ্যানে এই পাঁচটি ধ্যানাঙ্গ থাকে, দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক চলে গিয়ে অপর চারটি থাকে। তৃতীয় ধ্যানে বিচারও চলে গিয়ে অপর তিনটি থাকে, চতুর্থ ধ্যানে প্রীতিও চলে গিয়ে অপর দুইটি থাকে এবং পঞ্চম ধ্যানে উপেক্ষা সহগত একাগ্রতা থাকে।

৪. অরূপাবচর বা অরূপধ্যান : এ ধ্যান চারটি যথা: আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চনায়তন এবং ন-সংজ্ঞা ন-অসংজ্ঞায়তন। শমথ সমাধির পঞ্চম ধ্যান লাভ করার পর এগুলি পর পর লাভ করা যায়। ইহা লৌকিক সর্বশেষ ধ্যান অবস্থা।

পঞ্চকক্ষের স্বভাব এবং কার্য (লক্ষণ-রস) অর্থাৎ কায়িক-মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যখন যা এই জীবন প্রবাহকালে তাঁর নিকট প্রকট হয় (অর্থাৎ ষড়-ইন্দ্রিয়দ্বারে উপস্থিত হয়) তখন তা নিয়ে ভাবনা করেন।

মোটের উপর কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া অর্থাৎ ষড়-ইন্দ্রিয়দ্বারে যা প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হয় তাদের বিশেষ^১ এবং সাধারণ^২ লক্ষণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ ষড়-ইন্দ্রিয়দ্বারে নিরন্তর স্পষ্ট উৎপন্ন কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া প্রভৃতির অনুসরণ এবং স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ কঠিন মনে হয়। নূতন যোগী প্রথমে কায়দ্বারে আগত স্পষ্ট কায়িক স্পর্শানুভূতির স্পর্শক্রিয়া সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন, কারণ বিশুদ্ধিমার্গে বলা হয়েছে : বিদর্শন ভাবনায় স্পষ্ট অনুভূত বিষয় নিয়েই ভাবনা করা উচিত। উপবেশন করে ভাবনাকালে, উপবেশন অবস্থার মাধ্যমে যে স্পর্শ অনুভূত হয় এবং সে স্পর্শ দেহে স্পর্শানুভূতি জাগ্রত করে। এরূপ স্পর্শানুভূতির কার্যপ্রক্রিয়া এভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত : ‘বসেছি-স্পর্শ হচ্ছে’, ... ইত্যাদি নাম অনুসারে (পর পর) পর্যবেক্ষণ করবেন। তারপর উপবেশনরত যোগীর উদরে, কায়িক গতিরূপ স্পর্শ প্রক্রিয়া (বায়ু, গতিশীল ধাতু) যা শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ভর তাতে উদরের উন্মন্ন-অবনমন (উত্থান-পতন) নিরন্তর অনুভূত হয়। তাও ‘উঠছে-নামছে’ মনে মনে ধারণা করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে... ইত্যাদি। যখন যোগী এরূপ পর্যবেক্ষণরত তখন বায়ুধাতু উদরের দেহদ্বারে ক্রমাগত স্পর্শানুভূতি জাগায় এবং তা (বায়ুধাতুর) স্তম্ভনতা (দৃঢ়ভাব), চলন, ধাক্কা এবং টান প্রভৃতি ক্রিয়া স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এখানে (বায়ুর) স্তম্ভনকে বায়ুধাতুর সমর্থন লক্ষণ, চলনকে বিশেষ গতিক্রিয়া, ধাক্কা এবং টানকে কার্যকারিতার প্রকাশরূপে লক্ষিত হয়।

যেহেতু যোগী উদরের দৈহিক স্পর্শক্রিয়ার উত্থান-পতন পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দৈহিক কার্যপ্রক্রিয়া অর্থাৎ বায়ুধাতুর প্রকৃতিগত লক্ষণকে জানার কাজও সম্পন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে যখন তিনি চিন্ত বা মনকে অনুধাবন করেন এবং দেহ ও মন উভয়কেও অনুধাবন করেন তখন তিনি দেহ-মন কার্যপ্রক্রিয়ার সাধারণ লক্ষণ যথা : এসবের অনিত্যতা, দুঃখময়তা এবং অনাত্মতাও পরিজ্ঞাত হবেন। যখন তিনি উদরের উত্থান-পতন বা অন্যান্য (ষড়-ইন্দ্রিয়ের) স্পর্শানুভূতি ক্রিয়া

১. বিশেষ লক্ষণ : প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা যা জানা যায়; যেমন বায়ুধাতুর সমর্থন, স্তম্ভন লক্ষণ ও গতিশীলতা রূপ কার্য।

২. সাধারণ লক্ষণ : বায়ুধাতুর অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম স্বভাব অনুমান জ্ঞান দ্বারা জানা।

পর্যবেক্ষণে নিরত থাকবেন, তখন তাঁর নিকট লোভ চিন্তা, সুখানুভূতি ইত্যাদি অথবা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পরিবর্তন ক্রিয়া উপস্থিত হবে। এ সময়ে দেহ-মনের সকল কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা নিতান্ত দরকার। এগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি পুনরায় উদরের উত্থান-পতন (উঠা-নামা) রূপ স্পর্শ প্রক্রিয়ায় নিরন্তর পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভাবনা করবেন। কারণ এই ভাবনানুশীলনে তাহাই স্মৃতি-উৎপাদনের মৌল ভাবনা অবলম্বন বা বিষয়।

ইহা যথারীতি অনুশীলন পুস্তকের ১ম, ২য় ও তয় খণ্ড পুস্তকে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুস্তকে বিশুদ্ধি স্তরের মাধ্যমে বিদর্শন ভাবনার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা রয়েছে।

দ্বিতীয়—চিন্তা-বিশুদ্ধি (Purification of mind)

নিয়মিত ভাবনা অনুশীলনকালে যোগীর মন বা চিন্তা বিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইন্দ্রিয় বাসনারূপ বহির্চিন্তা মনে উদয় হয় এবং তা ভাবনা বিষয়ক পর্যবেক্ষণের মাঝে মাঝে উৎপন্ন হয়। নূতন যোগী কোন কোন সময় এরূপ ঘটনার বিষয় (এসব বাধাগুলির বিষয়) বুঝতে পারেন, আবার কোন কোন সময় বুঝতে পারেন না। কিন্তু যখন বুঝতে পারেন তখন এসকল ঘটনা উৎপত্তির পর কিছু সময় অতীত হয়ে যায়। কারণ তখনও তাঁর ক্ষণিক একাক্ষতা ক্ষীণ এবং দুর্বল। সুতরাং এ সকল বিক্ষিপ্ত চিন্তা ভাবনারত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ কার্য বৃদ্ধি অনুশীলনকালে চিন্তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য এসকল বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে বাধাদানকারী (বা নীবরণ) চিন্তা বলা হয়।

যখন অবশ্য তাঁর মনের একাক্ষতা প্রবল হয় তখন চিন্তাক্রিয়ারূপ পর্যবেক্ষণ অধিক একাক্ষতা লাভ করে। সুতরাং তখন পর্যবেক্ষণীয় বিষয়ে মনঃসংযোগ করলে অর্থাৎ উদরের উঠানামা বা উত্থান-পতন, উপবেশন, স্পর্শন, নমন, বাড়ান, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি — তখন যোগীর মনে হয় তাঁর পর্যবেক্ষণশীল মন সকল বিষয়ের প্রতি নিবিষ্ট হচ্ছে, আঘাত করছে, বার বার সম্মুখীন হচ্ছে, তখন সাধারণতঃ তাঁর মন অন্যত্র গমন করে না। কখনও কখনও তাঁর মন সামান্য এদিক-ওদিক গমন করলেও তিনি ঐ সকল বিপথগামী চিন্তাকে উৎপন্ন হওয়া মাত্রই পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হন। অর্থাৎ বিপথগামী চিন্তাকে উৎপত্তির পরক্ষণেই পর্যবেক্ষণ করেন। তখন সেই বিপথগামী চিন্তা পর্যবেক্ষণ মাত্রই অন্তর্হিত হয় এবং তা পুনর্বার উৎপন্ন হয় না। তার পরক্ষণেই তিনি তাঁর নিকট প্রতিভাত অপার বিষয়ের প্রতি নিরন্তর পর্যবেক্ষণ কার্য আরম্ভ করতে সক্ষম হন। সে কারণে তখন তাঁর মনকে বাধাহীন বা নীবরণহীন মন বলা হয়।

যখন তিনি এরূপ নীবরণহীন মন দিয়ে বিষয় পর্যবেক্ষণ অনুশীলন করতে থাকেন তখন পর্যবেক্ষণশীল মন যে কোন পর্যবেক্ষণীয় বিষয়ের নিকটতর হয়, বিষয়ে আরোপিত হয়, তাই পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া ছেদহীনভাবে চলতে থাকে। সেই সময় তাঁর নিকট এতক্ষণস্থায়ী ক্ষণিক সমাধি বা একাগ্রতা ক্রম পরস্পারাক্রমে উৎপন্ন হয় এবং তা প্রত্যেক উৎপন্ন বিষয়ের প্রতি আরোপিত হয় (অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ সমর্থ হয়)। ইহাকে চিন্ত-বিশুদ্ধি বলা হয়।

যদিও সেই সমাধি একক্ষণস্থায়ী, তবুও ইহার প্রতিপক্ষ দ্বারা অভিভূত (বা পর্যুদস্ত) না হওয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা উপচার সমাধির সমতুল্য।

বিশুদ্ধিমার্গের ‘আনপান বর্ণনা’ অধ্যায়ের অর্থকথায় এ সম্বন্ধে এরূপ উল্লিখিত হয়েছে : ‘ক্ষণিক-চিন্ত-একাগ্রতাই ক্ষণমাত্রাঙ্কিত সমাধি।’ একাগ্রতা বিষয়ে (বা ভাবনা আরম্ভে বা অবলম্বনে যখন বাধাহীনভাবে ইহা পর্যবেক্ষণীয় বিষয়ে একাকারে নিরন্তর প্রবর্তিত হয়, তখন ইহা প্রতিপক্ষ (বিষয়) দ্বারা অভিভূত হয় না, বরং মনকে নিশ্চল অবস্থায় বদ্ধ করে, যেন ইহা তন্ময় ভাব বা সমাধি।

‘ইহা পর্যবেক্ষণীয় বিষয়ে নিরন্তর প্রবর্তিত হয়’, অর্থে বিষয়কে (বা অবলম্বনকে) বাধাহীনভাবে নিরন্তর পর্যবেক্ষণকে বুঝায় অর্থাৎ একটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করার পর অপর উৎপন্ন বিষয়ও পর্যবেক্ষণ করেন এবং একই প্রণালীতে অন্যটিও যা পরক্ষণে উৎপন্ন হয় তাও পর্যবেক্ষণ করেন; আবার সেটা পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি পরবর্তী উৎপন্ন বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

‘একাকারে’ অর্থে যদিও পর্যবেক্ষণীয় বিষয় নিজেরাই নিজেদেরকে (ইন্দ্রিয়দ্বারে) প্রতিভাত করে তা বহু এবং বিবিধ প্রকারের তবুও মনের একাগ্রতা শক্তি সকল পর্যবেক্ষণীয় বিষয়ে একই নিয়মে বা একাকারে নিরন্তর পর্যবেক্ষণ নিরত থাকে। অর্থাৎ প্রথম বিষয়কে যে পরিমাণ একাগ্রতা শক্তিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং অন্যান্য পরবর্তী (উৎপন্ন) বিষয়ও একই পরিমাণ একাগ্রতা শক্তিদ্বারা পর্যবেক্ষণ করেন।

‘প্রতিপক্ষ দ্বারা অভিভূত হয় না’ অর্থে ক্ষণিক সমাধি (বা একাগ্রতা) বাধাহীনভাবে প্রবর্তন (চলা) কালে মানসিক নীবরণ দ্বারা অভিভূত হয় না।

১. অবস্থায় মন কামহন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং সংশয় (সাময়িকভাবে) মুক্ত থাকে। ইহাই মনের পঞ্চনীবরণ বা আবরণ।

‘যেন তন্যভাব বা সমাধি’ অর্থে ক্ষণিক সমাধির শক্তিমত্তা তখন অর্পণা বা পূর্ণ সমাধির ন্যায় শক্তি ধারণ করে। মোটের উপর ক্ষণিক সমাধির অর্পণা সমাধির সঙ্গে তুলনীয় সাদৃশ্য যথারীতি বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন দ্বারা যখন যোগী পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হয় (অর্থাৎ সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানে উন্নীত হয়) তখনই তা প্রকট হয়। কিন্তু অর্থকথার বর্ণনা অনুসারে চিন্তা-বিশুদ্ধি বলতে উপচার এবং অর্পণা সমাধিমাত্র বুঝায় না; তবে এখানে এ বিষয়কে এ অর্থে অর্থাৎ ক্ষণিক সমাধিকে অর্পণা সমাধির অন্তর্ভুক্ত রূপে ধারণা করতে হবে। কারণ স্মৃতিপ্রস্থান সূত্রের অর্থকথায় বলা হয়েছে : শেষ দ্বাদশ অনুশীলনও উপচার কর্মস্থানের ন্যায় (অর্থাৎ উপচার সমাধি প্রবর্তন করে)। স্মৃতিপ্রস্থান সূত্রের অর্থকথায় বর্ণিত ইর্যাপথ পর্ব সম্প্রজ্ঞান পর্ব, ধাতুমনস্কার পর্ব প্রভৃতিতে মনস্কার (মনোযোগ) হেতু যে সমাধি প্রবর্তিত হয় তাকে ক্ষণিক সমাধি বলা হয়েছে। তারপরই যোগী অর্পণা সমাধিতে নিমজ্জিত হয়। কর্মস্থানে (ধ্যেয় বিষয়ে) প্রবর্তিত উপচার সমাধি অর্পণা সমাধির ন্যায় নীবরণ প্রতিহত সমর্থ : যেহেতু ইহা (উপচার সমাধি) মার্গ-ফল সমাধির পূর্ব নিকটতম সমাধি; সে কারণে ক্ষণিক সমাধিকে উপচার সমাধি বলা হয় এবং ক্ষণিক সমাধি প্রবর্তক কর্মস্থানকে উপচার কর্মস্থান বলা হয়। এই কারণে পঞ্চ-নীবরণ প্রতিহত সমর্থ ক্ষণিক সমাধিকে উপচার সমাধি এবং চিন্তা-বিশুদ্ধি রূপে নাম ধারণ করার অধিকার আছে। অন্যথায় (যোগী) উপচার সমাধি বা অর্পণা সমাধি উৎপন্ন না করে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা বিদর্শন ভাবনা করে শুদ্ধ বিদার্ষনিকের (বিদর্শন যোগীর) পক্ষে চিন্তা-বিশুদ্ধি লাভ সুদূর পরাহত।

১. নীবরণ : কামচ্ছন্দ (ইন্দ্রিয় বাসনা), ব্যাপাদ (দ্রব), ধীনমিদ্ধং (দেহ-মনের আলস্য, জরতা) উদ্ধতা-কৌকৃত্য (মানসিক উদ্দামতা-অনুশোচন, বিচিকিৎসা (সন্দেহ))। মন তখন এই পঞ্চ আবরণ মুক্ত থাকে।

তৃতীয় — দৃষ্টি-বিশুদ্ধি (Purification of view)

১. নাম-রূপ-পরিচ্ছেদ-জ্ঞান (Analytical knowledge of body and mind).

চিন্তা-বিশুদ্ধি সমন্বিত হয়ে এবং নিরন্তর বিষয় পর্যবেক্ষণে রত থেকে যোগী নাম-রূপ (মন-দেহ) কে এরূপ বিভাগ (পরিচ্ছেদ) করে জানেন : ‘উদরের উন্মূলন (উত্থান) এক কার্যপ্রক্রিয়া এবং অবনমন (পতন) আর এক কার্যপ্রক্রিয়া, উপবেশন এক কার্যপ্রক্রিয়া এবং (আসনের সঙ্গে) স্পর্শ অনুভূতি আর এক কার্যপ্রক্রিয়া ইত্যাদি। সেভাবে তিনি প্রত্যেক কায়িক কার্যপ্রক্রিয়া যা পর্যবেক্ষণ করেন তা পৃথক পৃথকভাবে জানেন।’ তারপর তিনি : উত্থান গतिकে এক কার্যপ্রক্রিয়ারূপে জানেন; পতন গतिकে আর এক কার্যপ্রক্রিয়ারূপে জানেন।’ সেভাবে তিনি প্রত্যেক মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন। তদুপরি তিনি জ্ঞাত হন : ‘উত্থান গতি এক কার্যপ্রক্রিয়া, তাকে জানা অন্য কার্যপ্রক্রিয়া। পতন গতি এক কার্যপ্রক্রিয়া, তাকে জানা অন্য কার্যপ্রক্রিয়া ইত্যাদি। এভাবে তিনি কায়িক এবং মানসিক কার্যপ্রক্রিয়ার প্রভেদ জ্ঞাত হন। এ সকল জ্ঞান লাভ হয় পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে। বিচার বা যুক্তিতর্ক শক্তি দ্বারা নয়। সেজন্য বলা হয় : ইহা পর্যবেক্ষণ প্রসূত (বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত) প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু এ জ্ঞান অবরোহ সিদ্ধান্ত পর্যায়ে অনুসরণ করে লাভ করা হয়নি (অর্থাৎ চিন্তা বা বিচার দ্বারা লাভ হয়নি)।

সেরূপভাবে চক্ষু দ্বারা যখন যোগী চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় দেখেন তখন তিনি তা পার্থক্য ভেদে প্রতি বিষয়কে (বা কার্যকে) পৃথকভাবে দেখেন : ‘চক্ষু এক, চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় অন্য, দর্শন বা দেখা আর এক এবং তা জানাও আর এক।’ একই ধারা কর্ণ-শব্দ, নাসিকা-গন্ধ, জিহ্বা-স্বাদ, কায় (দেহ) — স্পৃশ্য এবং মন-ধর্ম (ভাব) বিষয়েও একই প্রকার।

তখন এরূপ প্রত্যেক বিষয় পর্যবেক্ষণে যোগী বিশ্লেষণাত্মকভাবে মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া যেমন চিন্তা করা, বিচার করা ইত্যাদি স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেই জানেন এবং তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান রূপে অবগত হন। তা এরূপ : ‘এ সকল (মানসিক ক্রিয়ার) স্বভাব হল বিষয়ের প্রতি গমন, বিষয়ের প্রতি নমিত হওয়া, বিষয় বা আরম্ভণকে বিজানন বা জানা।’ অপর পক্ষে তিনি বিশ্লেষণাত্মকভাবে সর্বদৈহিক বা কায়িক কার্যপ্রক্রিয়াগুলিকে যথা উদরের উত্থান-পতন, উপবেশন ইত্যাদি এরূপে জানেন : ‘এ সকল দৈহিক কার্যপ্রক্রিয়া বিষয়ের প্রতি গমন করেনা, বিষয়ের প্রতি নমিতও হয় না অথবা বিষয়-প্রজনন স্বভাবযুক্তও নহে। এরূপ জানাকে বা জ্ঞানকে বলা হয় : ‘রূপের (বা দেহ বা জড়ের) অব্যক্ত প্রকাশন (বা উপস্থিতি)’। অভিধর্ম-বিভঙ্গের মূল টীকায় এ বিষয়ে এরূপ উক্ত হয়েছে : ‘অনারম্ভণতা বা অব্যাকততা

দৃষ্টব্যা'তি, অর্থাৎ অব্যক্তকে (রূপকে) বুঝতে হবে তার কোন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় নেই বা জানার ক্ষমতা নেই।

প্রত্যেক কায়িক এবং মানসিক কার্যপ্রক্রিয়ার বাস্তব স্বভাবকে যথাযথ বিভাজন দ্বারা জানাকে 'নামরূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান' বলা হয়।

যখন এই জ্ঞান পরিপক্ব হয় তখন যোগী এরূপ জ্ঞাত হন : শ্বাস গ্রহণকালে উদরের উত্থানগতি উৎপন্ন হয় এবং সেই উত্থানগতিকে জানা হয়; কিন্তু সেখানে অন্য কোন আত্মা নেই। প্রশ্বাস ত্যাগ কালে উদরের পতন গতি হয় এবং সেই পতন গতিকে জানা হয়, সেখানেও অন্য কোন আত্মা নেই। এ বিষয়ে বা অন্য পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি নিজে এরূপ দেখেন এবং জানেন : 'এখানে দুই যুগ্ম বিষয় বর্তমান : একটি হল রূপ বা জড়ের কার্য প্রক্রিয়া বিষয় রূপে উপস্থিতি এবং অন্যটি হল তা জ্ঞাত হওয়ার মানসিক প্রক্রিয়া। এই দুই বা যুগ্ম কার্যপ্রক্রিয়া থেকেই প্রাচীনকাল থেকে সত্ত্ব, পুদগল, জীব, আমি, অন্য, পুরুষ, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু যোগী এই দুই কার্যপ্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য সত্ত্ব বা পুদগল (ব্যক্তি) বা জীব বা আমি বা অন্য পুরুষ বা স্ত্রী (পর্যবেক্ষণকালে) দেখেন না — ইহই মাত্র স্বয়ং দেখেন এবং জানেন। ইহাকে (এরূপ জ্ঞানকে) দৃষ্টি-বিশুদ্ধি বল হয়।

চতুর্থ — কঙ্খা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি (Purification by overcoming doubt)

২. প্রত্যয়-পরিগ্রহ-জ্ঞান (knowledge by discerning conditionality)

যখন দৃষ্টি-বিশুদ্ধি পরিপক্বতা লাভ করে, তখন কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয় প্রত্যয় বা কারণও প্রকট হয়। প্রথমতঃ কায়িক কার্যপ্রক্রিয়ার প্রত্যয় বা কারণরূপ চিত্তই প্রকট হয়। উদাহরণঃ যখন হাত, পা সঞ্চালন করা হয় তখন এ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করার জন্য চিত্ত উৎপন্ন হয় বা জাগ্রত হয়। সুতরাং যোগী প্রথমে সেই চিত্তকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তারপর সঞ্চালন করা রূপ ক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করেন ইত্যাদি। তখন তিনি স্থায়ী অভিজ্ঞতায় জানতে পারেনঃ 'যখন প্রত্যঙ্গ চালনা করার চিত্ত জাগ্রত হয়, তারপরই চালনা কর রূপ শারীরিক কার্যপ্রক্রিয়া সাধিত হয়; যখন প্রত্যঙ্গ বাড়ানোর জন্য চিত্ত জাগ্রত হয়, তারপরই অঙ্গ বাড়ান রূপ শারীরিক কার্যপ্রক্রিয়া সাধিত হয়। তিনি অরূপভাবে অন্যান্য ক্রিয়াগুলিও স্থায়ী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হন।

অবার তিনি মানসিক কার্যপ্রক্রিয়ার প্রত্যয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা এরূপে জ্ঞাত হনঃ চিত্ত যখন ধ্যেয় বিষয় থেকে বহির্দিকে ধাবিত হয়, তখন প্রথমে তদনুরূপ

(বহির্বিষয়ে) মনস্কার উৎপন্ন হয়, তারপর সেই বহির্বিষয় জানা বা দেখার জন্য চিত্ত সে দিকে ধাবিত হয়। যদি উৎপন্ন বহির্বিষয়ের মনস্কারকে স্মৃতি সহকারে পর্যবেক্ষণ করা না হয়, তবে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তা বিপথগামী হয়। যদি বহির্বিষয়ে বিপথগামী চিত্তকে পর্যবেক্ষণ করা হয় বা জানা হয়, তবে কোন বিক্ষিপ্ত চিত্ত উৎপন্ন হয় না। অনুরূপভাবে অন্যান্য চিত্তে যথা আনন্দ উপভোগ করা, রাগান্বিত হওয়া বা লোভ উৎপন্ন হওয়া প্রভৃতি বিষয়েও তাই হয়। যখন চক্ষু-ইন্দ্রিয় দ্বারে চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় উপস্থিত থাকে, তখন চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, নতুবা চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বার বিষয়েও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। যদি কোন দর্শনীয় বা জানার বিষয় উপস্থিত হয় তবে সেখানে সে বিষয় দেখার, চিন্তা করার, বিচার করার বা জানার চিত্ত উৎপন্ন হয়, তা না হলে সেরূপ কোন চিত্ত উৎপন্ন হওয়ার অবকাশ নেই। একইভাবে তিনি মনদ্বারে আগত অন্যান্য বিষয়গুলি জ্ঞাত হন।

এ সময় যোগী সাধারণতঃ নানা প্রকার শারীরিক দুঃখ, বেদনা অনুভব করে থাকেন। যোগী যখন সেরূপ একটি বেদনাকে (নিরপেক্ষভাবে) পর্যবেক্ষণ করেন, তখন দেহের অন্যত্র অপর বেদনা উৎপন্ন হয়। যখন যে বেদনা উৎপন্ন হয় যোগী তখন সেরূপ প্রত্যেকটি বেদনা উৎপন্ন হয় তখন সে বেদনা পর্যবেক্ষণ করেন তথাপি তিনি তখন উৎপত্তি মাত্রই (বা বেদনার আদি) অনুভব করেন; তবে তাদের (বেদনার) শেষ বা বিলুপ্তি অনুভব (বা দর্শন) করেন না।

তখন নানারূপ মানসিক নিমিত্ত বা প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়। মন্দির, উগাসনা গৃহ, ভিক্ষু, মানুষ, বাড়ি, বৃক্ষ, উদ্যান, দেববিমান, মেঘ এবং অন্যান্য নানাবিধ নিমিত্ত উপস্থিত হয়। এ বিষয়েও যোগী যখন এগুলির একটি নিমিত্ত পর্যবেক্ষণ করেন তখন অন্য এক নিমিত্ত স্বতঃই আবির্ভূত হয়। তাতেও একটি পর্যবেক্ষণকালে অপরটির উদয় হয়। যখন যে নিমিত্ত উপস্থিত হয় যোগী তখন সেই নিমিত্ত নিরন্তর পর্যবেক্ষণ করেন। যদিও তিনি তা পর্যবেক্ষণ নিরত থাকেন; তথাপি তিনি সেই নিমিত্তের উৎপত্তির আদি দর্শন করেন, কিন্তু শেষ বা অন্তর্ধান দর্শন করেন না।

তিনি তখন জ্ঞাত হন : ‘বিজ্ঞান বা চিত্ত উৎপন্ন হয় যখন তদনুসারে নিমিত্তপ্রকট হয়। যদি কোন নিমিত্ত উপস্থিত হয় তখন বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদি কোন নিমিত্ত উপস্থিত না থাকে তবে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।’

পর্যবেক্ষণ ধারার মধ্যেই অনুমিতি দ্বারা তিনি এরূপ জ্ঞাত হন: অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা, তৃষ্ণা, কর্ম ইত্যাদি কারণ এবং প্রত্যয় সহযোগে বা উপস্থিতিতে হে-মন (কার্যপ্রক্রিয়া) প্রবর্তিত হচ্ছে।’

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অনুমিতি (অনুমান) মাধ্যম এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং পর্যবেক্ষণকালে দেহ-মন (কার্যপ্রক্রিয়া) যে কারণ সমুত, তা জানাকে 'প্রত্যয় (কারণ) পরিগ্রহ (সন্নিশ্রিত বা আশ্রিত) জ্ঞান বলা হয়।

যখন সে জ্ঞান পরিপক্ক হয়, তখন যোগী হৃদয়ঙ্গম করবেন যে শুধুমাত্র দেহ-মন কার্যপ্রক্রিয়া বিশেষ এবং উপযুক্ত (বা অনুরূপ) কারণ অবলম্বনেই সংঘটিত হচ্ছে এবং তিনি নিঃসংশয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌছবেন : 'নাম-রূপ (দেহ-মন কার্যপ্রক্রিয়া) প্রত্যয় পরিচালিত এবং প্রত্যয়াশ্রিত (প্রত্যয়োৎপন্ন)। তা ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বলন ও প্রসারণ কারক অন্য কেহ নেই বা দুঃখবেদক (অনুভূতি কারক) পুরুষও কেহ নেই — ইহা বিনিশ্চয়বশে প্রজ্ঞাত হন। ইহাই **কজ্ঞা উত্তরণ** (সংশয় উত্তরণ) **বিশুদ্ধি**।

৩. সংমর্শন জ্ঞান (knowledge of Comprehension)

যখন কজ্ঞা উত্তরণ বিশুদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন যোগী বিষয়ের আদি-মধ্য-অন্ত পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরিষ্কার রূপে জ্ঞাত হন। তারপর তিনি যখন বহুবিধ বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন তা স্পষ্টভাবেই করেন, একটি (বা পূর্ববর্তী) কার্যপ্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ শেষ হলে পরবর্তী কার্যপ্রক্রিয়া উৎপন্ন হয়। উদাহরণ: যখন উদরের উত্থান গতির (ক্রিয়া) শেষ হয় তারপর পতন গতি (ক্রিয়া) আরম্ভ হয় এবং পতন গতি ক্রিয়া শেষ হলে তবে পুনরায় উত্থান গতি আরম্ভ হয়। গমনকালেও তাই হয়; যখন পা তোলার কাজ শেষ হয় তখন পা সামনের দিকে নেওয়ার কাজ আরম্ভ হয় এবং যখন সে কাজও শেষ হয় তখন পা মাটিতে রাখার কাজ আরম্ভ হয়।

দুঃখ বেদনাদায়ক অনুভূতির ক্ষেত্রে, যখন একটি দুঃখবেদনা (দেহের) বিশিষ্ট স্থানে শেষ হয় তখন অন্য নূতন বেদনা অন্যস্থানে অনুভূত হয়। প্রত্যেক দুঃখবেদনাকে বারবার দুই, তিন বা বহুবার পর্যবেক্ষণ করলে যোগী বুঝতে পারবেন যে তা ক্রমশ: কর্মের দিকে যাচ্ছে এবং পরিশেষে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে।

নানা আকার বিশিষ্ট নিমিত্ত বা প্রতিবিম্ব যা মানসপটে আবির্ভূত হয়, সেক্ষেত্রে যখন একটি নিমিত্তকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তা বিলুপ্ত হয়, তখন আবার অন্য নূতন একটি নিমিত্ত চিত্তক্ষেত্রে উদয় হয়। তাদের মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করলে, তিনি দেখবেন যে সেই মানসিক নিমিত্তগুলি বা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তা ধীরে ধীরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যাচ্ছে অথবা তা ক্রমান্বয়ে ছোট এবং ক্ষীণ হচ্ছে যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হচ্ছে। তখন যোগী হৃদয়ঙ্গম করেন কিছুই নিত্য ও ধ্রুব নয় অথবা ক্ষয়-বিলয় বিরহিত কিছুই নেই।

পর্যবেক্ষণ কালে প্রতিটি বিষয়ের কি প্রকারের ক্ষয় ও বিলয় হচ্ছে তা দেখে যোগী হৃদয়ঙ্গম করেন — ইহা বিলয়রূপে অনিত্য। তিনি আরও হৃদয়ঙ্গম করেন, ইহা দুঃখ; কারণ ইহা উৎপন্ন হয়ে বিলয় প্রাপ্ত হয়। কি প্রকারে নানা প্রকার দুঃখদায়ক অনুভূতি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয় এবং একটি দুঃখদ অনুভূতি অন্তর্হিত হলে, অন্যটি উৎপন্ন হয়, সেটাও অন্তর্হিত হলে অন্যটি উৎপন্ন হয় — এরূপ দেখে তিনি প্রত্যেকটি বিষয়কে দুঃখরাশি রূপে প্রজ্ঞাত হন। তদুপরি তিনি বিষয়কে আত্মবশে (আত্মশক্তিতে) অনুৎপন্ন এবং কারণ-নির্ভরশীল হয়ে উৎপন্ন এবং ভঙ্গ হতে দেখে বিষয়কে অনীশ্বর — অনাত্মা স্বভাবধর্ম মাত্র সংমর্শন (হৃদয়ঙ্গম) করেন।

প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়কে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মরূপে সাধারণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা, কোনরূপ বিচার বা যুক্তিতর্ক ব্যতীত শুধুমাত্র তার অনিত্যধর্ম দর্শন করে সংমর্শন বা পরিজ্ঞাত হওয়াকে প্রত্যক্ষ সংমর্শন জ্ঞান বলা হয়।

এরূপ অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম, এ ত্রিলক্ষণ একবার বা বহুবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সকল কায়িক-মানসিক দেহ-মন কার্যপ্রক্রিয়াসূহ এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে এরূপ সংমর্শন করেন: ‘তাহাও অনুরূপ বশে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম।’ ইহা অনুমান সংমর্শন জ্ঞান।

এ জ্ঞানলাভ পরিপ্রেক্ষিতে ‘প্রতিসম্ভিদা মার্গে’ এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে: ‘যা কিছু রূপ (জড় পদার্থ বা পঞ্চভূত) অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, অধ্যাত্ম (দেহস্থ) বা বাহ্যিক, বৃহৎ বা সূক্ষ্ম, হীন বা প্রণীত (উত্তম), দূরে বা নিকটে সর্বপ্রকার রূপকে অনিত্যরূপে স্থাপন করা হয়েছে। ইহা এক প্রকার সংমর্শন জ্ঞান।

‘কথাবস্তুর’ অর্থকথায় এরূপ বলা হয়েছে: ‘এক সংস্কারে (বিষয়ে) অনিত্য দর্শন করে অবশেষে (অর্থাৎ অন্যান্য) সংস্কারও যে অনিত্য তা অবরোহ (অনুমান) পর্যায়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।’

‘সর্বসংস্কার অনিত্য’ অনুমান বা অবরোহ পর্যায়ের সিদ্ধান্তকে নির্দেশ করে। কিন্তু তা এক এক ক্ষণে বিষয় পর্যবেক্ষণ করে জ্ঞান সঞ্চয় নয়।’ (ইহা অনুমান বা অবরোহ পর্যায়ে বিদর্শন জ্ঞান নির্দেশক প্রমাণ)।

মধ্যম নিকায়ের অর্থ কথায় বলা হয়েছে: ন-সংজ্ঞা ন-অসংজ্ঞা (অরূপ চতুর্থ ধ্যানস্তরে) বুদ্ধগণের অনুপদ ধর্ম বিদর্শন (বাধাহীন সমাধি) হয় কিন্তু শ্রাবকগণের হয় না।’ সে কারণে বুদ্ধ এখানে কলাপ-বিদর্শন প্রজ্ঞাপন অভিপ্রায়ে এ উক্তি করেছেন। (এই অনুচ্ছেদ কলাপ-সংমর্শন (বা সমষ্টিগত অনুরোধ বা হৃদয়ঙ্গম) নামকরণের প্রামাণ্য উদাহরণ (বা যুক্তি)।

৪. উদয়-ব্যয় জ্ঞান (knowledge of Arising and Passing away)

(বিদর্শন ভাবনার দশ অন্তরায়কর ধর্ম)^১

যখন যোগী পর্যবেক্ষণকালে অতীত এবং ভবিষ্যৎ কোন বিষয় বা কার্যপ্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃকপাত না করে শুধুমাত্র বর্তমান কায়িক মানসিক (দেহ-মন) কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হন, তখন বিদর্শন প্রভাবে তাঁর নিকট (মানস প্রতিবিম্বস্বরূপ) ‘অত্যাঙ্কুল আলোকের’ অভ্যুদয় হয়। কারো নিকট ইহা দীপশিখার আলোর মত, কারো নিকট বিদ্যুৎ প্রবাহের মত, কারো নিকট চন্দ্র-সূর্যের দীপ্তির মত... প্রতিভাত হয়। ইহা আবার কারো নিকট মুহূর্তের জন্য এবং কারো নিকট দীর্ঘ সময় বিদ্যমান থাকে।

এইরূপে তাঁর নিকট বিদর্শন সংযুক্ত বলবতী ‘স্মৃতি’ (বা জাগৃতি) উৎপন্ন হয়। তার ফলে সকল কায়িক-মানসিক (রূপ নাম) কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ নিরত চিন্তে স্বয়ং আগমনের ন্যায় উপস্থিত হয়, তখন স্মৃতিও যেন নাম-রূপ কার্যপ্রক্রিয়ায় স্বতঃই অবস্থান করে। যোগী তখন মনে করেন : ‘এমন কোন নাম-রূপ কার্যপ্রক্রিয়া নেই যার মধ্যে আমি স্মৃতি সংযোগ করতে পারি না।’

তাঁর বিদর্শন ‘প্রজ্ঞা’ এখানে প্রত্যবেক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ তদ্রূপ তীক্ষ্ণ, বলবান এবং নির্মল হয়। তার প্রভাবে ধারাল ছুরিকা দ্বারা বাঁশের অঙ্কুর খণ্ড খণ্ড করে কর্তনের ন্যায় যোগী সকল প্রত্যক্ষীভূত নাম-রূপ কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরিষ্কারভাবে এবং পৃথক পৃথকভাবে জ্ঞাত হন। তখন যোগীর এরূপ মনে হয়, ‘এমন কোন নাম-রূপ কার্যপ্রক্রিয়া নেই যা পর্যবেক্ষণ করা যায় না।’ বিষয়ের অনিত্য লক্ষণ ইত্যাদি এবং অন্যান্য সত্য প্রভৃতি তিনি পরিষ্কার রূপে তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত হন এবং বিশ্বাস করেন ইহা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান।

তদুপরি তাঁর নিকট বিদর্শন সম্প্রযুক্ত শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। ইহার প্রভাবে যোগীর মন যখন পর্যবেক্ষণ ও ধ্যানে নিমজ্জিত থাকে তখন তা সুপ্রসন্ন এবং কোন প্রকার বাধা দ্বারা আক্রান্ত হয় না। যখন তিনি বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘগুণ অনুস্মরণ করেন তখন তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তখন তাঁর মনে বুদ্ধবাণী প্রচারের অদম্য স্পৃহা উপস্থিত হয়, যোগীদের গুণের প্রতি চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হয়, প্রিয়জন, মিত্র এবং জ্ঞাতিবর্গকে ভাবনানুশীলনের উৎসাহ ও উপদেশ দিতে ইচ্ছা হয়। বিদর্শনাচার্যের নির্দেশ ও উপদেশের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি চিত্ত শ্রদ্ধাবনত হয়। এবম্বিধ আরও নানারূপ মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া চিত্ত পথে উদয় হয়।

১. আলো, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রশান্তি, সুখ, বীর্য, উপেক্ষা এবং নিকণ্ঠি (উক্ত গুণের প্রতি সূক্ষ্ম তৃষ্ণা)।

তাঁর নিকট পঞ্চা' প্রীতি উৎপন্ন হয়, ক্ষুদ্রিকা প্রীতি থেকে আরম্ভ করে এ প্রীতি উৎপন্ন হয়। যখন চিত্তবিশুদ্ধি লাভ হয় তখন থেকে সেই প্রীতি লোমহর্ষণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পন ইত্যাদি উৎপন্ন হয় এবং এখন তা সর্বদেহে অতি মধুর-সূক্ষ্ম-স্পর্শপূর্ণ, অতি প্রণীত সুখস্বাদ স্ফূরণ করে। এ সকল প্রীতি-প্রভাবে তিনি অনুভব করেন সমস্ত দেহ মন উর্ধ্বে উঠেছে এবং ভূমি স্পর্শ না করে শূন্যে স্থিত আছেন বা যেন বায়ু-আসনে উপবেশন করা হয়েছে অথবা দেহ যেন উপরে নিচে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তাঁর নিকট চিত্ত-চৈতসিকের (চিত্ত বৃত্তির) উপদ্রবহীন লক্ষণ প্রশান্তি বা 'প্রশান্তি' উৎপন্ন হয় এবং তৎসঙ্গে চিত্ত লঘুতা' প্রকাশ পায়। এ সকল চিত্ত বা মানসিক গুণ প্রভাবে উপবেশন, গমন (বা চংক্রমণ), দাঁড়ান, শয়নকালে যোগী চিত্ত-চৈতসিকের কোন প্রকার উপদ্রব, ভারিত্ব, কাঠিন্য, অনমনীয়তা অসুস্থতা এবং বঙ্কতা অনুভব করেন না। বরঞ্চ তাঁর অনায়াস পর্যবেক্ষণ কার্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চলে এবং তাতে চিত্ত ও চৈতসিক প্রশান্তি লাভ করে। সে কারণে প্রশান্তি লাভ হেতু চিত্ত-চৈতসিক লঘুতা লাভ করতঃ দ্রুত সর্বদা কর্মতৎপর হয়, মৃদুতা প্রভাবে যে কোন আরম্ভণে (অবলম্বনে, বিষয়ে) মনস্কার সমর্থ হয়, কর্মগ্যাতা প্রভাবে ইচ্ছিত যে কোন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনঃসংযোগ করতে পারে, প্রগুণতা গুণে (পর্যবেক্ষণ) নির্মলভাবে চলে এবং সহজেই বিদর্শন জ্ঞান বিষয়ে চিত্ত প্রবেশ করে এবং ঋজুতা গুণে কুশল কর্মের দিকে মন সর্বদা ধাবিত হয়, প্রবর্তিত এবং নমিত হয়।

তাঁর নিকট সর্বদেহে সংবেদনশীল (অনুভূত) অতি প্রণীত সূক্ষ্ম 'সুখ' উৎপন্ন হয়। তৎপ্রভাবে অমিয়-অমিত সুখ লাভ করে বিশ্বাস করেন : 'আমি এখন সর্বদা সুখী অথবা আমি এখন পূর্বে অনুভূত সুখে অভিভূত' এবং তিনি তখন এ সুখানুভূতির কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করতে ব্যগ্র হন।

১. (ক) ক্ষুদ্রিকা প্রীতি হল লোমহর্ষণ, (খ) ক্ষণিকা প্রীতি হল বিদ্যুৎ স্ফূরণের মত অনুভূতি (গ) অবক্রান্তিকা প্রীতি হল দেহে সাগর তরঙ্গের মত অনুভূতি (ঘ) উদ্বেগা প্রীতি হল আকাশে দেহ উত্তোলনের মত অনুভূতি (ঙ) স্ফূরণা প্রীতি হল বায়ুপূর্ণ বলের ন্যায় সর্বশরীরে পূর্ণপ্রীতি।

২. চিত্ত লঘুতা' হল চিত্তের ছয় যুগল গুণ। তা'হল: চৈতসিক কায় প্রশান্তি, চৈতসিক কায় লঘুতা — চিত্ত লঘুতা, চৈতসিক কায় মৃদুতা — চিত্ত মৃদুতা, চৈতসিক কায় কর্মগ্যাতা — চিত্ত কর্মগ্যাতা, চৈতসিক কায় প্রগুণতা — চিত্ত প্রগুণতা এবং চৈতসিক কায় ঋজুতা — চিত্ত ঋজুতা। প্রশান্তির সঙ্গে এ ছয় যুগল গুণ উৎপন্ন হয়। সকল কুশল এবং ভাবনা কর্মে তা মনের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

প্রশান্তি সমুদ্ভূত সেই প্রীতি ও সুখের বর্ণনা ধর্মপদে (ভিক্ষুবর্গে) এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে :

‘শূন্যগৃহে প্রবিষ্ট যে ভিক্ষু, সমাহিত চিত্ত যাঁর

সম্যক্ ধর্ম দর্শন হেতু লোকোত্তর প্রীতি হয় তাঁর ।

সর্বস্বক্ষে সর্বথা যিনি উদয়-বিলয় দর্শনে স্মৃতিমান

নির্বাণ সাক্ষাতকারীর মত প্রীতি, প্রামোদ্য তিনি পান ।’

তাঁর নিকট সুদৃঢ় এবং অনুত্তেজিত সুগৃহীত সমপ্রবর্তনশীল ‘বীর্য’ উৎপন্ন হয় ।

পূর্বে তাঁর বীর্য (ভাবনায় কর্মশক্তি) কখনও শিথিল হত, কখনও স্ত্যন-মিদ্ধ (দেহ-মনের আলস্য) দ্বারা অভিভূত হত, তাই প্রকটিত (উৎপন্ন) আরম্ভণ বা বিষয়

নিরন্তর পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হতেন না এবং তাঁর জ্ঞানও সুস্পষ্ট (নির্মল) ছিল না । পূর্বে সময় সময় তাঁর বীর্য উত্তেজনাপূর্ণ থাকত তাই ঔদ্ধত্য বশতঃ প্রকটিত

বিষয় পর্যবেক্ষণে অপারগ হতেন । এখন শিথিলতাহীন এবং উত্তেজনাহীন অথচ সুগৃহীত ও সমসঞ্চরণশীল (সমানভাবে চালিত) বীর্য প্রভাবে সেই দোষসমূহ

অতিক্রম করে যথা প্রকটিত বিষয় নিরন্তর পর্যবেক্ষণ সক্ষম হয়েছে । এবং জ্ঞানও সুবিশদ (বিশুদ্ধ) হয়েছে ।

তাঁর নিকট সর্বসংস্করের প্রতি মধ্যস্থভাবরূপ বলবতী বিদর্শন জ্ঞান ‘উপেক্ষা’ উৎপন্ন হয় । তৎপ্রভাবে সংস্কারের অনিত্যাতি বিষয়ের প্রতি চিত্ত মধ্যস্থভাব

অবলম্বন করে, উৎপন্ন নাম-রূপ (কার্যপ্রক্রিয়া) নিরন্তর পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হন । তখন তাঁর পর্যবেক্ষণ অনায়াসে সম্পন্ন হয় এবং যেন পর্যবেক্ষণ কার্য

স্বগতিতেই প্রবর্তিত হচ্ছে (চলছে) । তখন তাঁর আবর্তন — উপেক্ষা (বিষয় গ্রহণের প্রতি চিত্তের আন্দোলিত অবস্থা বা চিত্তান্দোলন) বলবতী হয় । তৎঅনুভাবে

(প্রভাবে) চিত্ত (আগত) আবর্তিত আরম্ভণকে (বিষয়কে) অতি দ্রুত নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করে (বা আরম্ভণে প্রবেশ করে) ।

পূর্বোক্ত ওভাষ বা আলোক প্রভৃতি অন্যান্য গুণগুলি প্রতিমণ্ডিত (যুক্ত) বিদর্শন যা সেগুলিকে অনুভব বা আন্বাদন করে, তখন সে কারণে তাঁর নিকট একপ্রকার

সূক্ষ্ম শান্তপ্রকৃতির ‘আসক্তি’ (নিকন্তি) সেগুলির প্রতি উৎপন্ন হয় । ইহা যে ভাবনার আবিলতা বা অন্তরায়, যোগী তা জানতে সক্ষম হন না, বরঞ্চ তা তাঁর

ভাবনা প্রসূত প্রীতি বলেই মনে করেন । সুতরাং যোগী তার প্রশংসায় এরূপ ধারণা করেন : ‘আমি এখনই মাত্র পূর্ণ ভাবনাসুখ অনুভব করছি ।’

১. ইহা চিত্তের বিষয়ের প্রতি প্রাথমিক আবর্তন অবস্থা তাকে জানার জন্য অর্থাৎ প্রাথমিক মনঃসংযোগ ।

অত্যুজ্জ্বল আলোকসহ এরূপ প্রীতি এবং সুখ অনুভূতি এবং প্রকৃত পর্যবেক্ষণ উপভোগ করে যা এখন সহজেই এবং দ্রুত পরিচালিত হচ্ছে তখন যোগীর মনে এরূপ ধারণা উৎপন্ন হয় ‘আমি এখন লোকোত্তর মার্গ ও ফলে’ নিশ্চিত উন্নতি হয়েছে। আমার ভাবনা কার্য শেষ হয়েছে।’ এরূপ ধারণা অমার্গকে মার্গভ্রম। ইহা ভাবনার অন্তরায়কর ধর্ম যা সাধারণত: ঘটে থাকে বলে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অত্যুজ্জ্বল আলোককে এবং অন্যান্য অন্তরায়কর ধর্মকে মার্গ ও ফল লাভের পূর্বাভাস না ভেবেও যোগী যদি সে সকল বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করেন, তবুও তা বিদর্শনের অন্তরায়কর ধর্ম। সুতরাং পর্যবেক্ষণ প্রসূত যে জ্ঞান লাভ হয় তা যতই দ্রুত কার্যসম্পন্ন করুক না কেন — তাকে তরুণ (দুর্বল) উদয়-ব্যয় জ্ঞান বলা হয়, কেননা তা অন্তরায়কর দোষসমূহের সঙ্গে জড়িত থাকে। সেই একই কারণে যোগী সে সময় নাম-রূপ কার্যপ্রক্রিয়া পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হন না।

৫. মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি (Purification by knowledge and Vision of what is path and not-path)

পর্যবেক্ষণ কার্যে নিরত বিদর্শন যোগী নিজের উপলব্ধির দ্বারা বা কারও উপদেশ মাধ্যমে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন: ‘এই অত্যুজ্জ্বল আলোক এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতাগুলি যা আমি উপভোগ করেছি তা মার্গ নয়। ইহা বিদর্শনের অন্তরায়কর ধর্ম (বা দোষ)। তাতে আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। আরম্ভণ বা বিষয় যখন যা প্রকটিত হয় তখন তা অবিরত পর্যবেক্ষণ করে যাওয়াই — একমাত্র বিদর্শন পথ। আমার এখন পর্যবেক্ষণ কার্য অনুশীলন করে যাওয়াই একমাত্র কর্তব্য।’ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে ‘মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি’ বলা হয়।

৬. প্রতিপদা জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি (Purification by knowledge and Vision of the Course of Practice)

অত্যুজ্জ্বল আলোক এবং তৎযুক্ত অন্যান্য বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণের পর অথবা সেগুলির প্রতি মনোসংযোগ না করে (গ্রাহ্য না করে) তিনি পূর্বের ন্যায় কায়িক-মানসিক ষড়্-ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকটিত বিষয়গুলি অবিরত পর্যবেক্ষণ কার্যে লিপ্ত হন।

১. লোকোত্তর মার্গ ও ফল বলতে স্রোতাপত্তি, সঙ্কদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ব মার্গ ও ফলকে বুঝায়। এখানে স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফলকে বুঝাচ্ছে। স্রোতাপত্তি মার্গ-ফল প্রাপ্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ স্রোতাপন্ন সাতবার মাত্র জন্মগ্রহণ করে, শেষ জন্মে অর্হত্ব লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

যখন তিনি এরূপ পর্যবেক্ষণ কার্যে নিরত থাকেন তখন তিনি অত্যুজ্জ্বল আলোক, প্রীতি, প্রশান্তি, সুখ, নিকন্তি (বা আসক্তি) প্রভৃতি অন্তরায়কর ধর্ম থেকে মুক্ত হন কিন্তু তিনি তখন শুধুমাত্র বিষয় পর্যবেক্ষণের উদয়-ব্যয় জ্ঞানে নিবদ্ধ থাকেন। তখন প্রতি পর্যবেক্ষণ কার্যে তিনি দেখেন : ‘প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়গুলি উৎপন্ন হয়েই পরক্ষণে বিলুপ্ত হয়’ এবং তাঁর নিকট ইহাও এরূপ প্রতিভাত হয়, যে বিষয় যেখানে উৎপন্ন হয় সে বিষয় সেখানেই বিলয় হয়, তাহা অন্য কোথাও গমন করেনা।

অনুরূপভাবে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেন কায়িক — মানসিক কার্যপ্রক্রিয়াগুলি উদয় হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বিলয় হয়। এক ক্ষণের পর পরক্ষণে উদয়-বিলয়শীল কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়াগুলি উদয় হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বিলয় হয়। এক ক্ষণের পর পরক্ষণে উদয়-বিলয়শীল কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া নিরন্তর পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে তাঁর যে জ্ঞান এবং অনুবোধ হয় তাতে তিনি অন্তরায় অতিক্রম করে জানতে পারেন ‘উদয়-বিলয় স্বতন্ত্র পর্যায়ে সংঘটিত হয়’ — ইহাই পূর্ণ উদয়-ব্যয় জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। এখানেই প্রতিপদা জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধির আরম্ভ। এই বিদর্শন জ্ঞান থেকে আরম্ভ হয়ে তা অনুলোম (১৩) জ্ঞান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে শেষ হয়।

৫. ভঙ্গজ্ঞান (Knowledge of Dissolution)

নাম-রূপের কার্যপ্রক্রিয়ায় যখন যেটা উৎপন্ন হয় তখন সেটা পর্যবেক্ষণ করে, তিনি তাদের পর্ব-পর্ব (অংশ), সন্ধি-সন্ধি (সংযোগ), টুকরো-টুকরো, ভগ্নাংশ-ভগ্নাংশ দেখেন (এবং জ্ঞাত হন) : ‘এখন ইহা উৎপন্ন হল, এখনই ইহার বিলয় হল।’ যখন সেই উদয়-বিলয় জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে, তীক্ষ্ণতাও বলবান হয়, তখন ইহা সহজেই উৎপন্ন হয় এবং বাধাহীনভাবে স্বয়ং চালিতের ন্যায় প্রবর্তিত হয়; নাম-রূপ কার্যপ্রক্রিয়াও সহজে পর্যবেক্ষণ করা হয়। যখন তীক্ষ্ণ জ্ঞান এরূপে প্রবর্তিত হয় তখন সংস্কার সমূহ অতি সহজেই পর্যবেক্ষিত হয়। তখন নাম-রূপ কার্যপ্রক্রিয়ার উৎপত্তি আদি মধ্য অবস্থা (উপস্থিতি), প্রবর্তন বা চলমান অবস্থা যাকে বলা হয় ‘অবিচ্ছিন্ন প্রবর্তমান কার্যপ্রক্রিয়া’ প্রভৃতি তাঁর নিকট স্পষ্ট হয় না; এমন কি হাত, পা, মুখ ইত্যাদি দেহের কোন অঙ্গই স্পষ্ট হয় না। তখন যোগী শুধুমাত্র নাম-রূপের বিলয় দর্শন করেন যাকে বলা হয় — অন্তর্হিত হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া অথবা ভঙ্গ হওয়া।

উদাহরণ : যখন উদরের উত্থানগতি পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন (উত্থানের) আদি বা মধ্য অবস্থা স্পষ্ট হয় না, শুধুমাত্র বিলয় বা অন্তর্হিত হওয়ারূপ শেষ অবস্থা

অর্থাৎ উদরের পতনগতি মাত্র স্পষ্ট হয়। আবার যখন হাত, পায়ের নমন গতি পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন আদি বা মধ্য কোন অবস্থা (নিমিত্ত করার) স্পষ্ট হয় না, এমন কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবয়বও (আকার) স্পষ্ট হয় না, শুধু মাত্র বিলয় বা অন্তর্হিত হওয়ারূপ শেষ অবস্থা স্পষ্ট হয় (প্রতীয়মান হয়)। দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার ব্যাপারেও অনুরূপ ধারণা করতে হবে।

এরূপ অবস্থায় যখন প্রত্যেক বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন তাঁর মনে হয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত অথবা বিষয় অস্তিত্বহীন, তার ফলে এই জ্ঞান স্তরে তাঁর মনে হয় তিনি যে বিষয় পর্যবেক্ষণে রত আছেন তা যেন বিলয় হয়ে পূর্বেই অন্তর্হিত অথবা অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে এবং যে চিত্ত দ্বারা সেই বিষয়কে পর্যবেক্ষণ করা হত তা'ও যেন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়েছে। এ কারণে যোগীর ধারণা হয় : 'আমার বিদর্শন ভাবনা পরিক্ষীণ (লুপ্ত) হয়েছে।' যোগীর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত।

পূর্বে তাঁর চিত্ত সাধারণতঃ (মনশ্চক্ষে দেখা) নিমিত্ত বা প্রতিবিম্বের আকার দর্শনে আনন্দিত হত, এমন কি উদয়-ব্যয় জ্ঞান পর্যন্ত সংস্কারের (সঞ্চার প্রজ্ঞাপ্তি) আকারসহ প্রতিভাত হত। সুতরাং তাঁর চিত্ত বা মন সহজে প্রভেদযোগ সংস্কারের (নিমিত্তের) বিশিষ্ট আকারের (কিহের, প্রতিবিম্বের) আকৃতি ধারণাসহ আনন্দ উপভোগ করত। কিন্তু এখন তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে (পূর্ব বর্ণনা অনুসারে), তাই সংস্কার সমূহের কোন প্রকৃতি অথবা আকৃতি দৃষ্ট (মনশ্চক্ষে) হয় না, এমন কি কোন স্থূল প্রজ্ঞাপ্তি (নিমিত্ত) ও দৃষ্ট হয় না। এই জ্ঞান স্তরে সংস্কার সমূহের উৎপত্তি অর্থাৎ উৎপত্তি কার্যপ্রক্রিয়ার প্রথম (আদি) অবস্থা দৃষ্ট হয় না (যেমন এগুলি উদয়-ব্যয়-জ্ঞানস্তরে হত); শুধুমাত্র ভঙ্গ বা বিলুপ্তি রূপ শেষ অবস্থা স্পষ্ট হয় যার প্রকৃতি একমাত্র ভঙ্গুরতা। সুতরাং যোগীর মন প্রথমে এ সকল বিষয়ে আনন্দ পেত না কিন্তু তিনি নিশ্চিত হবেন যে শীঘ্র তাঁর মন সেই স্তরের অনুশীলনে পরিচিত হয়ে বিষয়ের (কায়-মন কার্যপ্রক্রিয়ার) বিলুপ্তিতে বা ভঙ্গুরতা দর্শনে আনন্দ পাবে। এই প্রত্যয়ে তিনি আবার নিরন্তর পর্যবেক্ষণ কার্য অনুশীলনে মনোযোগী হন।

এভাবে পর্যবেক্ষণ রত অবস্থায় যোগী প্রত্যেক পর্যবেক্ষণে দুটি বিষয়ের উপস্থিতি অনুবোধ করেন — একটি হল আরম্ভণ বা বিষয়, অপরটি হল আরম্ভণিকা (বা বিষয় জ্ঞান বা প্রজ্ঞান চিত্ত) বা যুগ্মভাবে বিলুপ্ত ও ভঙ্গ হয় এবং এক যুগ্ম বিষয়ের

১. এ সকল নিমিত্তকে সঞ্চার প্রজ্ঞাপ্তি বা আকার প্রজ্ঞাপ্তি বলা হয়। অন্য দুই প্রকার প্রজ্ঞাপ্তি : একক চলমান সম্ভ্রতি প্রজ্ঞাপ্তি এবং বহুতর সংযুক্ত সমূহ বিজ্ঞাপ্তি।

পর আর এক যুগ্ম বিষয় বিলুপ্ত ও ভঙ্গ হয়। উদরের একবার উত্থানগতির সঙ্গে বহুতর কায়িক কার্যপ্রক্রিয়ার উত্থানগতি সংগঠিত হয়, সেগুলিও ক্রমধারায় ভঙ্গ হয়। ইহা যেন গ্রীষ্মকালে মরুভূমির মরীচিকার ন্যায় নিরন্তর ক্ষণে ক্ষণে বিলুপ্তি দর্শনের মত অথবা প্রবল বর্ষণ ধারায় জলোপরি বৃষ্টি বিন্দু রচিত বুদবুদের দ্রুত ক্রম: বিনাশের মত অথবা সারি সারি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের বাত্যাঘাতে একটির পর একটি নিবে যাওয়ার মত অনুরূপভাবে পর্যবেক্ষণীয় কায়িক কার্যপ্রক্রিয়া ক্ষণে ক্ষণে বিলুপ্ত ও ভঙ্গ হচ্ছে মনে হয় এবং কায়িক কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণরত চিত্তেরও কায়িক কার্যপ্রক্রিয়ার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত ও ভঙ্গ হচ্ছে মনে হয়। অন্যান্য কায়িক এবং মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণকালেও একইরূপে তা ভঙ্গ হয় বলে তাঁর নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তার ফলে তাঁর নিকট এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, দেহের যে কোন অংশ পর্যবেক্ষণ করা হোক না কেন তা'ই প্রথমে বিলয় (ভঙ্গ) হয় এবং তারপর যে চিত্ত পর্যবেক্ষণে নিরত থাকে তা বিষয়কে অনুসরণ করে (অর্থাৎ ভঙ্গ হয়)। এ ব্যাপার থেকে যোগী নির্মলভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন বা প্রজ্ঞাত হন: ধারাবাহিক যুগ্ম কার্যপ্রক্রিয়ার প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যে কোন বিষয় হোক না কেন তা এবং সে বিষয় গ্রহণকারী চিত্তও ভঙ্গ হয়। (ইহা স্মরণ করা উচিত যে এই জ্ঞান বিষয় পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করা হয়েছে, ইহা কোন যুক্তি-তর্ক সম্বৃত মত নয়)।

ইহা দুটি বিষয়ের যথার্থ শুধু যুগপৎ যুগ্ম ভঙ্গুরতা জ্ঞান, তা হল : ১. ইহা চক্ষুদ্বারে অথবা ষড়-ইন্দ্রিয় দ্বারে আগত বিষয় এবং ২. সেই বিষয় পর্যবেক্ষণরত চিত্তেরও বিলয় বা ভঙ্গুরতা জানা — ইহাকে ভঙ্গজ্ঞান বলা হয়।

৬. ভয়জ্ঞান (Awareness of Fearfulness)

যখন ভঙ্গজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন সকল বিষয় এবং বিষয় গ্রহণকারী চিত্ত (আরম্ভণ-আরম্ভণিকা) সর্ব সংস্কারের ভঙ্গুরতা দর্শনে ক্রমান্বয়ে ভয়জ্ঞান এবং উচ্চতর জ্ঞান (গুলি), তাদের প্রত্যেকের ভীতিজনক অবস্থা (ভয়-উৎপত্তি স্থান) সহ উৎপন্ন হয়।

যুগ্ম বিষয়ের ভঙ্গুরতা দর্শন করে অর্থাৎ যে কোন বিষয় এবং বিষয় গ্রহণকারী চিত্ত পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাদের ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গুরতা দর্শন করে, যোগী অনুমান মাধ্যমে প্রজ্ঞাত হন : 'অতীত কারণ নির্ভর বিষয় (সংস্কার সমূহ) এই প্রকারের ভঙ্গ হয়েছে,

১. ভয় অর্থে নিজস্ব ভয় এবং বস্তুবিষয়ক ভয় বা বিপদ বুঝায়। এ উভয়ের ভঙ্গুরতা দর্শনে যোগীর ভীতি উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে এ উভয় ভয়কেই বুঝায়।

তা ভবিষ্যতেও অনুরূপ প্রকারে ভঙ্গ হবে এবং বর্তমানেও তা ভঙ্গ হচ্ছে। যখন তিনি প্রকটিত (যড়-ইন্দ্রিয় দ্বারে উৎপন্ন) সংস্কারগুলিকে পর্যবেক্ষণ করবেন তখন সংস্কার সমূহ তাঁর নিকট ভয়রূপে (সমূহ বিপদরূপে) উপস্থিত হবে। সুতরাং পর্যবেক্ষণ কালেই যোগী জ্ঞাত হবেন: 'এই সংস্কার সমূহ ভীতিরই কারণ বটে।'

সংস্কার সমূহের ভীতিজনক অনুভূতিই — ভয় উপট্ঠান-জ্ঞান। ইহাকে ভয়জ্ঞান বলা হয়। সে অবস্থায় যোগীর মন ভয়ে সংকুচিত থাকে এবং নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে হয়।

৭. আদীনব (দোষ) জ্ঞান (Knowledge of Misery)

ভয়জ্ঞান সমন্বিত চিত্ত সংস্কার সমূহে ভয় দর্শন করে নিরন্তর পর্যবেক্ষণকালে অচিরে আদীনব জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন পর্যবেক্ষণীয় আরম্ভণ (বিষয়) এবং পর্যবেক্ষণশীল আরম্ভণিকা (চিত্ত) অথবা যা কোন প্রকার জীবন অথবা ভব (জীবভূমি) ইত্যাদি বিষয় বা চিত্তপথে আগত হয় তা, সর্বত্র, সর্বসংস্কার তাঁর নিকট অসার, (দীপ্তিহীন) স্বাদহীন দুঃখ, স্বাদহীনতা এবং দোষযুক্ত দেখেন। সুতরাং এ স্তরকে আদীনব জ্ঞান (দোষ-দর্শন) বলা হয়।

৮. নির্বিদাজ্ঞান (Knowledge of Disgust)

সংস্কারসমূহকে এরূপ দোষযুক্ত দেখে, ইহাতে (বিষয়ে) তাঁর চিত্ত অভিরমিত হয় না। তাঁর মন সংস্কার থেকে নিবৃত্তি ইচ্ছা করে। তখন তাঁর মনে ঔদাসীন্য ও উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয়। মনের এরূপ অবস্থাতে তিনি ভাবনা ত্যাগ না করে নিরন্তর বিদর্শন চর্যায় সময় অতিবাহিত করেন; তাঁর জানা উচিত: মনের এ অবস্থা ভাবনায় অনভিরতি নয়, তা সংস্কার সমূহের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ স্বরূপ-নির্বিদা বা নির্বেদজ্ঞান। তাঁর মন কোন আরাম ও বিলাসপূর্ণ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করলে বা মনোজ্ঞ আকর্ষণীয় বিষয়ের প্রতি নিবেশ করলেও তিনি তাতে কোন আনন্দ লাভ করেন না, বা তুষ্ট হন না। তখন তাঁর মন নির্বাণের দিকে নমিত, দোলায়িত এবং প্রবর্তিত হয়। সে সময় পর্যবেক্ষণ কার্যের মাঝে যোগীর মনে এরূপ বিচার উৎপন্ন হয় : 'ক্ষণে ক্ষণে ভগ্নধর্মী সর্বসংস্কারের উপশমই সুখ'।

৯. মুমুক্ষজ্ঞান (মুক্তি কামনা জ্ঞান) (Knowledge of Desire for Deliverance)

নির্বিদা জ্ঞান প্রযুক্ত হয়ে যোগী যখন পর্যবেক্ষণ নিরত থাকবেন তখন সংস্কার সমূহকে পরিত্যাগ করবার অথবা তা থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞানকে মুক্তিকামতা বা মুমুক্সা জ্ঞান বলে।

সে সময় তাঁহার শরীরে নানা প্রকার দৈহিক বেদনা উৎপন্ন হয় এবং একই ইর্যাপথে (বা ধ্যানাসনে) একই অবস্থায় অধিক সময় অবস্থান করতে ইচ্ছা হয় না। এরূপ অবস্থা অনুভূত না হলেও সংস্কারের প্রতি তাঁর পূর্বের চেয়েও এক অস্বস্তিকর ভাব উৎপন্ন হয়।

এ কারণে পর্যবেক্ষণ কার্যের মাঝে মাঝে এরূপ ইচ্ছা প্রকট হয়, ‘অহো! আমি যেন শীঘ্র এ সকল সংস্কারসমূহ থেকে মুক্ত হই! আমি যেন এ সংস্কার সমূহের উপশম অবস্থায় পৌছাই। আমি যেন সংস্কারসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করতে সমর্থ হই।’ চিন্তের এই সংযোগ স্থলে তাঁর পর্যবেক্ষণশীল চিন্ত প্রত্যক্ষীকৃত বিষয় হতে সংকুচিত হয়ে আসে এবং অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করে।

১০. প্রতিহিংসা (পুনর্পর্যবেক্ষণ) জ্ঞান (Knowledge of Reobservation)

সংস্কার-মুমুক্ষু যোগী সংস্কার মোচন করবার জন্য এবং সংস্কার মুক্ত হওয়ার জন্য পুনঃদৃঢ়বীর্য সহকারে সংস্কার সমূহ পর্যবেক্ষণে নিরত হন। তখন এ অবস্থায় প্রবর্তিত জ্ঞানকে প্রতিসংখ্যা জ্ঞান রূপে অভিহিত করা হয়। প্রতিসংখ্যা শব্দের অর্থ হল পুনর্পর্যবেক্ষণ বা পুনর্ভাবনা। তখন তাঁর নিকট সংস্কার সমূহের প্রকৃতি বা স্বভাব যথা অনিত্যতা, দুঃখময়তা এবং অনাত্মতা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। এই ত্রিলক্ষণের মধ্যে ‘দুঃখ-স্বভাব’ অধিকতর প্রকট হয়।

এ স্তরেও যোগীর দেহে নানা প্রকার দুঃখবেদনা অত্যন্ত তীব্রতর সঙ্গে ও ক্রমবর্ধমানরূপে আবির্ভূত হয়। তখন তাঁর নিকট সকল নাম-রূপ ধারণ ও কার্যক্রিয়া পদ্ধতি অসহ্য রোগপুঞ্জ এবং দুঃখক্লেশ রূপে উদ্ভাসিত হয়। এই অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর অবস্থা তাঁকে এক এক ইর্যাপথে (অর্থাৎ শয়ন, গমন, দাঁড়ান ও উপবেশন অবস্থায়) অবস্থান অসম্ভব করে তোলে। তখন তিনি একাসনে (এক অবস্থায়) অধিক্ষণ অবস্থান করতে সমর্থ হন না। তিনি তা বার বার পরিবর্তন করতে চান। তাঁর এই অবস্থা সংস্কারের প্রতি বিরূপতা রূপ দুঃখানুভূতির অভিব্যক্তি। যদিও তিনি শারীরিক অবস্থান পরিবর্তন প্রয়াসী তথাপি তিনি যেন সে ইচ্ছার বশবর্তী না হন। উপরন্তু তাঁর একই ইর্যাপথে নিশ্চল অবস্থায় স্থিত হয়ে বিষয় পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া উচিত। এভাবে কাজ করলে তাঁর অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর অবস্থার উপশম হবে।

এখন তাঁর বিদর্শন জ্ঞান বলিষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ হয়েছে, তাই তাঁর দুঃখবেদনা উপস্থিত হলে পর্যবেক্ষণ মাত্র ক্ষণেকের মধ্যে উপশম হবে। যদি কোন দুঃখবেদনা সম্পূর্ণরূপে উপশম নাও হয় তথাপি তিনি অনুভব করবেন যে সে বেদনা যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এখানে বলা যায়: প্রতিক্ষণের এক একটি এই দুঃখানুভূতি সমান্তরাল পর্যবেক্ষণে যে ভঙ্গ — ক্ষয় — বিলয় পৃথক পৃথকভাবে হচ্ছে তা পরিলক্ষিত হবে। অন্য অর্থে : সংমর্শন জ্ঞান স্তরে থাকাকালে যে দুঃখবেদনা নিয়ত প্রবর্তন রূপে একাকারে প্রবাহিত হত এখন তা হবে না। যদি ভাবনা পরিত্যাগ না করে সেই দুঃখবেদনা নিরন্তর দৃঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে তা শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হবে। এভাবে বেদনা দূরীভূত হলে তা চিরতরের জন্য উপশম হবে, আর উৎপন্ন হবে না। এ উপায়ে তাঁর বিদর্শন-জ্ঞান বলিষ্ঠ ও সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হলেও যোগী কিন্তু সেটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না। তিনি চিন্তা করবেন : ‘আমার বিদর্শন জ্ঞান এখনও নির্মল হয়নি’;। সেই চিন্তাও যোগীকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা ত্যাগ করতে হবে এবং তারপর যোগীর নাম-রূপ কার্যপ্রক্রিয়া যখন যা উৎপন্ন হয় তখন তা পর্যবেক্ষণ করে নিরন্তর ভাবনা করা কর্তব্য।

যদি তিনি অধ্যবসায় সহকারে উক্ত বর্ণনা অনুসারে ভাবনা করেন তবে তাঁর পর্যবেক্ষণ কার্য প্রতিক্ষণে, প্রতি ঘণ্টায় বা প্রতি দিনে দ্রুত নির্মল থেকে নির্মলতর হবে। তখন তিনি দুঃখবেদনাদায়ক অনুভূতি, একাসনে দীর্ঘসময় অবস্থানে অসমর্থতা, অস্বস্তি কর অবস্থা এবং বিদর্শন ভাবনায় অ-নির্মলতাবোধ ইত্যাদি অতিক্রম করে যাবেন। এ অবস্থায় তাঁর পর্যবেক্ষণ দ্রুত কার্য সম্পাদন করবে এবং প্রতি মুহূর্তে পর্যবেক্ষণে পরিষ্কারভাবে অনিত্য লক্ষণাদি সম্যক উপলব্ধি করবেন।

অনিত্যাদি ত্রিলক্ষণের যে কোন একটি দ্রুত ক্রম পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ কর্মতৎপরতা দ্বারা উপলব্ধি হয় বলে তাকে ‘দৃঢ় প্রতিসংখ্যা জ্ঞান’ বলা হয়।

১১. সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান (Knowledge of Equanimity about formations)

যখন প্রতিসংখ্যা জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে তখন যথা প্রকটিত কায়িক-মানসিক সংস্কার সমূহ (নাম-রূপ কার্যপ্রক্রিয়া) স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে (জেনে জেনে) নিজকে

নিজে বহনের ন্যায় প্রাকৃতিকভাবে প্রবর্তনের নাম — সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান ।
তখন সংস্কার সমূহ মনে উপস্থাপনের জন্য কোন প্রকার প্রচেষ্টার দরকার হয় না,
তা জানার জন্যও কিছু করার প্রয়োজন নেই । এক একটি আরম্ভণ বা বিষয়ের
পর্যবেক্ষণ কার্য শেষ হলে অন্য আরম্ভণ স্বয়ং উপস্থিত হয় । বিদর্শন জ্ঞানও স্বয়ং
আরম্ভণ (বিষয়) পর্যবেক্ষণ করে উৎপন্ন হয় । যোগীর যেন আর কোন প্রকারের
প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই ।

পূর্বে সংস্কার সমূহের ভগ্নতা দর্শন করে ক্রমপর্যায়ে ভয়ঙ্কর ভয়জ্ঞান, আদীনব
(দোষ) জ্ঞান, নির্বিদাজ্ঞান, মুক্তিকামনাজ্ঞান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু তাতে
সন্তুষ্টি আসেনি । তবে এখন এ সকল মানসিক বিষয় আর উৎপন্ন হয় না, যদিও
বর্তমান সময়ে সংস্কার সমূহ যে অতি শীঘ্র ভগ্ন হচ্ছে তা খুব ঘনিষ্ঠভাবে অনুবোধ
হয় । দুঃখবেদনা উৎপন্ন হলেও তাতে মানসিক অনুতাপ বা কাতরতা উৎপন্ন হয়
না, তা সহ্য করার মত ধৈর্যের অভাব হয় না । সাধারণতঃ এ স্তরে দুঃখবেদনা
সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে, অর্থাৎ আর উৎপন্ন হয় না । যদিও যোগী কোন দুঃখপ্রদ
বা অনুশোচনায়ুক্ত কোন বিষয় চিন্তা করেন তাতেও ভয় বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না ।
ইহা প্রথমতঃ সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান স্তরে — ভয়ত্যাগ (ভয়-বিপ্রহান) ।

পূর্বে উদয়-ব্যয় জ্ঞান স্তরে বিদর্শন-নির্মলতা হেতু অপার আনন্দ উৎপন্ন হত,
কিন্তু এখন সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান স্তরে অতি শান্ত-সূক্ষ্ম-বিশুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও
সেইরূপ অপার আনন্দ উৎপন্ন হয় না । যদিও তিনি বর্তমানে কোন আনন্দ প্রদায়ক
কোন বিষয় বা ইচ্ছিত আরম্ভণ দর্শন করেন বা মনস্কার (চিন্তা) করেন তবু প্রবল
আনন্দ উৎপন্ন হয় না । ইহা সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান স্তরে — আনন্দ বিপ্রহান
(পরিত্যাগ) ।

ছয় ইন্দ্রিয় দ্বার পথে আগত বিষয় (আকাজ্জিক্ত বা অনাকাজ্জিক্ত) যথাভূতভাবে
আরম্ভণমাত্র জেনে সেগুলির প্রতি আগ্রহ বা নিগ্রহ পোষণ না করে সমভাবে
পর্যবেক্ষণ করেন । ইহাকে সমতাজ্ঞানে প্রজ্ঞানন বলা হয় । ইহা সংস্কারোপেক্ষা
স্তরে — সমতা দর্শন বিশুদ্ধি মার্গে এ তিন গুণ সম্বন্ধে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :
'তিনি ভয় এবং আনন্দ প্রস্থান (ত্যাগ) করে সর্বসংস্কারের প্রতি উদাসীন এবং
মধ্যস্থ (নিরপেক্ষ) হন ।'

'এখন থেকে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে পুনঃ পর্যবেক্ষণ কার্য আরম্ভ করব' এইরূপ সংকল্পে
যদি তিনি পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন তবে অচিরে তাঁর পর্যবেক্ষণ নির্মল গুণযুক্ত

হয় এবং তা নিজেকে নিজে বহনের মত গতি প্রাপ্ত হয়। তারপর থেকে যোগীর আর কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। যদিও তিনি স্বেচ্ছায় কোন প্রচেষ্টা করেন না তবুও তাঁর নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ অনায়াসে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রবর্তন করেন। এমন কি দুই বা তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বিনা বাধায় চলতে থাকে। ইহা সংস্কারোপেক্ষা স্তরে দীর্ঘসময় পর্যবেক্ষণ প্রতিপত্তি (সংস্থিতি ভাব)। প্রতিসম্ভিদামার্গে এ সম্বন্ধে এরূপ উক্ত হয়েছে : সংস্থিতি (দীর্ঘকালস্থায়ী) প্রজ্ঞাই সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান।’ বিশুদ্ধি মার্গের মহাটিকায় বলা হয়েছে : ‘এ জ্ঞানের বিশেষত্ব হল নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।’

বর্তমান অবস্থায় পর্যবেক্ষণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্ব-চালিতের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় মনকে বহির্মুখী নাম-রূপ বিষয়ে স্বেচ্ছায় নিয়োজিত করতে চাইলেও তা সে মুখী হয় না, গমন করলেও তা অতি অল্প সময়ের জন্য মাত্র, মন পুনঃপর্যবেক্ষণীয় আরম্ভে প্রত্যাবর্তন করে নিরন্তর পর্যবেক্ষণে রত হয়। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে (মন) সঙ্কুচিত হয়, পশ্চাদগমন করে, প্রত্যাবর্তন করে, তাতে সম্প্রসারিত (রমিত) হয় না।

১২. উত্থানগামিনী বিদর্শন (Insight leading to Emergence)

বহু গুণ-ফল-শক্তিয়ুক্ত সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান প্রভাবে যোগী যথা-প্রকটিত সংস্কার সমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। যখন এই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে এবং তীক্ষ্ণ, বলবান, সুবিশদ হয় এবং ভরবেগ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ উত্থানগতির চরম সীমায় পৌঁছে), তখন প্রত্যেক সংস্কার পর্যবেক্ষণের সময় সংস্কারের ভগ্নতা দর্শনে তাদের যে কোন একটি সংস্কার সম্বন্ধে অনিত্য অথবা দুঃখ অথবা অনাত্ম জ্ঞান অনুবোধ হয় (জন্মে)। সে প্রকার পর্যবেক্ষণ রূপ নির্মল এবং সুবিশুদ্ধ প্রজ্ঞায় ত্রিলক্ষণের যে কোন একটি লক্ষণ স্বতঃই দুই বা তিন বার অথবা বহুবার দ্রুত (চিহ্নক্ষণ শ্রেণীতে) ক্রমপর্যায় (পর পর) নিজেকে প্রতিভাত করে। ইহাই উত্থানগামিনী বিদর্শন। তারপর উত্থানগামিনী বিদর্শন মণ্ডিত চিহ্নক্ষণ শ্রেণীর শেষ পর্যবেক্ষণ চিহ্ন (নির্বাণকে

১. বিশুদ্ধিমার্গে বলা হয়েছে উত্থানগামিনী বিদর্শন জ্ঞানের শেষ পর্যায়। তা সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান, মুক্তি, কামনাজ্ঞান এবং প্রতিসংখ্যা জ্ঞানের সমতুল্য। ইহাকে উত্থানগামিনী বিদর্শন বলা হয় কারণ ইহা কারণ নির্ভর সংস্কার পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে লোকোত্তর মার্গে উন্নীত করে — যার বিষয় হল নির্বাণ।

বিষয়রূপে অবলম্বন করে) সর্বসংস্কার নিরোধ নির্বাণে স্পন্দিত হয় (অবগাহন করে) তখন তাঁর নিকট সর্বসংস্কার উপশম রূপ ‘নিরোধ ধর্ম’ প্রত্যক্ষ হয়।

এরূপ ‘নির্বাণ দর্শন পর্যায়’ সম্বন্ধে শাস্তা (বুদ্ধ) তাঁর বিভিন্ন ধর্ম দেশনায় এভাবে প্রকাশ করেছেন: ধর্ম চক্ষু উৎপন্ন হল, যা কিছু উৎপাদনধর্মী (উৎপত্তিশীল) তা বিলয়ধর্মী (বিনাশশীল)।’ এখানে ‘বিলয়ধর্মী’ অর্থে উৎপাদনধর্মী সর্বসংস্কার সমূহের নিরোধ উপলব্ধি প্রজ্ঞানকে নির্দেশ করে।

মিলিন্দ প্রশ্নেও ভদন্ত নাগসেন কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়েছে : ‘তাঁর (যোগীর) চিত্ত যখন বিষয় পর্যবেক্ষণরূপ মনঃসংযোগ অনুশীলণ করে, তখন সেই চিত্ত, ‘প্রবর্তন’ অতিক্রম করে — ‘অপ্রবর্তনে’ অবতরণ করে। হে মহারাজ! যিনি সম্যক্ প্রতিপন্ন বা সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণকারী তিনি ‘অপ্রবর্তনে অবতরণকারী (অনুপ্রাপ্ত), তিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছেন’, বলা হয়।

ইহার অভিপ্রায় বা অর্থ হল: নির্বাণ সাক্ষাৎ ইচ্ছুক যোগীর ছয় ইন্দ্রিয়দ্বারে উৎপন্ন কায়িক-মানসিক (নাম-রূপ) সংস্কারগুলি (কার্যপ্রক্রিয়াগুলি) নিয়ত পর্যবেক্ষণ করা উচিত মনস্কার অর্থে: পর্যবেক্ষণ নিরত চিত্তের সংস্কার সমূহের উদয়-ব্যয় (উত্থান-পতন) নিরীক্ষণকে বুঝায়। যে পর্যন্ত অনুলোম জ্ঞান স্তরে পৌছান না যায়, সে পর্যন্ত এই পর্যবেক্ষণ চিত্ত (মনস্কার) প্রতিক্ষণে (প্রত্যাযোৎপন্ন) কায়িক-মানসিক নিরন্তর প্রবর্তনশীল সংস্কার সমূহের ন্যায় অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে। সর্বশেষ পর্যায়ে চিত্ত সেই নিরন্তর প্রবর্তনশীল সংস্কারের উপর পতিত না হয়ে তা অতিক্রম করে’ — ‘অপ্রবর্তনে অবতরণ’ করে। ইহা কায়িক-মানসিক (নাম-রূপ) সংস্কার উৎপত্তি, যাকে বলা হয় — ‘প্রবর্তন’ তার বিপরীত (বা বিপক্ষ)। অপর পক্ষে যাকে বলা হয় — ‘অপ্রবর্তনে অবতরণ করে’ তা হল প্রত্যাযোৎপন্ন সংস্কার উপশমরূপ — ‘নিরোধে’ অবরোহন বা আরোহণ।

পূর্ব থেকেই সম্যক্ভাবে ভাবনা অনুশীলন করে এবং কোন প্রকারে বিপথগামী না হয়ে উদয়-ব্যয় জ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞান তথা শীলবিশুদ্ধি, চিত্তবিশুদ্ধি, দৃষ্টি বিশুদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে যোগী যখন অপ্রবর্তনে অবতরণ করেন (অর্থাৎ সে চিত্ত নির্বাণে আরোহণ করেন) তখন তাঁকে ‘নির্বাণদর্শী’ অভিহিত করা হয়। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছেন বা সঠিকভাবে সত্য দর্শন করেছেন, তা’ও বলা যায়।

১৩. অনুলোম জ্ঞান (Knowledge of Adaptation)

এখানে পর্যবেক্ষণ শ্রেণীর (চিন্তাশ্রমের) শেষ চিন্তাশ্রমে যে উত্থানগামিনী বিদর্শন সংগঠন করে সেই শেষ (বা অন্তিম) চিন্তাশ্রমের জ্ঞানকে — অনুলোম জ্ঞান বলা হয়।

এখানেই প্রতিপাদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধির শেষ।

১৪. গোত্রভূজ্ঞান (Maturity Knowledge)

তদনন্তর অর্থাৎ পরক্ষণে এক প্রকার জ্ঞান নিজেকে স্বতঃই প্রতিভাত করে যেন তা এই মুহূর্তে প্রথম নির্বাণে অবতরণ করল, ইহা প্রত্যয়োৎপন্ন সংস্কার বিমুক্ত, কারণ ইহাই সংস্কার নিরোধ। ইহা গোত্রভূজ্ঞান।^২

১. অনুলোম জ্ঞান এই নাম ধারণ করার অর্থ হল : ইহা পূর্ব এবং পরবর্তী মনস্তরকে সংযোজন করে। ইহা পূর্ববর্তী ৮ প্রকার বিদর্শনজ্ঞানকে তাদের কার্যসহ ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মের (যা সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করে) সংযোগ স্থাপন করে। তবে মার্গজ্ঞান লাভ জনিত পূর্ণতা আনে। ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম (১) চার অনুদর্শন : কায়-বেদনা-চিন্তা-ধর্ম (২) চার সম্যক প্রধান : উৎপন্ন পাপ চিত্ত বর্জন, অনুৎপন্ন পাপচিত্তের অনুৎপত্তি, অনুৎপন্ন কুশল চিত্তের উৎপত্তি, উৎপন্ন কুশলচিত্তের বৃদ্ধি (৩) চার ঋদ্ধিপাদ : হ্রদ, বীর্য, চিত্ত, মীমাংসা (৪) পঞ্চ ইন্দ্রিয় : শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা (৫) পঞ্চ বল : শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা (৬) সপ্তবোধ্যঙ্গ : স্মৃতি, ধর্মবিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি, উপেক্ষা (৭) অষ্ট মার্গ : সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি।

২. গোত্রভূজ্ঞান : সাধারণ কথায় গোত্র পরিবর্তন অর্থাৎ পৃথকজন (অমুক্ত) গোত্র থেকে আর্য গোত্রে পদার্পণ অর্থাৎ স্রোতাপন্ন ইত্যাদিতে উন্নীত হওয়া। বিদর্শনের পূর্ণতাহেতু যোগীর লোকান্তর মার্গ-ফল স্তরে উত্তরণ। গোত্রভূ জ্ঞান এক চিন্তাশ্রমে একবার উদয় হয়, ইহা পুনর্বার উদয় হয় না, কারণ ইহার পর স্রোতাপত্তি চিত্ত উৎপন্ন হয়; সেরূপ সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হত্ব মার্গ চিত্তও মাত্র একবার উৎপন্ন হয়।

[সপ্তম] জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি (Purification by Knowledge and Vision).

১৫. মার্গজ্ঞান (Path Knowledge)

পরক্ষণেই যে জ্ঞান অনুগামী হয় (বা অনুসরণ করে) তা সেই একই নির্বাণে বিহার করে যা সর্বসংস্কার বিমুক্ত, কারণ ইহাও সংস্কারনিরোধ। ইহাকে মার্গজ্ঞান^১ বলা হয়। ইহাকে জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধিও বলা হয়।

১৬. ফলজ্ঞান (Fruition Knowledge)

পরক্ষণে পূর্ববর্তী মার্গ জ্ঞানের ধারা বাহিত হয়ে যে পরিপূর্ণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই ফলজ্ঞান। ইহাও সর্বসংস্কার বিমুক্ত, কারণ ইহাও সংস্কার-নিরোধ। ইহাকে ফলজ্ঞান^২ বলা হয়।

১৭. প্রত্যক্ষবেক্ষণ জ্ঞান (পর্যবেক্ষণ) (Knowledge of Reviewing)

গোত্রভূ-মার্গ-ফল, এ তিন জ্ঞানের প্রবর্তন সময় দীর্ঘস্থায়ী নয়, ইহা অত্যন্ত কম সময় অর্থাৎ গোত্রভূ ও মার্গ এক চিত্তক্ষণ বা মুহূর্ত মাত্র এবং ফলজ্ঞান দুই বা তিন চিত্তক্ষণ মাত্র স্থায়ী থাকে। তারপর পর্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পর্যবেক্ষণ জ্ঞানের মাধ্যমে যোগী হৃদয়ঙ্গম করেন যে উত্থানগামিনী বিদর্শন উৎপন্ন হয়েছিল দ্রুত পর্যবেক্ষণ দ্বারা এবং তার পরক্ষণের অন্তিম পর্যবেক্ষণ কালে তিনি সর্বসংস্কার নিরোধ মার্গ চিত্তে (জ্ঞানে) প্রবেশ করেছেন। ইহা মার্গ পর্যবেক্ষণ বা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান।

তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁর চিত্ত মার্গ এবং পর্যবেক্ষণ চিত্তের মধ্যবর্তী সময়ে একই প্রকার নিরোধ অবস্থায় বিহার করেছিল। ইহা ফল-পর্যবেক্ষণ জ্ঞান।

১. মার্গজ্ঞান : চার লোকোত্তর জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত—যথা স্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অর্হত্ব মার্গজ্ঞান। এখানে স্রোতাপত্তি মার্গকে নির্দেশ করেছে। গোত্রভূ জ্ঞানের ন্যায় মার্গজ্ঞান এক চিত্তক্ষণের জন্য স্থিত হয়, তারপরে ফলজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। ফলজ্ঞান অনেকবার উৎপন্ন হয়, ইচ্ছা করেও ফল-সমাপত্তি অনুশীলনে প্রবেশ করা যায়।

২. নির্বাণ এখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ইহা আর এখন চিন্তাময়ী জ্ঞানের বা চিন্তন বিষয় নয়।

তিনি পুনঃ উপলব্ধি করেন, এইক্ষণে তিনি যে সর্বসংস্কার নিরোধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা সম্পূর্ণ সর্বসংস্কার বিমুক্ত। ইহা নির্বাণ প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান।

এ বিষয়ে বিশুদ্ধি মার্গে বলা হয়েছে : ‘সে পথ অতিক্রম করে আমি এসেছি — এভাবে তিনি মার্গ পর্যবেক্ষণ করেন।’ ‘ইহা আমার ফল লাভ’, এভাবে তিনি ফল পর্যবেক্ষণ করেন। ‘আমার দ্বারা সেই পরমপদ ধর্মারম্ণরূপে ভেদ’ হয়েছে — এভাবে তিনি অমৃত (মৃত্যুহীন) নির্বাণ পর্যবেক্ষণ করেন।”

কোন কোন যোগী (কিন্তু সকলে নয়) ক্লেশ (আবিলতা) পর্যবেক্ষণ করেন।^১ একরূপে পর্যবেক্ষণ করার পরও যোগী কায়িক-মানসিক কার্যপ্রক্রিয়াগুলি যখন যা প্রকটিত হয় তখন তার পর্যবেক্ষণ অনুশীলনে নিরত থাকেন। এভাবে পর্যবেক্ষণ নিরত থাকাকালে তাঁর মনে হয় তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুশীলন অত্যন্ত স্থূল হচ্ছে, আগের মত সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের স্তরের মত আর সূক্ষ্ম নয়। একরূপ কেন হয়? একরূপ হওয়ার কারণ হল, তাঁর বর্তমান জ্ঞান ‘উদয়-ব্যয় জ্ঞান’ স্বভাবের মত। আর্য্য-শ্রাবকরা (স্রোতাপন্ন, স্কৃদাগামী প্রভৃতি) পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভাবনা যখন পুনর্বীর আরম্ভ করেন তখন প্রথমতঃ উদয়-ব্যয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে একরূপ হওয়াই ইহার ধর্মতা (স্বাভাবিক নিয়ম)।

যখন কোন কোন যোগী মার্গ এবং ফলজ্ঞান থেকে উত্থিত হন (উঠেন) তখন তাঁদের নিকট মার্গ-ফল অনুভূতি সঞ্জাত বলবতী শ্রদ্ধা, সুখ, প্রীতি, প্রশান্তি সর্বদেহে তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হয়। এ কারণে সে সময় প্রকটিত বিষয় পর্যবেক্ষণ অনুশীলন করতে তাঁরা সমর্থ হন না। যদিওবা তাঁরা দ্বিগুণ প্রচেষ্টায় বিষয় উৎপত্তিক্ষণে পর্যবেক্ষণ অনুশীলনে তৎপর হন, তবুও তাঁরা বিষয়গুলি পরিষ্কার এবং পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণে অসমর্থ হন। তাঁরা তখনও প্রবলতর আকারে প্রীতি, প্রশান্তি এবং সুখ উপভোগ করেন। বেগবতী শ্রদ্ধা জনিত একরূপ অত্যধিক চিন্তা প্রসন্নতা এক, দুই ঘণ্টা বা আরও অধিক সময় নিরন্তর প্রবর্তিত থাকে। অতি প্রসন্ন চিন্তা যেন কোন এক অতুজ্জ্বল আলোকমণ্ডিত ও প্রীতিপ্রদায়ক মুক্ত অঙ্গনে স্থিত আছে। প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রশান্ত চিন্তাকে যোগীগণ একরূপে প্রশংসা করেছেন : ‘পূর্বে আমার নিকট একবারও একরূপ সুখ অনুভূত হয়নি এবং একরূপ সুখে অভিজ্ঞতাও হয়নি।’

১. অবশিষ্ট আবিলতা পর্যবেক্ষণ স্রোতাপন্ন, স্কৃদাগামী স্তরে সাধারণতঃ করা হয় না, কেহ কেহ করেও থাকেন। তবে অর্হত্ব মার্গে সকল আবিলতার অবসান হয়, তখন অবশিষ্ট আবিলতা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না।

দুই বা তিন ঘণ্টা পর সেই শ্রদ্ধা, সুখ, প্রীতি এবং প্রশান্তি ক্রমে ক্ষীণ হয়। তখন যোগী যথা প্রকটিত নাম-রূপ কার্যপ্রক্রিয়া যথাযথরূপে পৃথক পৃথকভাবে এবং নির্মল আকারে পর্যবেক্ষণ সমর্থ হবেন। কিন্তু সে সময়েও প্রথমেই উদয়-ব্যয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

১৮. ফল সমাপত্তি (Attainment of Fruition)

এরূপে পর্যবেক্ষণ নিরত থাকলে, ক্রমে ক্রমে যোগীর বিদর্শন জ্ঞান বৃদ্ধি হবে এবং শীঘ্রই সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানে উন্নীত হবেন। যদি তাঁর (এ অবস্থায়ও) সমাধি বা একাগ্রতা অসম্পূর্ণ থাকে, তবে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান বার বার উৎপন্ন হবে। যদি তাঁর একাগ্রতা পূর্ণতা লাভ করে, তবে যিনি শুধুমাত্র প্রথম মার্গের ফল লাভের জন্য অনুশীলন মাধ্যমে বিদর্শন চর্চা করেন, তাঁর সর্বসংস্কার নিরোধ রূপ প্রথম মার্গের ফল-সমাপত্তিই লাভ হবে। ইহা প্রথম মার্গ-ফল চিত্ত লাভের মত একই পদ্ধতিতে লাভ হয়ে থাকে অর্থাৎ সে সময় চিত্তের যে অবস্থা হয়ে থাকে প্রায় সে অনুসারেই ফল-সমাপত্তি লাভ হয়ে থাকে। শুধু পার্থক্য হল এই : ফল-সমাপত্তির স্থিতিকাল দীর্ঘ।

ফল-সমাপত্তি পুনরুৎপত্তির জন্য, অতি শীঘ্র উৎপত্তির জন্য এবং দীর্ঘসময় স্থিত থাকার জন্য যথা ৫, ১০, ১৫ মিনিট বা ১ ঘণ্টা বা আরও অধিক সময় স্থিতির জন্য — যোগীকে এরূপভাবে দৃঢ় মনস্কার সহ অধিষ্ঠান করতে হবে — ‘আমার (প্রথম মার্গের) ফল-সমাপত্তি ৫ মিনিটের জন্য অধিক সময়ের জন্য স্থিত হোক এবং তা শীঘ্র উৎপন্ন হোক।’

ফল-সমাপত্তিতে নিমজ্জন-ইচ্ছুক যোগীর নিকট প্রথমে উদয়-ব্যয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সে অবস্থা থেকে যোগী একাগ্রতা সহকারে ভাবনার যথানুরূপ ক্রম বৃদ্ধি করত: যথারীতি অন্যান্য জ্ঞান অতিক্রম করে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানে উন্নীত হবেন। ভাবনায় কৃতবিদ্য (নিপুণ বা দক্ষ) হলে চার পাঁচ বার পর্যবেক্ষণেও তিনি সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান লাভ করেন। যদি সমাধিবল পরিপূর্ণ হয় তবে ফলচিত্ত বার বার ফল-সমাপত্তি রূপ নিরোধে নিমজ্জিত হবে। কোন কোন সময় চংক্রমণ কালে এবং ভোজনকালেও চিত্ত ফল-সমাপত্তিতে নিমজ্জিত হয়। ফল-সমাপত্তিতে যে কোন অধিষ্ঠিত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থিত হয়। ফল সমাপত্তিতে নিমজ্জিত থাকা কালে যোগীর চিত্ত সংস্কার নিরোধে অবস্থান করে। তখন অন্য কোন বিষয় চিত্ত পরিধিতিতে আসে না অর্থাৎ কিছুই জানা যায় না।

১৯. উন্নততর মার্গ-ফল (The Higher Paths and Fruitions)

যোগী যখন ফল-সমাপত্তি লাভে পারদর্শী হন তখন তাঁকে আরও উচ্চতর মার্গ-ফল লাভের নিমিত্ত দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা উচিত। সে সংকল্প পরিপূর্ণার্থে তাঁর কর্তব্য কি? পূর্বের ন্যায় তিনি ষড়্-ইন্দ্রিয় দ্বারে যথা প্রকটিত বিষয়ের যথারীতি পর্যবেক্ষণ অনুশীলন (চর্যায়) নিরত থাকবেন।

সুতরাং যোগী ষড়্-ইন্দ্রিয় দ্বারে যখন যে বিষয় উপস্থিত হয় (কায়িক-মানসিক) তা পর্যবেক্ষণ করবেন। এরূপ পর্যবেক্ষণ নিরত থাকার সময় যোগী দেখবেন এই স্তরে অর্থাৎ উদয়-ব্যয় জ্ঞান স্তরে প্রথমে বিষয় বা সংস্কারসমূহ স্থূল রূপে প্রতিভাত হচ্ছে এবং তাঁর চিত্তও পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করেনি। প্রকৃতপক্ষে আরও উন্নত মার্গের ভাবনা বৃদ্ধি, পূর্বলব্ধ ফল-সমাপত্তি লাভের ন্যায় অনায়াস বা সহজ লভ্য নয়। যথার্থই ইহা দুষ্কর; কারণ উন্নত মার্গের জন্য বিদর্শন জ্ঞান নূতনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। তবে প্রথম ভাবনা চর্যা আরম্ভ কালের ন্যায় এবার ইহা তত দুষ্কর বা কঠিন হবে না। তিনি একদিন বা এক ঘণ্টার মধ্যেও সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান লাভ করতে পারেন। বর্তমান কালের যোগীগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্মরণ করেই এখানে এই বক্তব্য রাখা হল, এরূপ ব্যক্তিগণ খুব ক্ষিপ্ৰপ্রাপ্ত নয়। তাঁদের ভাবনা আরম্ভের প্রথম থেকেই অভিজ্ঞ বিদর্শন আচার্যের উপদেশ অনুসারে ভাবনা চর্যা করেছেন। অনুমান বশে তাই একই প্রকার যোগীর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে উক্তরূপ মন্তব্য করা হল।

যদিও যোগীর সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান উৎপন্ন হয় তবুও ইহা যোগীর নিকট বার বার উৎপন্ন হয় যে পর্যন্ত তাঁর ইন্দ্রিয় বল (যথা : শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা) পূর্ণতর রূপে বিকশিত না হয়। যদিও তিনি পূর্বে নিম্ন (প্রথম) স্তরের মার্গ-ফলের অধিকারী বলেই এক ঘণ্টার মধ্যে কয়েকবার ফল-সমাপত্তি লাভ করেন, তথাপি ইন্দ্রিয় বলের অপূর্ণতাহেতু পরবর্তী উচ্চতর মার্গ-ফল এক, দুই, তিন বা তারও বেশি দিনের মধ্যে লাভ করতে সমর্থ হন না। তখন তিনি সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান স্তরেই বিহার করেন। এ সময় যদি তিনি তাঁর চিত্তকে পূর্ব অধিগত (লব্ধ) প্রথম মার্গের ফল-সমাপত্তি লাভ-নিমিত্ত অধিষ্ঠান করেন বা প্রস্থাপন করেন তবে তিনি তা হয়তো দুই বা তিন মিনিটের মধ্যেই লাভ করবেন। এই সময় যোগী যেহেতু উন্নত মার্গ লাভের জন্য বিদর্শন অনুশীলন করে যাচ্ছেন, (ইতিমধ্যে) সে ভাবনায় আধ্যাত্মিক (ইন্দ্রিয়) বল পরিপূর্ণতা লাভ হলেই তিনি সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান স্তরে উন্নীত হবেন। উচ্চতরমার্গ এবং ফল (দ্বিতীয় মার্গফল) পূর্বলব্ধ প্রথম মার্গ-ফল অনুসারে (একই প্রকারে) অর্থাৎ অনুলোম এবং গোত্রভূ জ্ঞান স্তর লাভের পরক্ষণেই লাভ হয়। ফল লাভের পর পর্যবেক্ষণ স্তর প্রভৃতি যা পরে উৎপন্ন হয়, তাও পূর্বের ন্যায় (অর্থাৎ প্রথম মার্গ-ফল লাভের পর যেক্রমে বর্ণিত হয়েছে, সেরূপে উপলব্ধ হয়।

অনাগামিত্ব (তৃতীয় মার্গ-ফল) এবং অর্হত্ব (চতুর্থ বা সর্বশেষ মার্গফল) লাভ করতে হলেও পূর্বোক্ত প্রায় একই প্রকার বিদর্শন চর্যা অনুশীলন এবং জ্ঞানস্তরগুলি অতিক্রম করেই লাভ করতে হবে। সুতরাং সেগুলির আর পৃথকভাবে বিশদ-বর্ণনার প্রয়োজন মনে করি না।

স্বস্তিবচন

‘ক্রমবর্ধমান বিদর্শন ভাবনা’ পুস্তিকাটি বিশুদ্ধি স্তর মাধ্যমে বিদর্শন জ্ঞানগুলির ক্রমঃবিকাশ বর্ণনামূলক যোগীগণের সহজবোধ্য একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। সুতরাং বিশদ-বর্ণনা এখানে উপস্থাপিত করা হয়নি। সহজ করার উদ্দেশ্যে পুস্তকের বহু অংশে ত্রিপিটকের কোন সম্বন্ধের উল্লেখ করা হয়নি। ইহাতে পুনরুজ্জ্বল এবং সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরেও কিছু ভাল ক্রটি রয়েছে। পুস্তকে পরিবেশনায় এবং ত্রিপিটকের অনুল্লেখ প্রভৃতি অসম্পূর্ণতা পাঠকগণ উপেক্ষা করবেন। বিজ্ঞ পাঠকগণ শুধুমাত্র এ পুস্তকের মর্মার্থ এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুধাবন করবেন। শুধু এক্ষেত্রেই আমি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পুস্তকের প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা ভাবনানুশীলনে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যেই বিশেষতঃ এ পুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে; সম্ভবতঃ অন্যান্য পাঠকেরাও এ পুস্তক পাঠে উপকৃত হবেন।

এখন শেষোক্ত পাঠকগণের প্রতি আমার এই শুভেচ্ছাবাণী রইল : শুধুমাত্র রুচিপূর্ণ, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য স্বয়ং ভোজন করে কেউ বলতে পারেন ‘আমার উত্তম ভোজন হয়েছে, নতুবা এ উক্তি করা যায় না। অনুরূপভাবে (এ পুস্তকে) যে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান স্তরগুলির বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তিনি একমাত্র অনুবোধ করবেন যিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা তা দর্শন করেছেন — অন্যথায় নয়। সুতরাং সকল সংব্যক্তি এ সকল ক্রমোন্নত জ্ঞান স্তর অতিক্রম করে এই অবধারিত জ্ঞান-পূর্ণতায় উত্তীর্ণ করুক। তাঁরাও এই প্রাপ্তব্য বিষয়ে পরাক্রম সাধন করুক।

উপসংহার

বিদার্শনিক মহাসী নামধেয় মহাথের কর্তৃক — এই বিশুদ্ধি-জ্ঞান কথা প্রজ্ঞাদর্শী যোগীগণের উদ্দেশ্যে বর্মী ভাষায় রচিত পুস্তকের পালি ভাষায় ভাষান্তরিত সংস্করণ।

(বিশুদ্ধি এবং বিদর্শন জ্ঞান সম্বলিত এ পুস্তক ২২.৫.৫০ সনে রচিত)।

গ্রন্থাগারের অন্যান্য পুস্তক

সঙ্কর্ম-নীতিমালা	যন্ত্রস্থ
বুদ্ধপথ-জিজ্ঞাসা প্রকাশন	ছাপা নাই
ধর্মপদ (পদ্যাকারে বঙ্গানুবাদ)	৪.৫০
ক্ষুদ্রক পাঠ	১.২৫
বোধিসত্ত্বচর্যা ও বুদ্ধোৎপত্তি	২.০০
বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন (১ম খণ্ড)	৩.০০
(মহাসী সেয়াদ প্রণীত Discourses on the Basic Practice of the Satipatthana Vipassana পুস্তকের অনুবাদ)	
বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন (২য় খণ্ড)	২.০০
(মহাসী সেয়াদ প্রণীত Basic Exercise in Satipatthana Vipassana Meditation পুস্তকের অনুবাদ)	
বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন (৩য় খণ্ড)	৩.০০
(মহাসী সেয়াদ প্রণীত Pratical Insight Meditation পুস্তকের অনুবাদ)	
অভিধর্মার্থ সংগ্রহ (অনুবাদ)	পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত
বৌদ্ধযুগের মহীয়সী নারী	”
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে নির্বাণ দর্শন	”
(মহাসী সেয়াদ প্রণীত To Nibbana through Noble Eight Fold Path পুস্তকের অনুবাদ)	



লেখক পরিচিতি

চট্টগ্রামের ছতরপিটুয়া (পটিয়া থানা) গ্রামে ১৫ জুলাই, ১৯১৯ সালে সুভূতিবাবুর জন্ম। পিতা কর্ণধন বড়ুয়া এবং মাতা শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। ১৯৪২ সালে চট্টগ্রামের সরকারী কলেজ থেকে পালিতে অনার্স সহ বি.এ.পাশ করে দর্শনশাস্ত্রের এম.এ.তে ভর্তি হন। কিন্তু ২য় মহাযুদ্ধের কারণে তিনি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে চাকুরী গ্রহণে বাধ্য হন। চাকুরীজীবনে তিনি ভারত সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং এসিষ্টেন্ট কালেক্টরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগে (১৯৫২) পরে 'পালি' বিভাগে (১৯৫৩) এম.এ.পাশ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়ার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী পারমিতা বড়ুয়া তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী। পূর্ণশ্লোক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, সাধক আনন্দমিত্র মহাস্থবির, বিদর্শনাচার্য মুনন্দ্রজী এবং বিদর্শনাচার্য ননীবালা বড়ুয়ার সান্নিধ্যলাভে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। তাছাড়া পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ ধর্মধার মহাস্থবিরের দীর্ঘ সাহচর্য তাঁর জীবনে একটি স্বর্ণময় অধ্যায়। তিনি ব্রহ্মদেশের প্রখ্যাত আচার্য মহাসি সৈয়াদ বিরচিত বিদর্শনভাবনামূলক কয়েকটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে "বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন" নাম দিয়ে প্রকাশিত করেছেন। তাছাড়া তিনি 'বুদ্ধপথ', 'ধর্মপদ', 'বুদ্ধকপাট', 'সদ্ধর্মনীতিরত্নমালা', 'বোধিসত্ত্বচর্যা', ও বুদ্ধোৎপত্তি, 'আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনে 'নিবাণপথ', 'অভিধর্মাত্ম সংগ্রহ', 'বুদ্ধযুগে বৌদ্ধ মহীয়সী নারী' ইত্যাদি বহু মূল্যবান গ্রন্থাবলীর রচয়িতা। তিনি 'নালন্দা বিদ্যভবন', 'ধার্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনীর' সভাপতি এবং 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র' ও 'নালন্দা' পত্রিকা কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে বিদর্শনাচার্য ননীবালা বড়ুয়ার সঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিলেন এবং প্রায় আড়াই মাস সেখানে অবস্থান করে বিভিন্ন শহরে বিদর্শনভাবনা ও বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন। ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯০ তাঁর অকালমৃত্যুতে বাঙালি বৌদ্ধ সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হল। অনন্ত মৈত্রী ও করুণার আধার এবং সদা পরহিতব্রতী সাধক ও দার্শনিক সুভূতিবাবু জন্ম-জরা-ব্যাদি-মৃত্যুর অতীত নির্বাণশান্তি লাভ করুন।